১৭ নভেম্বর ২০১৫

প্রেম

মহাজোট

মন্তব্য

অর্থনৈতিক সংস্কার: মোদীর সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন

বিকল্পহীন অপ্রতিরোধ্য সু চি

প্রবন্ধ

কবির উপন্যাস ও কয়েকজন গুপ্তচর

অবিশ্বাস্য, হ্যাঁ, এটাই অসাধারণ, যা আপনার কা
এগুলোকে জল ও সূর্য্যের আলো থেকে র

আপনাদের মূল্যবান কাঠের তৈরী সুন্দর আসবাব পত্রগু
রঙ, যা আপনাদের কাঠের তৈরী জি

MRF CORP
Vapocure
Paints

▶ এটা আর্দ্রতা প্রতিরোধক ▶ এটা দূ

MRF COR

Regd. & HO: Tarapore Towers, V Floor, 826, Anna Salai, Chennai 600 002.
Ph: 044-28521033, 28550297, 28550298 Fax: 044-28520912
e-mail: vapocure.ho@mrfmail.com

For more information visit

ঠের তৈরী আসবাবপত্রগুলোর জন্য উপযুক্ত এবং
রক্ষা করিয়া দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা প্রদান করে।
গুলোকে বছরের পর বছর নূতন রাখিবার জন্য উপযুক্ত
জনিসপত্রগুলোকে করে দীর্ঘমেয়াদী।

ষণ প্রতিরোধক ▶ এটা আঁচর প্রতিরোধক

P LIMITED

ZONAL OFFICES: New Delhi: 011-25897982 / 83 / 84, Noida: 0120-4118411,
Kolkata: 033-24235175 / 141, Mumbai: 022-67653539, 67707226,
Bengaluru: 080-23142901 / 43002 / 47981 Chennai: 044-28610022 / 0044 / 0066

us at: www.mrfpaints.com

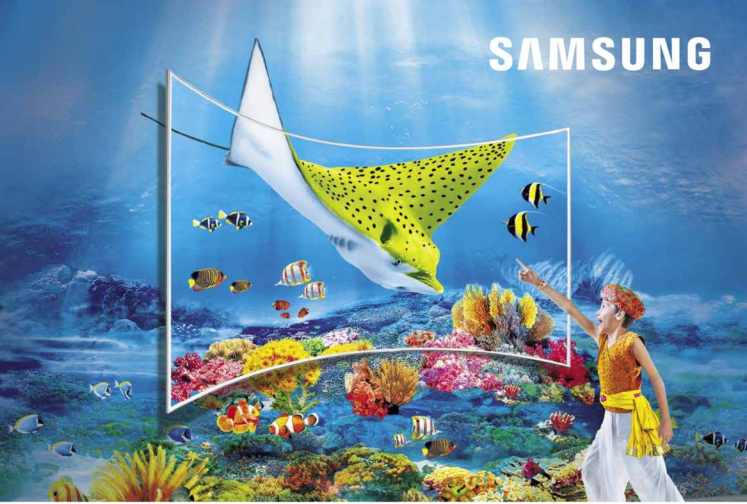

EXPERIENCE SURROUND VIEW

Curved TV

SUHD | UHD | FHD

SURROUND VIEW

The curved screen surrounds you with a never seen before panorama - like viewing experience.

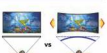

HIGHER DEPTH

Samsung's proprietary Auto Depth Enhancer technology along with the curved screen adds an incredible sense of depth to every image.

Auto Depth Enhancer

LIFE-LIKE PICTURE

Nano Crystal Color provides a wider range of colors with up to 64 times[1] more color expression than conventional TVs.

NANO Crystal Color
64 times[1] more than 4K

Visit us at: www.samsung.com/in/microsite/curvedtv

Connect with us: /samsungIN /samsung_in /user/officialsamsungIN

Scan the QR code to visit the website

T&C Apply: [1]Compared to 4K with 8 bit panel TV models. Images of animals shown are only a representational depiction created digitally.

HEARING PLUS
360-degree hearing solutions

ঠিক ধরেছেন আমার সাথে ডিনার

যদি আপনার শ্রবণ সমস্যা থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি আপনার নিকটবর্তী হিয়ারিং প্লাস শাখায় পৌঁছান। আর উপযুক্ত হিয়ারিং এড্ নিয়ে আমার সাথে ডিনারের জন্য প্রস্তুত হন।*

সহজ ইএমআই বিকল্প | হোম সার্ভিস | পিক-আপ এবং ড্রপ সুবিধা

ফোন তুলুন হিয়ারিং-এড্ এর জন্য, অল্-ব্যাটারি কে কল্ করুন

1800 420 6666
98833 44477

সেন্টার : রবীন্দ্র সরোবর (H.O.)। দেশপ্রিয় পার্ক (ক্যালকাটা হিয়ারিং ক্লিনিক) এসপ্ল্যানেড। বেহালা। সল্টলেক। লেকটাউন। কেষ্টপুর। শ্যামবাজার। হাওড়া। দার্জিলিং মধ্যগ্রাম। বর্ধমান। শিলিগুড়ি। দুর্গাপুর। কোচবিহার। মেদিনীপুর। কৃষ্ণনগর। বোলপুর আলিপুরদুয়ার। জলপাইগুড়ি

বিশদ জানতে মিসড্ কল দিন **081007 02233** নম্বর-এ অথবা SMS পাঠান **AID** লিখে **56677** নম্বর-এ

www.hearingplus.in | An ISO 9001 : 2008 Company

*শর্তাবলি প্রযোজ্য

জীবনী • স্মৃতিকথা

অজয় চক্রবর্তী
শ্রুতিনন্দন ১৫০.০০

অজিত গুপ্ত
ভালবাসার আড্ডা ১৫০.০০

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
মনে বনে বনান্তরে ২৫০.০০

অন্নদাশঙ্কর রায়
এই সময় ১২৫.০০
জীবন যৌবন ২০০.০০

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী ৫০০.০০

অশোকচন্দ্র সেন
প্রতিবাসী প্রবাসে: মধ্যপ্রাচ্যের দিনলিপি ২৫০.০০

অশোক মিত্র
আপিলা-চাপিলা ৩৫০.০০
চরিতাবলী ১৫০.০০

আর জে মিনি
অনুবাদ: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
চার্লস চ্যাপলিন ২০০.০০

আলাউদ্দিন খাঁ
আমার কথা ১০০.০০

আলো বসু
ঘরাপাতা ১০০.০০

আশুতোষ মিত্র
শ্রীমা ২০০.০০

ইন্দ্রমিত্র
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর ৪০০.০০
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬০.০০

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ব আফ্রিকায় বিপদসঙ্কুল দিনে ১৫০.০০

এম সি মেরি কম
অনুবাদ: কবীর ভট্টোপাধ্যায়
অন্যা মেরি কম ২৫০.০০

এ পি জে আবদুল কালাম
সহযোগী লেখক: অরুণ তিওয়ারি
অগ্নিপক্ষ ২৫০.০০
সম্ভিক্ষণ ২৫০.০০

কিশলয় ঠাকুর
পথের কবি ২০০.০০

কৃষ্ণা বসু
পার্লামেন্টের অন্দরমহলে ২০০.০০

হারানো ঠিকানা ১৫০.০০

ক্ষিতিমোহন সেন
কবীর ২০০.০০

গোপালকৃষ্ণ রায়
সুচিত্রার কথা ২৫০.০০

গোপালচন্দ্র রায়
শরৎচন্দ্র (জীবনী) ৫০০.০০
শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প ১২৫.০০

গোলাম মুরশিদ
আশার ছলনে ভুলি ৪৫০.০০

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
পথের পাঁচালীর নেপথ্য কাহিনী ৮০.০০

জওহরলাল নেহরু
আত্মচরিত ৪০০.০০

জগন্নাথ বসু
বেতারের কথকতা এবং ১৫০.০০

জেনারেল জে. জে. সিং
সেনাপতি: জেনারেলের আত্মজীবনী ৫০০.০০

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
পুরাতনী ২০০.০০

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
যীশুচরিত ১২৫.০০

তপন রায়চৌধুরী
রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তির পরচরিতচর্চা ১৫০.০০
বাঙালনামা ৪৫০.০০

তপন সিংহ
মনে পড়ে ১২৫.০০

তারাপদ রায়
কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু ২০০.০০

তিমিরবরণ ভট্টাচার্য
উদয়-পথের সহযাত্রী ১২৫.০০

দিলীপ পদ্দার ওকর
সোনালী মায়ায় ভারতে রবের্তো রসেলিনি ৩০০.০০

দিলীপকুমার রায়
স্মৃতিচারণ ৪০০.০০

দেবতোষ ঘোষ
স্মৃতির পালক ১০০.০০
শম্ভু মিত্র শ্রীচরণেষু ১৫০.০০

দেবারতি মিত্র
জীবনের অন্যান্য ও কবিতা ১৫০.০০

দেবীপ্রসাদ রায়
সত্যেন্দ্রনাথ বসু: চেনা বিজানী অজানা কথা ১৫০.০০

ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
জীবনের ইন্দ্রধনু ২৫০.০০

নন্দিনী দেবী
পিতা পুত্রী ১০০.০০

নবীন চাওলা
মাদার টেরিজা ১৫০.০০

নীরদচন্দ্র চৌধুরী
আমার দেবোত্তর সম্পত্তি ২৫০.০০

নুরজাহান বোস
আগুনমুখার মেয়ে ৩০০.০০

পরিমল গোস্বামী
সমগ্র স্মৃতিচিত্র ৭৫০.০০

পান্থজন
কাবুলের পথে পথে ২০০.০০

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
কথায় কথায় রাত হয়ে যায় ২০০.০০

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
পণ্ডিচেরীর দিনগুলি (পরিমার্জিত সংস্করণ) ১৫০.০০

প্রতাপচন্দ্র রায়
পদ্মপত্রে জলবিন্দু ১৫০.০০

প্রতিভা বসু
জীবনের জলছবি ৩০০.০০

প্রণব বর্ধন
স্মৃতিগুঞ্জন ৩৫০.০০

ফাদার দ'তিয়েন
আটপৌরে দিনপঞ্জি ২৫০.০০

বিক্রম সম্পৎ
আমার নাম গণেহরজান ৪০০.০০

বিজয়া রায়
আমাদের কথা ৫০০.০০

বিপুলরঞ্জন সরকার
হেডস্যারের রোজনামচা ২৫০.০০

বিমল কর
উড়ো খই ১ম ২০০.০০
উড়ো খই ২য় ২০০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ফোন ২২৪১-৪৫৫২, ২২৪১-৩৪১৭
ই-মেল ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট www.anandapub.com

দেশ

৩০ কার্তিক ১৪২২ । ১৭ নভেম্বর ২০১৫ । ৮৩ বর্ষ ২ সংখ্যা

সূ চি প ত্র

মন্তব্য

মহাজোট

পারস্পরিক বৈরিতা ভুলে লালুপ্রসাদ ও নীতীশকুমার সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন বিজেপি-র বিরুদ্ধে। অন্য দিকে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছিল বিজেপি-র উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচারে। বিহারের নির্বাচনী ফলাফল সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। লিখছেন সুমিত মিত্র।

প্র ব ন্ধ

কবির উপন্যাস ও কয়েকজন গুপ্তচর

এক বিখ্যাত কবি লিখলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। তারপরই, তীব্র আলোড়ন বিশ্বজুড়ে। তৎপর একাধিক আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা। বিতর্ক-নিষেধাজ্ঞার অধীন হয়ে যায় কবির জীবন। নির্মিত হয় শব্দ ও ক্ষমতার দ্বৈরথের চমকপ্রদ এক আখ্যান। লিখছেন সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রভারতীর বেস্টসেলার বই ২০১৫

হেমেন্দ্রকুমার রায় ঐতিহাসিক সমগ্র 350/-
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পাঁচটি উপন্যাস 250/-
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পায়ের তলায় সর্ষে ১ ও ২ 700/-
সমরেশ মজুমদার কলিকাতায় নবকুমার 300/-

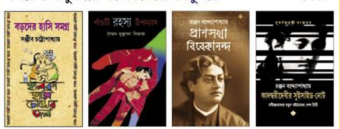

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বড়দের হাসি সমগ্র 550/-
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ পাঁচটি রহস্য উপন্যাস 180/-
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাদম্বরী দেবীর সুইসাইড-নোট 100/-
প্রাণসখা বিবেকানন্দ ১ম 225/- ২য় 250/- ৩য় 350/-

প্রফুল্ল রায় মানুষের যুদ্ধ ও পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে 250/-
সুচিত্রা ভট্টাচার্য শুধু প্রেম 250/-
নবনীতা দেবসেন হৃদকমল 120/-
অনীশ দেব তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট 200/-

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুরন্ত ঈগল 250/-
প্রচেত গুপ্ত ছাদে কে হাঁটে 180/-
উল্লাস মল্লিক পেট ফাটা ১৮ 180/-
শিশির চক্রবর্তী সংকলিত এ শুধু গানের দিন
পাঁচদশকের আধুনিক বাংলা গানের গীতবিতান 600/-

পত্রভারতী 3/1 কলেজ রো, কলকাতা 9
ফোন 22411175 । 9433075550 । 9830806799
ঘরে বসে বই কিনুন। ফোন বা অনলাইনে
অনলাইন কিনতে চান ইন করুন
সব বইয়ের এর সব আউটলেটে
bookspatrabharati.com Flipkart amazon.in Saffronart OXFORD BOOKSTORE LANDMARK

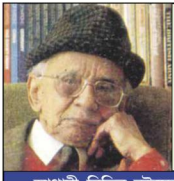

মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য

বাঙালী জীবনে রমণী ২৫০ আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ ২২৫ আত্মঘাতী বাঙালী ১৫০ শতবার্ষিকী সংকলন ৫০০ আমার দেশ আমার শতক ১৫০ আজি হতে শতবর্ষ আগে (যন্ত্রস্থ) **From the Archives of A Centenarian** 100.00 **Why I Mourn for England** 100.00 **The East is east & The West is west** 200.00

আগামী বিভিন্ন বইমেলা উপলক্ষে বেরোচ্ছে

সমরেশ মজুমদার-এর
নতুন উপন্যাস
দূর পাল্লায় দুই নারী

★

রবিশংকর বল-এর
নতুন উপন্যাস
নায়িকা রহস্য

★

সাম্যন্তক চক্রবর্তী-র
চাঞ্চল্যকর উপন্যাস
সিন্ডিকেট

★

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের
নতুন ভ্রমণ কাহিনী
পুণ্যতীর্থে ভ্রমণ

★

পূর্বা সেনগুপ্ত-র
ভারত অমৃত কথা ২য় খণ্ড

★

রামকুমার মুখোপাধ্যায়-এর
উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড/২য় খণ্ড

★

আশাপূর্ণা দেবী-র
রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড

সমরেশ মজুমদার
বুকের ভেতর বাংলাদেশ ১০০
বাণী বসু
চালসার ডায়েরি ১৩০
প্রচেত গুপ্ত
চুপি চুপি বলছি ৩০০
তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভ্রান্তিডানা ৩০০
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
ভানগড় রহস্য ১০০
ভগীরথ মিশ্র
কিন্নরের পথে পথে ২৫০

মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত

নবনীতা দেব সেন-এর গ্রন্থ

উত্তমাশা অন্তরীপ এবং ১০০ হে পূর্ণ তব চরণের কাছে ৬০ দেশান্তর ৬০ রঙ্গিণীর রাজ্যপাট এবং অন্যান্য ৫০ শনি রবি ৩০ পাড়ি ৪০ নবনীতা ৫০০ উড়াল ৫০ তিন ভুবনের পারে ৮০ স্বপ্ন কেনার সদাগর ২০

।। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ।।

নবনীতা দেব সেন-এর নতুন বই

আজব কারখানা

আগামী কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে

নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
বেলাশেষে ১৮০
শুভাপ্রসন্ন-র
আমার ছবি জীবন ৪৫০
নীহাররঞ্জন গুপ্তর
রাতের গাড়ি ১৪০
বিমল মিত্রর
শতবার্ষিকী সংকলন ৪০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
গল্প সমগ্র ৩০০
আবীর গুপ্তর
বিষাক্ত ছোবল ২০০
৩২ জন লেখকের লেখা গল্প সংকলন
আতঙ্ক ৩০০

।। গত বইমেলার উল্লেখযোগ্য বই ।।

শিবানী
আমাদের শান্তিনিকেতন ১০০
আনিসুজ্জামান
বাঙালি ও বাংলাদেশ ২৫০
অরুণ মুখোপাধ্যায়
হিন্দুতীর্থ পুরীধাম ৩৫০

আগামী বিভিন্ন বইমেলা উপলক্ষে বেরোচ্ছে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়-এর
নতুন বই
অপাঠ্য

★

স্বপ্নময় চক্রবর্তী-র
নতুন উপন্যাস
পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ

★

ইন্দ্রনীল সান্যালের
নতুন উপন্যাস
ক্যালাইডোস্কোপ

★

পবিত্র সরকারের
নতুন কিশোর কাহিনী
ঘঞ্চু চরিতামৃত

★

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর
নতুন কিশোর গল্প সংকলন
এক ডজন চার কিশোর

★

জয়ন্ত দে-র
নতুন উপন্যাস
নতজানু

★

সুব্রত মুখোপাধ্যায়-এর
উপন্যাস অমনিবাস

★

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর
রচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ড

অন্নদাশঙ্কর রায়
যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতি ২৫০
প্রবন্ধ সমগ্র (১১শ খণ্ড) ৪০০
মনোজ মিত্র
রাজা গজা দশ মজা ২৫০
শাঁওলী মিত্র
গল্প সমগ্র ৩৫০
সোমনাথ রায়
ভিন্নপথের পথিক ২২০
বরুণ দত্ত
কুন্তকথা ৩০০

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩. ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪১-৯৪৩১
ফোন : ২২৪১-৬৪২০ • ই-মেল : mitraghoshpublisherpvtltd@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.mitraandghosh.co.in

সূ চি প ত্র

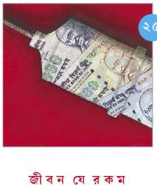

২৫

জী ব ন যে র ক ম

চিকিৎসা: পরিষেবা না ব্যবসা?

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতাল শান্তিপ্রিয় নাগরিকের কাছে বিভীষিকা। আর বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার যা বিল, তা দেখে রোগীর আত্মীয়দেরই চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। তাই একেবারে নিঃসম্বল নন যাঁরা, তাঁরা পাড়ি দিচ্ছেন ভিনরাজ্যে। লিখছেন সুমিত মিত্র।

৩৪

ক বি তা

প্রেমের কবিতা: আমি শুধু একলা করে তুলি

শূন্যতার বোধে আক্রান্ত কবি, 'আমনা কোনও সত্যি কথা বলে না কক্ষনও।' কিংবা 'চুম্বনেরও চিহ্নাশরীর লাগে।' তাই বলে শিকড়ের সন্ধান থেমে থাকে না। 'ভিড়ের নাগাল থেকে/ আমাকে আগলে রেখো', দায়ধ্বস্ত জীবনে কবিতার এই দার্ঢ্যিকুকে মান্যতা দিতে সব যন্ত্রণাকে আত্মস্থ করেন বিভাস রায়চৌধুরী, লেখেন, 'কবি তো সব ধারণ করে'। সঙ্গে আরও ছ'জন কবির কবিতা।

বুদ্ধদেব গুহ'র নতুন বই

ভ্রমণ সমগ্র (১ম) (২য়)

বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে লেখক ঘুরেছেন এ দেশ এবং বিদেশের বহু স্থানে। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে এক অনবদ্য সংকলন। দুই খণ্ডে রয়াল সাইজ।

ঋভু

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস

চার পর্ব একত্রে রয়েল সাইজ দাম ৫৫০

বুদ্ধদেব গুহ-র নতুন উপন্যাস

টিটিচিকোরি ১৩০

হাজারো পুরুষের মুগ্ধতায় অভাস্ত সুস্তনী সুসজ্জিতা নৃত্যপটিয়সী ইলিশি। কিন্তু একাকী গুহাবাসী বাঘুভাই তাকে যে এমনভাবে আবিষ্ট করবেন তা সে কখনও ভাবেনি। এ-এক অনারকম প্রেমের উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, যা চিরকালীন এবং অনবদ্য।

বুদ্ধদেব গুহ-র

প্রকাশিত হল নতুন রাজ সংস্করণ

জঙ্গল সম্ভার ৪০০

জঙ্গলের গাছগাছালি, মানুষ, না-মানুষদের নিয়ে জঙ্গলের নানান কাহিনির একত্র সংকলন

গানের ভুবন ৮০

কোজাগর ২৫০

ছয়টি উপন্যাস ৪০০ সাতটি উপন্যাস ৪৫০

চানঘরে গান ১০০ তেরোটি উপন্যাস ৫৫০ ছয়মাস ৫০

বাজেচন্দনপুরের কড়চা ৭০ চড়াইউতরাই শালুকফুল এবং হোরিয়ালি ৮০

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বৈরথ ৫৫০

'তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাবিচ উপন্যাস : আখ্যানতত্ত্ব ও নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে'—বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি লাভ করলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. মাশ্পি বৈদ্য। 'দ্বৈরথ' উপন্যাস নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম ফিল করলেন সাহেব হেমব্রম। তাঁদের জানাই আমাদের অভিনন্দন।

মহাভারতের আদলে সপ্তদশ পর্বে লেখা 'দ্বৈরথ' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ১৯৮০ থেকে ২০০০, এই সময়কাল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল। পালাবদলের সুচনাও এই পর্বের শেষ কয়েক বছরের। এক সামান্য গ্রাম্য নারী তার অসাধরণ বুদ্ধিবলে কীভাবে শামিল হল পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়নে, সেই সঙ্গে গ্রামবাংলার রাজনৈতিক আবর্ত ও নিম্নবর্গীয় মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াই নিয়ে সুবৃহৎ উপন্যাস।

ষোড়শ শতাব্দীর গোয়ালিয়রের পটভূমিতে ধ্রুপদ সংগীতের এক সংগীতজ্ঞের মহান জীবন নিয়ে

মালবকৌশিক ৫০০

মহাকাব্যিক উপন্যাস।

পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ইংরেজি অনুবাদ।

প্রেমের অভিনবত্ব নিয়ে লেখকের নিরন্তর গবেষণা, সেরকম পাঁচটি অন্য রকম প্রেম নিয়ে প্রকাশিত হল ঃ

পাঁচটি অন্য প্রেমের উপন্যাস ৪০০

পঁচিশ বছরের সময়কালে লেখা দশ রকমের

দশটি উপন্যাস ৪০০ সেরা পঞ্চাশটি গল্প ৪৫০ গর্জন সত্তর ২২০

সোহারাব হোসেন

নতুন বই

আরশি মানুষ ১৮০

গাঙবাঘিনি ১০০

দ্বিতীয় দ্রৌপদী ৮০

জম্পেশদার ভূতপুরী অভিযান ৩০

অমর মিত্র নতুন বই

রতনলাল১৩৫০

শূন্যের ঘর ২০০

শূন্যের বাড়ি ১৬০

ধনপতির চর ২৫০

নীল যমুনার জল ১৩০ জননীসমগ্র১৪০

গড়শি বসত করে ১৪০ কন্যাডিহি ১৪০

দে'জ-এর বিক্রয়কেন্দ্র

ডানলপ 9088854331 * বিষ্ণুপুর 9332518089

শান্তিনিকেতন 9434116716*দুর্গাপুর 8101947446*উত্তরপাড়া (033)28480100

বর্ধমান 9434571823*ঠাকুরপুকুর 9831633937*নিউটাউন 8981356648

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

e-mail : deyspublishing@hotmail.com

ফোন : 2241-2330 Fax : (033) 2219-7920

প্রকাশন শিল্পে অন্য ধারার...

উপন্যাস

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
দশটি উপন্যাস ৬০০

দিব্যেন্দু পালিত
প্রথম পাঁচটি উপন্যাস ৪০০

শেখর বসু
রহস্য উপন্যাস ১ ৪০০

নন্দিতা বাগচী
চিলমারির বন্দর ২০০

সায়ন্তনী পুততুণ্ড
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে ২৫০

আরও দাও প্রাণ ২০০

ননী ভৌমিক
ধূলোমাটি ২৫০

অমিতাভ সমাজপতি
ফিরোজো ৩০০

গৌতম ঘোষদস্তিদার
পরপুরুষ ১৫০

বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলনের ৬টি উপন্যাস

স্বপ্ন ফেরি করেন তিনি। রুক্ষ বাস্তবের মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখেন আদ্যন্ত একটি রোমান্টিক মন। কথনের আশ্চর্য ভঙ্গিময় জীবনেরই গল্প বলে চলেন তিনি। ছবির পর ছবি জুড়ে, স্মৃতির কোলাজে বাঁচার কলতান গাঁথেন ইমদাদুল। তাঁর মায়াবী লেখনী ছুঁয়ে ব্যক্তিগত ভাব ও ভাবনাগুলি সর্বজনীন হয়ে উঠে স্পর্শ করে পাঠকের মন।

যাবজ্জীবন ২০০, লিলিয়ান উপাখ্যান ৩০০ নায়কের নাম কবি ৩৫০, একা ৩৫০, কেমন আছ, সবুজ পাতা ১৫০, জীবনপুর ৩০০

খুব শীঘ্র প্রকাশিত হতে চলেছে নতুন উপন্যাস মৌসুমি

২টি নতুন বইয়ের ঠেক

বহরমপুরে প্রতিভাস

নিউ বুক হাউস, কাদাই, ৮১৭০৮১১২৮০

৫ ডিসেম্বর ২০১৫, শনিবার বিকেল ৫টা

মুর্শিদাবাদে প্রতিভাস

সরকার বুক কর্নার, পাঁচগ্রাম, ৯৩৩২১৭৪৬৩৪

৬ ডিসেম্বর ২০১৫, রবিবার সকাল ১১টা

শুভ সূচনায় কবি সুবোধ সরকার

উপস্থিত থাকবেন কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সংখ্যার 'নতুন কৃত্তিবাস' নিঃশেষিত। পাঠক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কৃত্তিবাস

তারাপদ রায় সম্মাননা

প্রতি সংখ্যায় একজন করুণ লেখককে সম্মানিত করা হবে। তারাপদ রায়ের স্মৃতিবাহিত এই সম্মাননার প্রাপ্তি প্রতিভাসের পক্ষ থেকে ৫০০ টাকা মূল্যের বই। এই সংখ্যার নির্বাচিত কবি **পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়**। কবিকে আমাদের অভিনন্দন।

'নতুন কৃত্তিবাস' প্রকাশনা

'নতুন কৃত্তিবাস' নবীন লেখকদের বই প্রকাশ করবে। এজন্য লেখকদের কোনো খরচ বহন করতে হবে না। কবিতার বইয়ের আয়তন ৬৪ পৃষ্ঠা। বানান ও ছন্দের ভুল থাকলে পাণ্ডুলিপি বাতিল হবে। বইমেলায় প্রকাশিতব্য বইয়ের জন্য ডাকযোগে পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫-র মধ্যে। বইমেলায় আপাতত একটি কবিতার বই প্রকাশ করা হবে। পরবর্তী সময়ে সব ধরনের বই প্রকাশের ভাবনা রয়েছে।

'নতুন কৃত্তিবাস' পুরস্কার

অনূর্ধ্ব ৪৫ বয়স্ক লেখকদের পুরস্কৃত করবে 'নতুন কৃত্তিবাস'। এজন্য ২০১১-১৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত বই একমাত্র বিবেচ্য। কবিতার বই ৬৪ পৃষ্ঠার এবং গদ্যের বই অন্তত ৯৬ পৃষ্ঠার হওয়া দরকার। নাটকের বই ছাড়া অন্য বই বোর্ড-বাঁধাই হতেই হবে। কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধের বই বিবেচনার জন্য দফতরে পাঠান ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫-র মধ্যে।

শুধুমাত্র কাব্যগ্রন্থের জন্য পুরস্কার

উৎপলকুমার বসু সম্মাননা

শুধুমাত্র গল্প-উপন্যাস গ্রন্থের জন্য পুরস্কার

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্মাননা

গদ্য, ভ্রমণ, নাটক এবং কবিতার জন্য পুরস্কার

দীপক মজুমদার সম্মাননা

লেখা পাঠানোর রীতি লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

প্রতিলিপি লেখে লেখা পাঠাবেন। প্রতিলিপি পাঠাবেন না।

কোনো লেখাই ফেরতযোগ্য নয়। প্রকাশিত লেখা পাঠাবেন না।

লেখার সঙ্গে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর-ই-মেল অবশ্যই জানাবেন।

বিদেশবাসী লেখকরাই কেবল ই-মেলে লেখা পাঠাতে পারেন। অন্যরা কোনোমতেই ই-মেলে লেখা পাঠাবেন না। ডাকে পাঠাবেন।

লেখা পাঠিয়ে আপেক্ষা করবেন। ফোনে বা পত্রযোগে কারও কাছে লেখার খোঁজ করবেন না। কৃত্তিবাস সম্পর্কিত যাবতীয় কিছু পাঠাবেন প্রতিভাসের ঠিকানায়। যেকোনো যোগাযোগের জন্য ফোন করুন ৯৪৩২০৭৬৩০৩, ৮৯০২৬৬২৮৯২

কলেজ স্ট্রিটে দে বুক স্টোর (দীপু) ৬৪৫৫২২৪৫	শান্তিনিকেতনে 'সুবর্ণরেখা' ৯৪৩৪০৩৫৮৭৬	গড়িয়া মেড়ে 'চর্চা' ৯৯৩০৩৪৪১৪৭	বালিগঞ্জে 'আকার' ৯৯০৩৭২৮৮২৩	টুচুড়ায় 'বিদ্যার্থী ভবন' ৯৪৩৪১১০৪৭৮	উত্তরপাড়ায় 'ইতোর' ২৬৬৩৮৮৫০	দুর্গাপুরে 'বিশ্বজনীন' ৯৪৭৬২১৩১৯৯	মধ্যগ্রামে 'বই ভরণী' ৭৮৯০২৫২২৭১	বইয়ের ঠেক করতে যোগাযোগ করুন ৯৮৭৪৫৫৬৬৯০

আমাদের নিজস্ব বুক স্টোর বিটিরোড়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উলটোদিকে

প্রতিভাস ১৮এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-৭০০ ০০২ ২৫৫৭৮৬৫৯, ৬৫৪৪৪৯৯৮ @ prativash1986@rediffmail.com www.facebook.com/prativash.kolkata

সূচিপত্র

৮১

গ্রন্থলোক

রেনেসন্স-এর রকমফের

দেশ কাল পাত্র ও ভাবজগতের দিক থেকে ইটালি তথা ইউরোপীয় রেনেসন্স-এর সঙ্গে বাংলার রেনেসন্স-এর তুলনা অর্থহীন। তবু বাংলার রেনেসন্স যে পশ্চিমের চিন্তাধারায় প্রভাবিত, একথা ঐতিহাসিক সত্য। গোলাম মুরশিদ রচিত 'রেনেসন্স, বাংলার রেনেসন্স' গ্রন্থ-আলোচনায় শুচিব্রত সেন।

৭৩

শিল্পসংস্কৃতি

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত, বহুপঠিত উপন্যাসকে মঞ্চে উপস্থাপন করা এক দুরূহ কাজ। পূর্ব পশ্চিম সে কাজে সফল। সুপরিকল্পিত এবং সুপ্রযোজিত এই নাটাটি রাঢ়দেশের মানুষের এক প্রাণবান উদ্দাম লড়াইয়ের ছবি ফুটিয়ে তোলে। প্রমাণ করে, নাটককার-নির্দেশক কৌশিক কর বাংলা নাটক নির্মাণে দীর্ঘ পথ চলার জন্য তৈরি। পোশাক পরিকল্পনা ও মঞ্চস্থাপত্যে মোটিফ হিসেবে সাদা-কালোর ব্যবহার চমকে দেয়। আলোচনা করেছেন সুব্রত ঘোষ।

নার্গিস সাত্তার এর বই।
রয়ালটি **শিক্ষানিকেতন**
স্কুলকে দেওয়া হয়।

- **নারী বহুরূপে**
  সাধনা ভট্টাচার্য, শিক্ষানিকেতন কলানবগ্রাম, বর্ধমান
- **এই নারী দেহ**
  মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩
- **ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই**
  মিত্র ও ঘোষ, ঐ
- **ভাবনার অলিন্দে**
  সাহিত্যিকা
- **মধ্যরাতের গদ্য**
  শশধর প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট
- **উগ্র নারীবাদ সমাজে ও সাহিত্যে**
  ক্রিয়েটিভ অ্যাসোসিয়েটস,
  ৭, এস.বি রায় চৌধুরী রোড, কলকাতা ৪৯
- **মা সারদা অন্য চোখে** ঐ
- **শিশু শিক্ষক শিক্ষা**
  জাগরী, ৭৪/৫এ বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৩
- **ধর্ম, ইসলাম, নারীর অধিকার**
  মুক্তচিন্তা, ২৩ পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা-৯
- **তিনি অন্য মানুষ**
- **Women and Women's**
  Freedom Movement in India-Best Books,
  1A College Street Kolkata -9
- **Continuity and Change in Indian Society**
  Best Books
- **Women and Domination**
  Best Books
- **Women at Work**
  Best Books

'লরেটো থেকে বিশ্বভারতী', 'ধারাবাহিক',
কথা সাহিত্য ক্রমশঃ, মিত্র ও ঘোষ।

Contact : 9830523032

সংসদ - এর বই

শশিভূষণ দাশগুপ্ত
ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য ₹ 250

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উপনিষদের দর্শন (৩য় সংস্করণ) ₹ 160

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
উপনিষদের কথা (৩য় সংস্করণ) ₹ 70

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী
জপসূত্রম ১,২,৩ খণ্ড (প্রতিটি) ₹ 450

সম্পাদনা: হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বৈষ্ণব পদাবলী ₹ 700
রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত ₹ 350

সম্পাদনা: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাশীদাসী মহাভারত ১,২ (প্রতিটি) ₹ 225

অমিতা চক্রবর্তী
সংস্কৃত নাটকের গল্প (৪র্থ সংস্করণ) ₹ 60

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক ₹ 150
প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয় ₹ 70

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
চরিতকথা ₹ 65

দীপংকর লাহিড়ী
বিলুপ্ত জনপদ ও প্রচলিত কাহিনী ₹ 175
পরিবেশ: প্রকৃতির প্রথম সন্তান ₹ 200
Environment: The First Child of Nature ₹ 200

প্রোজ্জ্বল শঙ্কর সেন
সাদা বাঘ হলুদ বাঘ ₹ 150

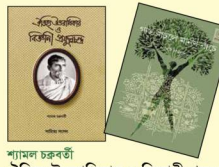

শ্যামল চক্রবর্তী
ঐতিহ্য উত্তরাধিকার ও বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র ₹ 225
বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞানসাধক চুণীলাল বসু ₹ 180

অশোককুমার সিংহ
প্রবহমান বিজ্ঞান ₹ 250

গোষ্ঠ ন্যায়বান
কেন খাব সবজি ₹ 70
গাছ বাঁচলে মানুষ বাঁচে ₹ 80

শুভেন্দু গুপ্ত
প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা ₹ 250

কল্যাণ রুদ্র
বাংলার নদীকথা ₹ 175
পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ সংকটের উৎস সন্ধানে ₹ 100

Madhusraba Dasgupta
Samsad Companion to the Mahabharata ₹ 1200
Samsad Companion to the Ramayana ₹ 800

Brajendranath Seal
Positive Sciences of the Ancient Hindus ₹ 300

সংসদ-এর বই পাওয়া যায়

অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস : পার্ক স্ট্রিট। **স্টার মার্ক** : লর্ড সিনহা রোড, সিটি সেন্টার, সাউথ সিটি, মনি স্কোয়ার। **সৌরি** : এলগিন রোড, নবনন, দুর্গাপুর। **কথাশিল্প** : কলেজ স্ট্রিট।
বাংলাদেশ (চট্টগ্রাম) : বাতিঘর, প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড। ☎ ০৩১২৮৬৯৩৯১/০১৭৩৩০৬৭০০৫

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯
ফোন : ২৩৫০-৭৩৬৯/৩১৯৫ ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৩৬০ ৩৫০৮
e-mail : ss_samsad@yahoo.in
website : www.samsadbooks.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১৩
মন্তব্য ১৪

জীবন যেরকম
চিকিৎসা: পরিষেবা না ব্যবসা? • সুমিত মিত্র ২৫

প্রবন্ধ
কবির উপন্যাস ও কয়েকজন গুপ্তচর • সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬

কবিতা
বিভাস রায়চৌধুরী • মেঘ বসু
ত্বষারকান্তি রায় • গৌতমকুমার ভাদুড়ি • তরুণ মান্না
অমিত ত্রিবেদী • বিপ্লব বড়াল ৩৪

গল্প
ভারদার বা ভাদ্র মাস • মণিরত্ন মুখোপাধ্যায় ৩৮
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া • সুব্রত বসু ৪৪
দূরবিন • শমীক ঘোষ ৫০

ধারাবাহিক রচনা
পিওন থেকে প্রকাশক • বাদল বসু ৫৭

ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস
গজপতি নিবাস রহস্য • শেখর মুখোপাধ্যায় ৬৫

শিল্পসংস্কৃতি ৭৩ • গ্রন্থলোক ৮১ • চিঠিপত্র ৮৫
নামমাত্র ৮৯ • সুদোকু ৯০ • শেষকথা ৯০

প্রচ্ছদ: অমিতাভ চন্দ্র
প্রচ্ছদের ফোটো: পি টি আই

দেশ এবার ওয়েবসাইটে: www.desh.co.in

সম্পাদক হর্ষ দত্ত

এবিবি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রবীণ বিশ্বাস কর্তৃক ও প্রমুখ সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১/ ২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০৬০ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল : মণিপুর ও আসামসহ ১.০০ টাকা।
RNI vol. 59 issue 2 Regd 2537/57
এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই

বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ₹১৫০

শঙ্খ ঘোষের
২য় সংস্করণ
ইছামতীর মশা ₹১৫০

ননীতা দেব সেনের
২য় সংস্করণ
ভ্রমণের ননীতা ₹৯০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
২য় সংস্করণ ₹১২০

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে ₹৭৫

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া ₹৬০
রবীন চক্রবর্তীর বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
ভ্রমণকাহিনীর মহাসংকলন
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের
অবিস্মরণীয় ভ্রমণকথা
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
১ম খণ্ড ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০ ২য় খণ্ড ৩য় মুদ্রণ ₹৩০০
৩য় খণ্ড ১ম প্রকাশ ₹৩০০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর উপন্যাস
বিষাদগাথা
হারানো অতীত থেকে খাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র কিংবা সমকালীন রূপকথা। ₹২০০

এই লেখকের ছোটগল্প-সংকলন: নিমফুলের মধু ₹৬০
কবিতা-সংকলন: মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৬০

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
জীবনানন্দ থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ সরকার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখ কবি।
দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹২৫০

দে বুক স্টোর, বলাকা বুক স্টল, স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

একমসে ৩০০ টাকার বই কিনলে ফ্রি-ডেলিভারি।
চেক পাঠাবেন নীচের ঠিকানায়

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283 2320, 2280 8818
E-mail: info@swarnakshar.in
অনলাইন কিনতে ▶ www.swarnakshar.in

আমরা বিশ্বাস করি গ্রন্থনির্মাণ একশিল্প

কারিগর

মনন | চিত্রণ | গ্রন্থন

পাঠক গড়ার কারিগর

কৃতি একটি কারিগর প্রকাশনা

—: প্রকাশিত হচ্ছে :—

কারিগর

ডেঞ্জারাস মেয়ে স্বাতী ভট্টাচার্য বানান-বিবেচনা একটি অভিনব বানান অভিধান পবিত্র সরকার বিপুল তরঙ্গ রে অমিয় দেব ₹২৫০ ভাষা ভাষা কথা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ₹৩৩৫ শম্ভুদা : পুনশ্চ দেবতোষ ঘোষ বঙ্গে বর্গী বিহারীলাল সরকার সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ ₹২৮০ অনুভবে অনুধ্যানে রবীন্দ্রনাথ মাটির কেস্পাশন সম্পাদনা সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় আমার জীবন আলামোহন দাশ সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ হেমলতার রবীন্দ্রনাথ সংকলন ও সম্পাদনা সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় আন্তরিক পর্যটনে মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় বহিল আনন্দধারা সুকৃতি চক্রবর্ত্তী পিছে ফিরে দেখা নরেন্দ্রনাথ মিত্র আমার কথা কিছু কিছু রেবা হোর

জেলের ভেতর জেল। পাগলবাড়ি পর্ব ও হাজতি নম্বর মেয়াদী নম্বর (একত্রে) মীনাক্ষী সেন ₹৯০০

যে বই সত্তর দশকের রাজনৈতিক বন্দিত্বকালীন কারা অভিজ্ঞতার বিরল বিবরণ পাঠক লেখক গবেষক-সমাজকর্মী সকলের মনে তুমুল আলোড়ন তৈরি করেছিল। সেই বইয়ের বহু প্রতীক্ষিত অখণ্ড সংস্করণ।

হৃদয়চর্চা নিবন্ধ সংকলন নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সংকলন সম্পাদনা অভিজিৎ মিত্র ₹৫০০

কিংবদন্তি গল্পকারের পঠিত- লিখিত, প্রকাশিত- অপ্রকাশিত এই অপরূপ নিবন্ধগুলি কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিমনকে এক ভিন্ন কোণ থেকে দেখাতে প্রণোদিত করে পাঠককে। এটিই লেখকের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন।

কলকাতার কত রূপ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ₹২২০

আমাদের অবহেলায়-অবজ্ঞায় পড়ে থাকা শহর কলকাতার দর্শনীয় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানের এক অন্যরকম কাহিনি।

রমণী নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ₹৪০০

প্রাচীনা রমণীর প্রত্যঙ্গ কৌতূহল থেকে এই লেখাগুলি লেখা হয়নি, বরঞ্চ প্রাচীন সমাজে তাঁদের দৈনন্দিন অবস্থান কেমন ছিল, তার একটা সমঞ্জস বৃত্তান্ত সংকলন রমণী। বিষয়-ভেদ এবং আস্বাদন-ভেদে প্রত্যেকটি লেখা স্বতোবিভিন্ন হলেও সমস্ত লেখাগুলির মধ্যে আপ্রবন্ধ স্থির একটা স্থায়ী ভাব আছে—সে- ভাব অংশাই প্রাচীন সমাজে শত শত পৌরুষের যন্ত্রণার মধ্যেও রমণীর চলমান জীবন, তার প্রেম, তার ভালোবাসা, তার ঘৃণা-ভয়-জুগুপ্সা এবং সে নিজে।

বাংলার মন্দির হিতেশরঞ্জন সান্যাল ₹৩০০

বাংলার মন্দিরের স্থাপত্যরূপ বিশ্লেষণের সঙ্গে মন্দিরের নান্দনিক দিক নিয়ে আলোচনা। সঙ্গে দুর্লভ আলোকচিত্র।

কৃতি

নেতাজী ফিরেছিলেন

অনুজ ধর অনু. শৈবাল মিত্র

১৫ মেমোরি লেন আবীর মুখোপাধ্যায় বিশ্বদেশে বাঙালি শেখর দাস গল্পের গলি ছুঁয়ে অনিমেষ বৈশ্য

পয়মন্ত ও অন্যান্য গল্প শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ₹২০০

পূর্বে অছাড়ুই এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটির সঙ্গে লেখক আর যোগ করেছেন কয়েকটি গল্প। গাঁয়ে গঞ্জে চারপাশ অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে চরিত্রগুলির স্বার্থ-লোভ-লালসা-প্রেম-আত্মত্যাগে মাখা জীবনের অসংগতি। লেখকের নিজস্ব স্বাক্ষরে যা নয় মানবিকতার মেদুর।

এক জন্মেই জন্মান্তর অলখ মুখোপাধ্যায় ₹২৮০

জন্মান্তর হয় এক জনদেবেই। সত্যাসের প্রাক-পর্বের নিমাইচরিত এই আখ্যানের উপজীব্য। পরিবর্তিত সামাজিক এককগুলির সঙ্গে সংঘাতে যখন জন্ম নেয় নতুন সংস্কৃতি।

চিঠিপত্র

কারিগর kritkarigar@gmail.com । কৃতি boikriti@gmail.com । ৩৫বি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৪ ।
Website : www.karigarpublishers.com

বই পাবেন

স্মরণিকা ১৩এ, শিবদাস ভাদুড়ি স্ট্রিট । কলকাতা ৪ । শ্যামবাজারের কাছে । মো. ৯০৬২১২৩৪৫৬ । ৯০৬২১১১১১১
দে'জ পাবলিশিং । দে বুক স্টোর । কলেজ স্ট্রিট । amazon.in

অসহিষ্ণুতা এবং এক আশ্চর্য নীরবতা

অসহিষ্ণুতার প্রশ্নে দেশজোড়া বিতর্কে ক্রমশই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে মোদী সরকার। বিশিষ্টজনের নিন্দা-প্রতিবাদে যে সরকারের টনক নড়েছে, তা অবশ্য ভাবার কোনও কারণ নেই। সরকার বরং প্রতিবাদের বদলে আর-এক দফা প্রতিবাদ দিয়ে বিষয়টিকে রাজনীতির রঙে রাঙাতে চাইছে। সে কারণেই সম্প্রতি বিজেপি-ঘেঁষা কলাকুশলীদের নিয়ে দিল্লিতে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। সে মিছিলে অনুপম খের, মধুর ভাণ্ডারকর প্রমুখ একঝাঁক শিল্পী রাজপথে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা বিশিষ্টজনদের মুণ্ডপাত করেন। তাঁদের বক্তব্য, দেশে নাকি এমন কোনও পরিস্থিতি আদৌ তৈরি হয়নি, যাতে বলা যায় শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। একথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি তাঁরা, উপদেশের ঢঙে আরও বলেছেন, যাঁরা পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা তা না করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের উদ্বেগের কথা জানাতে পারতেন। প্রসঙ্গত, বিজেপির তল্পিবাহক কলাকুশলীদের মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, কাকে এঁরা বলবেন উদ্বেগের কথা? দাদরি কাণ্ড, কেরল হাউসের ঘটনা— এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দপ্তর থেকে নিন্দাসূচক সামান্য দু'-একটি শব্দও কি শোনা গিয়েছে? অথচ প্রধানমন্ত্রীর এই মৌনতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি অনন্য বাক্‌শিল্পী। কথার চাতুর্যে দেশে তো বটেই বিদেশেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। 'অচ্ছে দিন', 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর দিশারী তিনি, তাহলে সেই তিনিই আজ আশ্চর্যজনকভাবে নিশ্চুপ কেন! তাহলে কি ধরে নিতে হবে এই সব কাণ্ডে মৌনতা তাঁর সম্মতিসূচক?

প্রধানমন্ত্রী নাকি অনুপম খেরদের বলেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু সহিষ্ণুতা নয়, গ্রহণের কথাও বলে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সেকথা আমরাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, কিন্তু সেই গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ তো আপনাকেই সবার আগে দিতে হবে। কারণ, আপনিই দেশের কান্ডারি। সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, এতে নাকি আপনি চিন্তিত। এই নীরবতাই কিন্তু অসহিষ্ণুতার প্রতি আপনার প্রচ্ছন্ন সমর্থনের জল্পনাকে আরও উসকে দিচ্ছে। আর সামান্য কয়েকজন বশংবদ অনুগতদের পথে নামিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যকর ঠেকছে। আমরা বরং বলতে চাই যে, উদারনৈতিক সংসদীয় গণতন্ত্রের দৌলতে বিবেকবান ভারতীয় নাগরিকরা যে অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছেন, দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও প্রতিবাদের জায়গা রয়েছে, এতেই বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি প্রশংসিত হবে। বরং দাদরি কাণ্ড-কালবুর্গী হত্যার মতো ঘটনাতেই বিশ্বদরবারে দেশের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। একশো পঁচিশ কোটি মানুষের দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নরেন্দ্র মোদী একথাটি কেন বুঝতে পারছেন না, তা বোধগম্য হচ্ছে না। নাকি বুঝেও তিনি না বোঝার ভণিতা করছেন! ভাবছেন এভাবেই সঙ্ঘ-বিজেপি-র স্বপ্নজারিত 'হিন্দু ভারত' একদিন আত্মপ্রকাশ করবে! কিন্তু সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয়।

বিজেপির তল্পিবাহক কলাকুশলীদের মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, এঁরা কাকে বলবেন উদ্বেগের কথা? দাদরি কাণ্ড, কেরল হাউসের ঘটনা— এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দপ্তর থেকে নিন্দাসূচক দু'-একটি শব্দও কি শোনা গিয়েছে? অথচ এই মৌনতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

রা জ নী তি

মহাজোট

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দিল লালুপ্রসাদ ও নীতীশকুমারের দলের এই মেলবন্ধন।

সু মি ত মি ত্র

রাজনৈতিক আস্ফালনের প্রবৃত্তি সচরাচর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বড় ধরনের নির্বাচনী সাফল্যের পরক্ষণেই। এটি একটি জাতীয় ব্যাধি। গতবছর সাধারণ নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর বিপুল বিজয়ের পরক্ষণেই তাঁর ও তাঁর বাহিনীর আসল চেহারা প্রকটিত হতে শুরু করল। তা এক ধর্মান্ধ উদ্ধত ও ভারসাম্যহীন মানসিকতার মুখস্থবি। বিগত ১৮ মাস ধরে এই প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তারই প্রতিফলন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপর্যয়।

এই বিপর্যয়ের ধরনটি বিচিত্র। গত বছরের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ও জোটসঙ্গীরা ৪০টি আসনের ৩২টি জিতে নিয়েছিল। কারণ, দুই মোদী-বিরোধী শক্তি জেডিইউ ও আরজেডি-র দ্বৈরথ। অর্থাৎ নীতীশকুমার ও লালুপ্রসাদ যাদবের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু আসল বিভেদটি অন্যত্র। লালু যাদবের ও তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবীর একটানা পনেরো বছরের কুশাসনে বিগড়ে গিয়েছিল সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সমন্বয়। বিশেষ করে যাদব সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিম্নবর্গের ঘোর বিরোধ চলছিল। তারই সুযোগে এনডিএ এত আসন জেতে। কিন্তু নীতীশ ও লালুর সামাজিক প্রভাব কত গভীর ও বিস্তীর্ণ, তা বোঝা যায় জেডিইউ-আরজেডি-কংগ্রেসের জোট, অর্থাৎ 'মহাজোটবন্ধন', হওয়া মাত্র তাদের প্রভাবিত সম্প্রদায়গুলির মেলবন্ধন থেকে।

এই মেলবন্ধনেই বিজেপি কুপোকাত হল। যে-দল মাত্র দেড় বছর আগে একচেটিয়ে এগিয়ে ছিল রাজ্যের ৪২৩ বিধানসভা ক্ষেত্রের ১২৭টিতে, এবার তার হাতে রইল মাত্র ৫৩টি। সবচেয়ে বড় কথা, বিজেপি শুধু মুসলমান পরিতাজ্যই নয়, এখন দেখা যাচ্ছে অ-মুসলমানরাও কমলফুলে আর তেমন অনুরক্ত নয়। এবার বিজেপি বিহারে মোট ৬৯ জন উচ্চবর্ণের হিন্দুকে প্রার্থী পদে মনোনয়ন দিয়েছিল। তার মধ্যে জিতেছে মাত্র ২২ জন। বোঝা যাচ্ছে, বিহারের মতো মধ্য ও নিম্নবর্ণ (ও মুসলমান) প্রধান রাজ্যে বিজেপি-র শিখাধারী নেতারের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে আকর্ষিত করার ক্ষমতা নেই। তবে আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে বিজেপি সম্পর্কে অনীহা। এই অনীহার ফল ভোগ করতে হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝিকে। তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত এই নেতা হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা (হ্যাম) নামে দল গড়েছিলেন এই ভেবে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের সমর্থন অটুট থাকবে, তা তিনি যে-জোটেই থাকুন। এই ভেবেই তিনি বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ-তে যোগ দিয়ে ২০টি আসনে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু জিতেছেন মাত্র একটি আসনে। সেটি তাঁর নিজের। অপরদিকে অনেক ওঠাপড়ার সাক্ষী রামবিলাস পাসোয়ান, যিনি নিজে রাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী তফসিলি নেতা এবং এনডিএ-র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এবার তাঁর লোকজনশক্তি পার্টি একটি প্রার্থীকেও কোনও সংরক্ষিত আসন থেকে জেতাতে পারেননি। কিন্তু এত হিন্দুত্বের বড়াই করেও বিজেপি কেন তত হিন্দু সমাজেরও সমর্থন হারাচ্ছে? এ কি কেবল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দেশওয়ালা শাগরেদ অমিত শাহের ডোন্ট কেয়ার পরিচালন পদ্ধতির জন্যই? নাকি অন্য কিছু আছে মনে?

বিজেপির মুখ্য নিয়ামক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) অবশ্য এখন মোদী-শাহের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিজেকে নিষ্কলুষ প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত। সঙ্ঘপতি দলের কয়েকজন বর্ষীয়ান নেতা— লালকৃষ্ণ আডবাণী, যশোবন্ত সিংহ, মুরলীমনোহর জোশী প্রমুখ মোদী-শাহ জুটির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। শোনা যাচ্ছে তার পিছনে আছে আরএসএস-এর উসকানি। একদিকে অভিযোগকারী এই মার্গদর্শকমণ্ডলীর মত হচ্ছে, বিহারে কেন পরাজয় হল তার নিরপেক্ষ অনুসন্ধান প্রয়োজন। অন্যদিকে শাহ-গোষ্ঠী বলছে পরাজয়ের দায়িত্ব দলের সকলকেই বহন করতে হবে। অর্থাৎ যারা প্রকৃত দায়ী তাদের আড়াল করাই আসল উদ্দেশ্য। এই দ্বৈতভিন্নর সঙ্গে অমিত শাহের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত থাকা স্বাভাবিক। কারণ, আগামী জানুয়ারি মাসে দলের সভাপতি নির্বাচন। বিহার-হারের বদনামের কালি মুখে লাগলে শাহের পক্ষে পুনর্নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু পরাজয়ের দায়ভাগে মোদী বা শাহকে অংশীদার করলেও কিন্তু আরএসএস পার পাবে না। পরাজয়ের মূল কারণ নিঃসন্দেহে লালু-নীতীশ মেলবন্ধন, এবং তার স্রোতে নিম্নবর্গের যেসব মানুষ গতবছর এনডিএ-র পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের আপন নীড়ে ফিরে যাওয়া। কিন্তু এই মেলবন্ধনে অনুঘটকের ভূমিকা যদি কেউ নিয়ে থাকে, সে হল পুরো সঙ্ঘপরিবার।

সঙ্ঘের নেতৃত্ব ভারতীয় রাজনীতিতে নীতীশের প্রকৃত অবস্থানটিই বুঝতে পারেননি। এই মানুষটি লালুপ্রসাদের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে হঠাতে আদর্শগত বিসারে সম্পূর্ণ বিপরীত বিন্দুতে অবস্থানকারী বিজেপি-র সঙ্গে জোট করে সরকার গঠন করেছিলেন। ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন মধ্য ও নিম্নবর্গের অধিকাংশ শ্রেণির আস্থাভাজন, এমনকী মুসলমানদেরও। সং ও কর্মঠ এই মানুষটির যে আবার লালুপ্রসাদের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত

জয়ের পর তৃপ্তির হাসি দু'জনের মুখেই: আলিঙ্গনরত লালুপ্রসাদ ও নীতীশকুমার

হবে না, তা না বুঝেই ২০১৪ নির্বাচনে বিজেপি প্রচারকেরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রভূত কটূক্তি করে। লোকসভা নির্বাচনে মোদীর জয়লাভের পর যখন নীতীশ বিহারে পরাজয়ের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেন, তখন বিজেপির তরফ থেকে তাঁকে দায়িত্বে বহাল রাখার কোনও চেষ্টাই করা হল না। বিজেপির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের পূর্বসম্পর্কটি অগ্রাহ্য করে তাঁকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হল। অতঃপর যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীর প্রতি মানুষের আস্থা টলতে শুরু করল, তখন লালুপ্রসাদের দিকে নীতীশ তো সখ্যের হাত বাড়াবেনই।

তবে সদ্য পরিবার আসল সেমসাইড গোলটি করল নীতীশ-লালু মহাজোট বন্ধনের পর নির্বাচনী প্রচারের মুখে। দিল্লির নিকটবর্তী উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে 'গোহত্যাকারী' এই অছুহাতে এক সম্পূর্ণ নিরপরাধ মুসলমানকে একদল 'ধর্মপ্রাণ' যুবক খুন করল। সেই মামলায় অভিযুক্তরা অনেকেই বিজেপির স্থানীয় সদস্য বলে পরিচিত। সেই সুবাদে গৈরিক নেতারা অনেকেই আসরে অবতীর্ণ হলেন। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বললেন, অনেকটা বাংলার 'দিদি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে, 'সব ছোট ঘটনাকেই বড় করে দেখা উচিত নয়।' এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, যিনি নিজে স্থানীয় সাংসদ, বলেছিলেন যে, এই হত্যাকাণ্ডটি নিছক দুর্ঘটনা যাকে সাম্প্রদায়িক রং চড়ানো হচ্ছে। আর-এক নেতার মতে, যারা হইচই করছে তাদের গন্তব্যস্থল হওয়া উচিত পাকিস্তান।

নির্বাচন যত এগিয়ে এল ততই যেন দায়িত্বজ্ঞানহীন ও প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল সঙ্ঘ পরিবার। ২০১১ জনগণনার ধর্মসংক্রান্ত পরিসংখ্যানের দিকে একটি আলটপকা ইঙ্গিত ছুড়লেন আরএসএস প্রধান। দেশে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত কেন কমছে? কেন বুদ্ধি পাচ্ছে মুসলমান অনুপাত? প্রশ্নটির উত্তর শিক্ষিত মানুষের কাছে পরিষ্কার। ভারতে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণির নিম্নতম পঙ্‌ক্তিভুক্ত। জনতত্ত্ববিদেরা জানেন, দরিদ্র শ্রেণির জন্মহার বেশি। অবশ্য অর্ধশিক্ষিত ও গোঁড়াদের মধ্যে 'হম দো, হমারা পাঁচ' এই বদ রসিকতাটি প্রায়ই শোনা যায়। ভাগবতও মনে হয় এই ধারণার দ্বারাই অনুপ্রাণিত। তিনি ফস করে এ-ও বলে ফেললেন যে, অনুন্নত শ্রেণির মধ্যে আরক্ষণ ব্যবস্থারও আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। রহস্যটি লুকিয়ে আছে এই সব উক্তির সময় নির্বাচনে।

বিহারের মুসলমান জনসংখ্যা ১৬.৫ শতাংশ (২০১১ সালে)। মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে আরএসএস নেতার উদ্বেগ প্রকাশের উপযুক্ত সময় নিশ্চয়ই বিহার নির্বাচন নয়। বরং তা হায়দরাবাদ থেকে আগত MIM দলকে দিয়ে মুসলমান ভোট ভাঙার যে-ফর্মুলাটি রচিত হচ্ছিল, তা বানচাল করতে প্রভূত সাহায্য করেছে। MIM নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েসি ফিরে গিয়েছেন শূন্য হাতে। ওদিকে মধ্যবর্তীয়দের (OBC) সংরক্ষণের জন্য আন্দোলনের জন্মভূমিটি বিহার। ভাগবতের উদ্ধার আসল কারণটি হয়তো এটাই যে, OBC-র মধ্যে বেশ কিছু মুসলমান বর্তমান। কিন্তু এক ধাক্কায় ভাগবত সংরক্ষণ ব্যবস্থার মুণ্ডপাত করার ফলে লালুপ্রসাদেরা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। বিহারসহ অধিকাংশ রাজ্যে সম্পূর্ণ যাদবকুল OBC-র অন্তর্গত।

কিন্তু বিহারে বিজেপিকে পরাজিত হতে দেখে আরএসএস-এর নেতা ও তাঁর সমর্থকদের এত আগ্রহ কেন? এর উত্তর খুঁজতে পিছন ফিরে দেখতে হয়। মোদী ১৩ বছর সমৃদ্ধ রাজ্য গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রাজনীতিকে সমৃদ্ধতর করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গর্ভিণদের দিল্লি নয়, গুজরাত ভারত নয়, এবং ভারতের মতো বহুত্বময় দেশ পরিচালনার জন্য মোদীর একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতি মোটেই উপযুক্ত নয়। ২০১৩ সালে যখন মোদীকে দলের প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসেবে বাছাই করা হয়, তখন আডবাণী তাঁর প্রতিবাদে দলের শীর্ষতম কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু ভাগবতের অনুরোধে দেলে আরএসএস প্রধানের অনুরোধ আসলে আদেশ) আডবাণী একদিনের মধ্যেই পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

মোদী, শাহ ও ভাগবত— এই ত্রয়ীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের কারণগুলি সরাসরিতো. নীতীশকুমার গত ফেব্রুয়ারিতে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর মোদী তাঁকে কাছে টানতে কোনও চেষ্টাই করেননি। রাজটির মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। কোনওভাবে সরকারি ঋণের বোঝা কমাতে কেন্দ্র এতটুকু সাহায্য করলেও নীতীশকুমার হয়তো লালুপ্রসাদের মতো দুর্নীতিপরায়ণ মানুষকে— যিনি বর্তমানে এক সাজাপ্রাপ্ত আসামি— কাছে টেনে নিতেন না। কিন্তু মোদী সাহায্য তো করলেনই না, বরং তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নীতীশকে উত্তাক্ত করতে।

মোদী প্রায়ই ভুলপথে চলেন। তার কারণ, শোনা যায়, তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নন, একমাত্র অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ব্যতীত। আরএসএস চিরকাল পিছনের আসন থেকে বিজেপি নামক গাড়িটি চালিয়ে এসেছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে তাঁর সঙ্গে সঙ্ঘের বোঝাপড়া ছিল, যার ফলে সেই সময়ে আরএসএস সরকারের বিরুদ্ধ নীতির সমালোচনা করলেও, তার সাম্প্রদায়িক উগ্রনীতি সামনের সারিতে হাজির করে বাজপেয়ীকে বিব্রত করেনি। কিন্তু মোদী তোয়াক্কা করেন না বিজেপিকে, না আরএসএস-কে। মোদীর ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁর প্রতি যেমন বিরক্ত বর্ষীয়ানেরা, যথা অরুণ শৌরী, তেমনই অখুশি তাঁর অনেক ক্যাবিনেট সতীর্থরাও। যেমন, নীতীন গডকড়ী বা সুষমা স্বরাজ। অবশ্য সঙ্ঘের প্রথা মেনে তাঁদের মুখে এখনও কুলুপ।

বিহারে বিজেপির ভরাডুবিকে নানা চোখে দেখছেন নানা মানুষ। শিল্পপতিরা ভাবছেন, এবার হয়তো মোদী তাঁর শাখুকবুদ্ধি পরিহার করে কংগ্রেসসহ বিরোধীদের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়বেন, যার ফলে অর্থনীতিতে নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার আশা থাকবে। অর্থাৎ, কংগ্রেস নেতা বা তৃণমূলের নেত্রীর হাতেপোয়ে ধরে যেন মোদী রাজ্যসভার সমর্থন লাভ করেন, পণ্য পরিষেবা কর বা শ্রম আইন সংশোধনসহ নানাবিধ জরুরি আইন পাশ করার ক্ষেত্রে।

কিন্তু মোদী অপেরর সঙ্গে মানিয়ে চলার মানুষ নন। যত তিনি একলা চলবেন, তত তাঁকে সঙ্ঘ পরিবারের ও দলের প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু প্রতিবাদ ধ্বনিত হবে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভাষায়। তা ছাড়াও ক্রমশই দলের সাংসদ ও মন্ত্রীরা ক্ষোভ উগরে দেবেন। তাঁরাও হয়তো মোদীকে কাজের কাজ কিছু না করে মামুলি বক্তৃতা দিতে ঘনঘন বিদেশ যাওয়ার জন্য টিকিরি করবেন। হয়তো কংগ্রেস উপসভাপতি রাহুল গাঁধীর কথাই ঠিক, 'এবার মন দিয়ে অ্যাকসিলারেটর দাবান মোদীজি, নইলে লোকে গাড়ির দরজা খুলে আপনাকে টেনে ফেলে দেবে।'

বিহারে পরাজয়ের খবর জানতেই শুনশান বিজেপির দপ্তর

অর্থনীতি

সংস্কারের সদিচ্ছা আছে কি?

মোদী তৎপর হয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

অরিন্দম বণিক

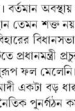

হঠাৎ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে পড়েছেন। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বেশ কিছু কর্মসূচি ছিল প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনায়। প্রস্তাবগুলিতে সম্মতিও পাওয়া যাচ্ছিল লোকসভায়। রাজ্যসভায় ফলাফল ছিল বিপরীত, কেননা এখানে প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি পাওয়া দুষ্কর। বর্তমান অবস্থায় রাজ্যসভায় শাসক দলের অবস্থান তেমন শক্ত নয়। সাধারণভাবেই নজর ছিল বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের ওপর। সেই ক্ষেত্রটিতে প্রধানমন্ত্রী প্রচুর খেটেছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল মেলেনি। উপরন্তু নিন্দকেরা বলছেন, 'মোদী একটা বড় ধাক্কা খেলেন, তাঁর বিশাল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করতে গিয়ে।' কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অতীত কার্যক্রমের ঘটনাবলি থেকে বোঝা যায় মোদী দমে যাওয়ার মতো পাত্র নন। আবার এই মধ্যে তাঁকে যেতে হবে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে কিংবা বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে। সমালোচনাও হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যপ্রণালী নিয়ে বলা হচ্ছিল, 'কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হও।' নিশানা ছিল মোদীর দিকেই। মোদ্দা কথা হল, বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ নিঃসাহিত হয়ে পড়েছেন ভারতে বিনিয়োগ করতে। অন্তর্ভু আইনি বাধা এবং অন্তরায়, বিশেষত প্রতিরক্ষা এবং খুচরো বিপণন ক্ষেত্রে।

গত কয়েকমাস ধরেই ক্যাবিনেটে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। সিদ্ধান্তগ্রহণে এবার স্বয়ং মোদীকেই মুল ভূমিকা নিতে হবে বলে মনে করা হচ্ছিল। এর ফলশ্রুতি গত ১০ নভেম্বরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা। এতে অন্তত ১৫টি সেক্টর প্রভাবিত হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা, ব্যাঙ্কিং, খুচরো ব্যবসা, প্ল্যানটেশন (আবাদি খাত), নির্মাণ শিল্প, এভিয়েশন এবং মিডিয়া ও ব্রডকাস্টিং। সরকারি কর্মকর্তাগণ আশা করছেন, এই ঘোষণায় ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির কাছ থেকে অন্তত ১৪ বিলিয়ন

MERCK

Neurobion Forte®

জীবনটা আবার বাঁচুন, প্রাণভ'রে!

আমরা সবাই জীবনে ভাল করতে চাই এবং স্বীকৃতি লাভ করতে চাই। যখন আমরা সেটা করি তখন আমরা পরিবারের সাথে বিশেষ মুহূর্তগুলো হারাতে চাই না।

কিন্তু আজকের দ্রুত গতির জীবনে দুর্বলতা এবং ক্লান্তি আমাদের পিছনের দিকে টেনে নিয়ে আসে এবং আমরা জীবনের সুবর্ণ মুহূর্তগুলোকে হারিয়ে খেলি।

এই দুর্বলতা এবং ক্লান্তি ভিটামিন বি-এর অভাবে হতে পারে।

1 ভিটামিন বি কমপ্লেক্সগুলো কি কি এবং কেন আমাদের সেটা প্রয়োজন হয় ?

বি কমপ্লেক্স ভিটামিনগুলো শরীরের বৃদ্ধি, উন্নতি এবং বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়ার জন্য অত্যাবশ্যক। তারা শরীরের সার্বিক বৃদ্ধি এবং জীবনীশক্তির জন্য অত্যাবশ্যক।

অস্বাস্থ্যকর এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের সময়, ইত্যাদি আপনার ভিটামিন বি-এর স্তরকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

2 নিউরোবিয়ন ট্যাবলেটগুলি কি কি এবং এটি কিভাবে সাহায্য করে ?

নিউরোবিয়ন ফোর্ট হল বি কমপ্লেক্স ভিটামিনের একটি কম্বিনেশন বা সমন্বয় যা আপনাকে সুস্থ এবং সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। লোকেরা বিভিন্ন কারণে দুর্বলতা, ক্লান্তি এবং অবসাদে ভুগতে পারে। এই সব উপসর্গগুলোর একটা কারণ হতে পারে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাব। নিউরোবিয়ন ফোর্ট দিয়ে এই সব ভিটামিনগুলোর সম্পূরকতার ফলে দুর্বলতা, ক্লান্তি এবং অবসাদের অনভূতি কম হয়। এটি হল ভারতের নং 1 ভিটামিন ব্র্যান্ড ও ডাক্তারদের বিশ্বস্ত নং 1 ব্র্যান্ডও।

3 কারা নিউরোবিয়ন ফোর্ট খেতে পারে এবং এটি কিভাবে নিতে হবে ?

নিউরোবিয়ন ফোর্ট সেই সব পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ভাল যারা নিজেদেরকে আজকালকার ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যেও শারীরিকভাবে সুস্থ এবং মানসিকভাবে সচিক্ষ রাখতে প্রচলনাবে আকাঙ্খা করে। এই ট্যাবলেট রোজ একটা করে অথবা ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী নেওয়া যেতে পারে।

4 এই প্রোডাক্টের কি কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে ? এটি কি আসক্তিজনক ?

সাধারণতঃ প্রস্কাবিত মাত্রায় এটি ভাল ভাবে সহনীয় এবং আসক্তি জনক নয়। যদি আপনি এর ফলমুলেশনের কোনো উপাদানে অ্যালার্জিক হয়ে থাকেন, তাহলে এটি ব্যবহার করবেন না।

5 এর দাম এত কম, তাই এর গুণগত মানের সাথে কি আপোস করা হয় ?

নিউরোবিয়ন ফোর্ট-এর প্রস্তুতকর্তা হল দি হ্যান্ডস অফ মার্ক, বিশ্বের প্রাচীনতম ফার্মা কোম্পানী যার 350 বছরেরও বেশী সময়ের ইতিহাস আছে। তারা যে প্রোডাক্টগুলো তৈরী করে, তাদের প্রত্যেকটির গুণগত মানের ওপরে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তাই নিউরোবিয়নেও তারা শ্রেষ্ঠ মানের ভিটামিন বি ব্যবহার করে।

এগিয়ে যান এবং আজই নিউরোবিয়ন ফোর্ট শুরু করুন... রোজ ! নিউরোবিয়ন ফোর্ট - জীবনটা আবার বাঁচুন, প্রাণভ'রে!

*এসআরপি সমস্ত ট্যাক্স সহ নিউরোবিয়ন ফোর্টের 10 টা ট্যাবলেটের একটা স্ট্রিপের জন্য

নিউরোবিয়ান ফোর্টের ওপরে আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্য, **নিউরোবিয়ান এক্সপার্ট**- এর সাথে সংযোগ স্থাপন করুন :
টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন : 18001038888, অথবা SMS করুন 8861308888-এ, ইমেল করুন : myneurobion@merckgroup.com

একটা ক'রে ট্যাবলেট প্রতিদিন, নয়তো চিকিৎসক যেমন বলবেন (কেবল পূর্বনির্ধারণের জন্যে)। পরিষ্কৃতির উন্নতি না-হতে পরে যদি তা' নিউরোবিয়ন ফোর্ট ট্যাবলেটে উপস্থিত ভিটামিন বি'র ঘাটতি ছাড়াও অন্য কোনো কারণে হয়। বিশদ জানতে হ'লে আজই আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

*As per the Medical Audit (ESPRIT) MAT MAY 2015 dataset in terms of prescribers in the Vitamins/Minerals/Nutrients Category. ** As per SSA MAT MAY 2015 Dataset in terms of units in the Vitamins/Minerals/Nutrients/Solids Category. "The image of doctor is for representation purposes only" MERCK LIMITED. Shiv Sagar Estate 'A', Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, India.

IND/07/15/NEF/1138

কেয়া বাত

■ মোদীজি, এবার কাজ করুন! এক বছর হয়ে গেল, আপনার গাড়ি এখনও স্টার্ট নেয়নি। এবার অ্যাক্সিলারেটরে চাপ না পড়লে দেশের মানুষ দরজা খুলে আপনাকে গাড়ি থেকেই নামিয়ে দেবে। বিদেশ সফরে না গিয়ে কৃষক, শ্রমিক এবং যুবকদের কাছে যান।

রাহুল গাঁধী

■ বিহারে জিতে মোদী কলকাতায় ঢুকতে চেয়েছিলেন। বিহারবাসী রুখে দিয়েছেন। মোদীর উচিত ইস্তফা দিয়ে গুজরাত যাওয়া।

লালুপ্রসাদ যাদব

■ আমার মনে হয় নরেন্দ্র মোদী দারুণ কাজ করছেন। কিন্তু ওঁর নিজের দল ওঁকে সুযোগ দিচ্ছে না। আমাদের ওঁকে পাঁচ বছর কাজের সুযোগ দেওয়া উচিত। তারপর না হয় বিরোধিতা করব।

মুনমুন সেন

■ প্রথমে দিল্লি, তারপর কেরল, এ বার বিহার। মানুষ নিজেই 'আচ্ছে দিন' নিয়ে আসছেন।

সীতারাম ইয়েচুরি

■ যোগ্য লোকদের বাইরে রেখে দু'জন গুজরাতি (নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ) নির্বাচন পরিচালনা করেছেন। তালি ও গালি দুটোই তাঁদের প্রাপ্য।

শত্রুঘ্ন সিনহা

■ দাবায় রাজা যতক্ষণ বোর্ডে রয়েছে ততক্ষণ লড়াই চলে। আমিও নিজেকে সেই রাজা হিসেবে কল্পনা করতেই ভালবাসি, যে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে চায়। আর এটাই আমাকে আবার সেরা ফর্মে ফিরে আসার অনুপ্রেরণা জোগায়।

বিশ্বনাথন আনন্দ

■ ওইসব একশো টেস্ট নিয়ে ভাবনা-চিন্তা জীবনের পরের দিকে করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন একটাই লক্ষ্য, ১-১ করা।

এবি ডে'ভিলিয়ার্স

খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে

ডলার বিনিয়োগের আশ্বাস পাওয়া যেতে পারে।

সিঙ্গাপুরগুলির ধরন কেমন? প্রতিরক্ষা থেকেই শুরু করা যাক। বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণ এই খাতে বর্তমানে ২৪ শতাংশ থেকে ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারেন 'অটোম্যাটিক' রুট ধরে। এটা এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে না। উপরন্তু বিনিয়োগকারীরা ৪৯ শতাংশ অবধি বিনিয়োগ করতে পারেন ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে। এতেও সরকারি অনুমতির প্রয়োজন নেই। এই খাতে পূর্বে আইনি জটিলতা ছিল। কিন্তু বর্তমান সিদ্ধান্তে বিদেশি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হতে পারে।

খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, কিছু কিছু ভারতীয় খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশি বিনিয়োগ রয়েছে বলে এদের 'অনলাইন' মাধ্যমে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করা নিয়ে কোনও সঠিক ব্যাখ্যা ছিল না। বর্তমান সিদ্ধান্তে এই সব প্রতিষ্ঠানকে 'অনলাইন' ব্যবসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। একক বিদেশি খুচরো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানদেরও এ ব্যাপারে সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্বে অনলাইনের মাধ্যমে ব্যবসা করতে হত মূলত দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। ফলশ্রুতিতে অনলাইন ডিসকাউন্টিং প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারে। যার ফলে লাভবান হবে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলি। তেমনইভাবেই পরিবর্তন এসেছে ফার্মিসারের ক্ষেত্রে। এইসব কোম্পানির জন্য নিয়ম রয়েছে, ৩০ শতাংশ কাঁচামাল এদের দেশীয় মাধ্যম থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এই নিয়মের কার্যকারিতার দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল বিদেশি মুদ্রা প্রাপ্তির দিনক্ষণ থেকে। বিদেশি মুদ্রাপ্রাপ্তি আর স্টোর খোলার দিনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান রয়েছে। নতুন নিয়মে নির্ধারিত ৩০ শতাংশ কাঁচামাল সংগ্রহ কার্যকর হবে প্রথম স্টোর উদ্বোধনের দিন থেকে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় ব্রডকাস্টিং সেক্টরও প্রাধান্য পেয়েছে। এফ এম রেডিয়োতে বিদেশি বিনিয়োগ ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৯ শতাংশ। অন্য দিকে টেলিপোর্ট, কেবল সার্ভিস এবং হেড অ্যান্ড ইন দ্য স্কাই (HITS) ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়বে ১০০ শতাংশ। পূর্বে এই মাত্রা ছিল ৭৪ শতাংশ।

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সমৃদ্ধ চ্যানেলগুলিতে সরকারি অনুমতি সাপেক্ষে আপলিঙ্কিং এর জন্য বিনিয়োগ ২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৯ শতাংশ। উল্লেখ করা যেতে পারে সাধারণ আমোদ-প্রমোদ সম্পন্ন চ্যানেলগুলিতে বিদেশি বিনিয়োগের মাত্রা হল ১০০ শতাংশ, সরকারি অনুমোদন ব্যাতিরেকে। এ ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রালয়ে একটি তথ্য বলার মতো। এই মন্ত্রালয় দেশের ৬৯টি শহরে ১৩৫টি চ্যানেল অকশন করেছে। এ পর্যন্ত মন্ত্রালয় আয় করেছে ১,১৫৭ কোটি টাকা। বলা হচ্ছে বর্তমান ঘোষণায় বাসস্থান ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি প্রজেক্টগুলি উপকৃত হবে। পূর্বে বিদেশি বিনিয়োগ এক্ষেত্রে ২০,০০০ বর্গ মিটার অবধি সীমিত ছিল। আর বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান ঘোষণায় এই নিয়ম শিথিল হয়েছে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীগণ প্রজেক্ট সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিনিয়োগ নিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হোটেল, বৃদ্ধাশ্রম এবং রিসর্ট। আশা করা হচ্ছে এ দেশের অনেক পুরনো এবং ঐতিহ্যবাহী প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবে।

এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবে প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলিও। বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা এই খাতে ৭৪ শতাংশ অবধি বিনিয়োগ করতে পারেন। অভিজ্ঞ মহলের মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদী এরপর আরও দৃঢ় পদক্ষেপ নেবেন। এর মধ্যে রয়েছে মিন্সিসভার সম্ভাব্য পরিবর্তন। অভাব রয়েছে যোগ্য ব্যক্তির। ভারতে সবাই কথা বলতে ভালবাসেন। কিন্তু এঁদের অনেকেই কাজেকর্মে অষ্টরম্ভা! মোদী তাই খুঁজছেন যোগ্য ব্যক্তি যাঁরা কথায় বড় না হয়ে কাজে বড় হবেন।

জননী

মেতে আছে ও যেন কী গানে...

ডাঃ গৌতম খাস্তগীর

অভিনন্দন। ২০ সপ্তাহ মানে আপনি প্রেগন্যান্সির মধ্যপর্বে পৌঁছে গেছেন। সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার সবসময় আপনার জন্য নিত্যনতুন চমক ছুঁড়ে দিচ্ছে। এ সময়টা সবচেয়ে বেশি যা আপনার এবং অন্যদের নজরে আসে তা হল মধ্যপ্রদেশে বিরাট স্ফীতি। বুঝতেই পারছেন গর্ভের সন্তান এখন হু হু করে রোজ বাড়ছে। তার দৈর্ঘ্য আনুমানিক ২০ সেন্টিমিটার। ওজন বেশ বেড়েছে, ২৫৫ গ্রাম। সে এখন জরায়ুতে যে তরলের মধ্যে ভাসমান সেই অ্যামনায়োটিক ফ্লুইডও খেতে শুরু করেছে। তার কিডনি অল্পস্বল্প হলেও কার্যকরী, সুতরাং সামান্য হলেও প্রস্রাব তৈরি হচ্ছে। দেহে সর্বত্র চুলের পূর্বাবস্থা অর্থাৎ রোঁয়া গজাতে আরম্ভ করেছে। সন্তানের দেহে স্পর্শ ব্যাপারটা প্রখর হতে শুরু করে কারণ স্নায়ুর সেনসরি ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়ে যায়। স্বাদ, গন্ধ, শোনার ক্ষমতা, দৃষ্টি কিংবা স্পর্শ– এগুলো মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট জায়গায় বিকশিত হতে শুরু করে। ২১ সপ্তাহ পৌঁছলে শিশুর শরীর একধরনের পিচ্ছিল পদার্থে ঢাকা পড়ে। সেটা আর কিছুই না, এতদিন একটানা অ্যামনায়োটিক ফ্লুইডে ডুবে থেকে ত্বকের যেন কোনও অসুবিধে না হয় সেজন্য। এর নাম ভার্নিক্স কেজিওসা। শরীর যে এই পিচ্ছিল পদার্থে ঢেকে যায়, তা নিয়েই কিন্তু অনেকে জন্মায় বিশেষত কারও যদি নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা আগে জন্ম হয়। ২২ সপ্তাহ মানে গর্ভের সন্তানের চোখের পাতা এবং পাতার লোম বা আইল্যাশ পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে। হাতের আঙুলে নখ উপস্থিত এবং তা আঙুলের ডগাকে ঢেকে রাখে। এখন থেকে কী কথা বলছেন, কীভাবে বলছেন সে ব্যাপারে একটু যত্নবান হোন কারণ গর্ভে থাকলেও আপনার সন্তান যে সব শুনতে পাচ্ছে! বিদেশে গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে এ সময়ে আপনি তাকে গান শুনিয়ে, কথা বলে বা গল্প শুনিয়ে ব্যস্ত রাখতে পারেন। এটাও কয়েকটা সমীক্ষা জানাচ্ছে যে গর্ভে থাকার সময় যে গান বা গল্প করতেন, জন্মের পর স্তন্যদানের সময় যদি একই জিনিস নবজাতককে শোনান তাহলে তার বুকের দুধ পান করার মাত্রা এবং গতি বেড়ে যাবে। অভাবনীয়!

২৩ সপ্তাহ থেকে তার দুটি ঠোঁট অনেক বেশি বিকশিত দেখাবে। তার চোখও এখন তৈরি হয়ে গেছে। তার দেহে অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস যা থেকে হরমোন ক্ষরণ হবে, সেটাও তৈরি হতে শুরু করেছে। মাড়ির ধার বরাবর এবার দাঁত তৈরি হওয়ার ইঙ্গিত মেলে। ২৪ সপ্তাহে শিশু মাপে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার। তার ফুসফুসে রক্ত চলাচলের জন্য শিরা তৈরি হতে আরম্ভ করে। সেটা ভবিষ্যতে যাতে ঠিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া যায় তারই প্রস্তুতি। গর্ভের সন্তান কিন্তু মাত্রায় অল্প হলেও রোজ অ্যামনায়োটিক ফ্লুইড পান করে। যদিও সেজন্য তার পায়ু দিয়ে বর্জ্য কিন্তু জন্মের আগে নির্গত হয় না। দেখা গেছে এই সময়ে যদি গর্ভের সন্তান কোনও কারণে ভূমিষ্ঠ হয়, উপযুক্ত সেন্টারে ভাল যত্ন ও ব্যবস্থাপনায় রাখলে তাকে কিন্তু বাঁচানো যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞান ততটাই অগ্রগতি করেছে।

২৫ সপ্তাহে পৌঁছতে পৌঁছতেই আপনার গর্ভে শিশুর ওজন আগের সপ্তাহের চেয়ে অন্তত ১১৫ গ্রাম বেড়েছে। এখন সে একটাই বাড়তে থাকে যে আপনার জরায়ুর ওপর চাপ পড়ে। প্রায় ভর্তি হয়ে যায় ইউটেরাস। শিশুর শরীরের তাপমাত্রা যাতে বজায় থাকে সেজন্য তার বৃক, ঘাড় এবং দু পায়ের খাঁজে অর্থাৎ কুঁচকি অঞ্চলে ব্রাউন ফ্যাট জমা হয়। ২৬ সপ্তাহে আপনার শিশু শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। যদিও তার ফুসফুসে আদৌ বাতাস ভরা থাকে না। এখন তার যাবতীয় সেন্স বা অনুভব বাড়তে থাকে। এ সময়ে ব্রেন স্ক্যান প্রমাণ করেছে যে আপনার গর্ভে থাকা শিশুটি স্পর্শে প্রতিক্রিয়া দেখায় বা দেখাতে চায়। আপনার পেটে যদি তীব্র আলো ফেলা হয়, এটা লক্ষ করা গেছে যে আপনার সন্তান তখন আলোর উৎসের দিকে মাথা ঘোরাবে। সুতরাং এই গবেষণা প্রমাণ দেয় যে অপটিক নার্ভ বা চোখের স্নায়ু কাজ করতে শুরু করেছে। ২৭ সপ্তাহে আপনার সন্তানের মাপ ৩৭ সেন্টিমিটার। তবে এই মাপ তখনই পাওয়া যাবে যদি তার পা পুরোপুরি মেলা থাকে। যদি আপনার সুযোগ হত, দেখতেন এই সময়ে সে চোখ মেলে তাকাচ্ছে। সে দিব্যি চোখ খুলতেও পারছে। ৬ মাসের শেষদিকে যত এগোবে, তার শোনার ক্ষমতাও বাড়বে। শব্দে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, তার জন্য স্নায়ু প্রস্তুতি শুরু করবে। এবার তার শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার অভ্যেসটা প্রকট হবে যদিও আসলে সে তখনও জলের মধ্যেই শ্বাস নিচ্ছে। কিন্তু অভ্যেসটা তৈরি থাকলে জন্মের পরে আর কোনও সঙ্কট সৃষ্টি হবে না।

সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে পৌঁছনো আপনার নিজের দিক থেকেও একধরনের আশ্বস্ত হওয়া যে এবার মিসক্যারেজ বা গর্ভচ্যুতির সম্ভাবনা কমল। সাধারণত এতদূর আসতে পারলে সচরাচর তেমন দুর্ঘটনা আর ঘটে না। তবে ব্যতিক্রমও আছে সেটা মনে রাখতে হবে। আরেকটা বড় সমস্যা থেকে অনেক মহিলা এই সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে মুক্তি পান। সেটা বেশ বিরক্তিকর সমস্যাই– মর্নিং সিকনেস। এ সময়ে অনেকটা কমে যায়। ১৪ সপ্তাহ পৌঁছলেই খেয়াল করবেন আপনাকে অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখায়। অন্তত প্রথম তিন মাসের অনুপাতে তো বটেই। অনেকে প্রেগন্যান্ট হওয়ার পর পরই শরীর ও মনে তো একধরনের ঝড় বয়ে যায়। সেটা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কবে কিছু মহিলার দুর্ভাগ্য যে এ সময়ে পৌঁছেও তাঁদের গা বমি বমি ভাবটা তেমন কমে না। তখন একধরনের বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন। এখনও প্রসবের অনেক দেরি কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকের বুকে কোলোস্ট্রাম নামক দুধের মতো তরল তৈরি হতে শুরু করে দেয়। এই তরলই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্তন্যদানে শিশু পান করে। তার পর বুকের দুধ গাঢ় হয় এবং কোলোস্ট্রামের জায়গা নেয়। ১৫ সপ্তাহে আপনার সব ব্যাপারে এনার্জি অনেক বাড়ে। বাড়িতে বন্দীদশা কাটানোর আর দরকার নেই, বাইরে বেরিয়ে এবার হাঁটা শুরু করতে পারেন। বিদেশে এ সময়ে অনেকে হালকা অ্যারোবিক এক্সারসাইজও করেন। জীবনে স্ফূর্তি ফিরে আসে।

বৈ দে শি কী

বিকল্পহীন অপ্রতিরোধ্য সু চি

মিয়ানমারের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করল, আউং সান সু চি আজও সমান জনপ্রিয়, জননেত্রী।

সা য় ম ব দ্যো পা ধ্যা য়

তাঁকে বলা হচ্ছে, তিনি ও তাঁর চল্লিশজন পার্ষদ যেন এ রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরেন। নির্দেশ অমান্য করলে তারা শুরু করতে ছিধা করবে না। সেনাবাহিনীর বন্দুকের নিশানা তাঁদের দিকেই করা আছে। অথচ, এই দানবিষ্ব শহরে তাঁর পার্টির অফিসে যেতে হলে এটিই সবচেয়ে সোজা রাস্তা। তাঁকে আসলে ঘুরপথে চালিত করতে চায় সেনাবাহিনী। যাতে তাঁরা পথঘাট বন্ধ, বিপদে পড়েন। জারি আছে মার্শাল ল। তিনি কিন্তু অক্লান্তভাবে করে চলেছেন আসন্ন নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচার। সামরিক শাসক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পথায় তাঁর পথ আটকানোর চেষ্টা করে চলেছে। এখানেও তাই। তিনি রাস্তার মাঝখান ছেড়ে রাস্তার ধারে চলে গেলেন। যেই সেদিকে গেলেন, অমনি আর-এক সেনা অফিসার বলে উঠল, রাস্তার ধার দিয়ে যাওয়াও চলবে না, রাস্তাটিই ছাড়তে হবে। না হলে এক্ষেত্রেও তারা গুলি চালাবে। আউং সান সু চি তখনই ঠিক করেন, তিনি সেনা আদেশ মানবেন না। ব্যারিকেড ভেঙেই এগোবেন। নিজেকে সকলের আগে নিয়ে এসে, এক পা-দু'পা করে ক্রমশ বন্দুকের নলের সামনাসামনি এসে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই সন্ত্রস্ত, ভয়ার্ত। যে-কোনও মুহূর্তে হয়তো নিঃসঙ্কোচে গুলি চালিয়ে দেবে সেনা। এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে সমস্ত সংগ্রাম, গণতন্ত্রের স্বপ্ন। কিন্তু না। গুলি চলল না। সু চি সোজা হেঁটে অতিক্রম করে গেলেন ব্যারিকেড। তাঁকে থামাতে পারল না সেনাবাহিনী। সময়টি ছিল আজের শতকের অন্যতম। আউং সান সু চি-র সেই অদম্য মনোভাব, সংগ্রাম আজও অব্যাহত। এখনও তিনি অপ্রতিরোধ্য। মিয়ানমারের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল প্রবলভাবে প্রমাণ করল, তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সংঘাত-বিতর্ক, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যায় তাঁর নীরবতা সত্ত্বেও আউং সান সু চি বিকল্পহীন, প্রাসঙ্গিক। জনপ্রিয়, জননেত্রী।

পিতার সূত্রে রাজনীতি তাঁর রক্তে। কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর আসার কথা ছিল না। আটের দশকের শেষ দিকে আউং সান সু চি যখন স্বদেশ বর্মায় (তখনও মিয়ানমার হয়নি, '৮৯-এ নাম পরিবর্তন হয়) ফেরেন তখন সে দেশ উত্তপ্ত, উত্তাল। সামরিক অপশাসনের বিরুদ্ধে জমা ক্ষোভ শক্তিশালী গণআন্দোলনের আকার নিয়েছে। ৮ আগস্ট ১৯৮৮-র বিখ্যাত '৮৮৮৮ আপরাইজিং' যেন যায় তাঁর চোখের সামনে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, প্রতিবাদী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, সরকারি কর্মী ও সাধারণ প্রতিবাদী মানুষসহ সেদিন সেনাবাহিনীর হাতে ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছিল, তা নিয়ে আজও সংশয় আছে। সংখ্যাটি কেউ বলেন তিন হাজার, কেউ বলেন তারও বেশি। অনেকে নিরুদ্দিষ্ট। সু চি ফিরেছিলেন তাঁর মায়ের চিকিৎসা-শুশ্রূষার জন্য। কিন্তু ফিরেই এরকম এক সময় ও ঘটনাপ্রবাহের সম্মুখীন তিনি। পুরোনেমে একটি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার যথোপযুক্ত সময় পাওয়ার আগেই, তাঁকে জনতার মাঝে চলে আসতে হয়, শাসকের মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর পিতা আউং সান আধুনিক বর্মার জনক, বর্মার স্বাধীনতাসংগ্রামের পথিকৃৎ। তাঁর মেয়ে হয়ে সু চি দেশের দায়িত্ব নেবেন না, এ হয় না— দেশের মানুষের, অগ্রজ বহু রাজনীতিকের মত ছিল এমনই। ২৬ আগস্ট ১৯৮৮ রেঙ্গুনের শোয়েদাগন প্যাগোডা সংলগ্ন অঞ্চলে জীবনের প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা দিলেন আউং সান সু চি। তাঁর জানালেন গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের। সেপ্টেম্বরে সু চি-র নেতৃত্বে গঠিত হল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি)।

১৯৯০-এর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেন সু চি ও তাঁর দল। সামরিক শাসকেরা কিন্তু ভাতে দমল না। নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ ন্যায় করে গৃহবন্দি করে ফেলল সু চি-কে। অন্তর্বর্তী সময়ে সাময়িক মুক্তি পেলেও সেই নয়ের দশকের গোড়া থেকেই গৃহবন্দি, নজরবন্দি সু চি। ওই পর্বেই তিনি পেয়েছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার, ধীরে-ধীরে হয়ে উঠেছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার-শান্তির প্রতীক। 'মহিলা মাতেলা'।

মিয়ানমার-এ ২০১৫-র নির্বাচনের গুরুত্ব ঐতিহাসিক। ২০১০-এ সাধারণ নির্বাচনে সু চি-র দল এনএলডি-র স্বীকৃতি-বিলোপ করা হয় যেহেতু তাঁরা শাসক-সৃষ্ট ২০০৮-এর নতুন সংবিধান মানতেও নারাজ, সু চি ও অন্যান্য বর্মি সংস্যদের বহিষ্কার করতেও রাজি নন। প্রতিপক্ষহীন হয়ে সেই নির্বাচন জেতে সামরিক বাহিনী পরিচালিত ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি)। তবে এর অব্যবহিত পরই গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া হয় সু চি-কে। তাঁর উপর আরোপিত সমস্ত বিধিনিষেধও শিথিল করা হয়। ২০১২-য় একটি বাই-ইলেকশনে প্রার্থী হয়ে জেতেন সু চি। প্রথম প্রবেশ করেন সংসদে। ২০১৫-য় 'ল্যান্ডস্লাইড' জয়। এবার বোধহয় '৯০-এর পুনরাবৃত্তি করবে না সেনাবাহিনী। কিন্তু তাদের চাতুর্যের সঙ্গে নির্মিত নব-সংবিধান (যেখানে সু চি-র ব্যক্তিজীবন মাথায় রেখেই বলা হয়েছে, জন্ম মিয়ানমারে হলেও স্বামী, স্ত্রী বা পুত্র-কন্যাদের কেউ বিদেশি হলে সে-ব্যক্তি দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না।) অনুযায়ী সু চি-ও আগামত দেশের প্রেসিডেন্টপদে বসতে পারবেন না। তবে তাঁর ভাষায়, তিনি প্রেসিডেন্ট-এর থেকেও উপরে কোনও পদে থাকবেন, যেখান থেকে তিনিই সমগ্র সরকার-প্রশাসন পরিচালনা করবেন। তাঁর এই বয়ান কি কিছুটা একনায়কতন্ত্রী? কিন্তু সু চি-র উপর এখন আস্থা রাখতে হবে। নতুন সংবিধানে সংসদের ২৫ শতাংশ আসন নির্বাচনী এক্তিয়ার-বহির্ভূত করে সেনাবাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট। সু চি-কে তাই সেনাবাহিনীর সঙ্গেই এগোতে হবে, যতদিন না সংবিধান সংশোধন করতে পারেন তিনি।

'It is not power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it...'— একটি প্রবন্ধের সূচনায় লিখেছিলেন সু চি। এই মুহূর্তে, সেনাবাহিনী ও সু চি, দু'জনের স্মরণেই ফিরে আসুক কথাটি। শব্দগুলির যথাযথ ব্যবহারে, বিষবৃক্ষ পতনের পর সরাসরি অমৃত না ফললেও অন্তত বিষবৃক্ষের পুনরুদ্গম রোধ করা যাবে। কারণ, যে-পরিবর্তন মিয়ানমারে হতে চলেছে, তা দেশটির দীর্ঘদৃষ্ট স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

সু চি বলছেন, 'প্রেসিডেন্ট'-এরও উপরে কোনও পদে থাকবেন তিনি

D'damas

Dazzle the world

Dazzle the world with premium designs, Large yet Lightweight

DDR04049
MRP: ₹30,600/-

VDE00113
MRP: ₹21,100/-

DDE03147
MRP: ₹29,100/-

DDR04051
MRP: ₹28,800/-

DDP03503
MRP: ₹23,550/-

DDP03506
MRP: ₹27,350/-

DDP03501
MRP: ₹26,100/-

DDP03522
MRP: ₹26,450/-

DDN00909
MRP: ₹74,850/-

PR24342
MRP: ₹27,750/-

PR24340
MRP: ₹36,700/-

PR24341
MRP: ₹30,550/-

VDE00102
MRP: ₹64,950/-

PE23621
MRP: ₹25,950/-

DDP03517
MRP: ₹23,250/-

VDP00102
MRP: ₹27,450/-

DIAMONDS
ARE TRULY MESMERISING

Available at Shoppers Stop | For Store enquires call toll free **1800 102 4480**

Choose a seven petalled star and the heavens will shine Divine Luck on you

NAKSHATRA
DIAMOND JEWELLERY

NERA475

NERA482

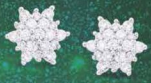

NERA094B

LRK411

NERA024B

NERA172B

NERA034B

LRL196

OEM754

OEM762

OEM763

NRA110B

NPC703

NPA389

NPA403

NNPP028

DIAMONDS
ARE TRULY MESMERISING

Available at Shoppers Stop | For Store enquires call toll free **1800 102 4480**

Gili

Get yourself some spiral shaped elegance.
Complement your style

GPL468
MRP. ₹75,600/-

OPL532
MRP. ₹24,900/-

OEL532
MRP. ₹39,350/-

OEL828
MRP. ₹41,700/-

GEL395
MRP. ₹56,500/-

OPL782
MRP. ₹26,700/-

OEL782
MRP. ₹35,900/-

OEL535
MRP. ₹34,000/-

OPL862
MRP. ₹60,100/-

OPM748
MRP. ₹42,200/-

OEM748
MRP. ₹44,550/-

YEL058
MRP. ₹47,950/-

GPL417
MRP. ₹62,300/-

YPL026
MRP. ₹85,550/-

GPL411
MRP. ₹79,450/-

LRL218
MRP. ₹30,950/-

DIAMONDS
ARE TRULY MESMERISING

Available at Shoppers Stop | For Store enquires call toll free **1800 102 4480**

Jewels in Vogue

Impressive range of collections with international flavour and contemporary look. Myriad designs enhanced with lively colours of varied gemstones.

EF21779Y
MRP: ₹ 1950

PF21734
MRP: ₹ 2250

RF21806P
MRP: ₹ 5150

EF22791P
MRP: ₹ 600

RF22010W
MRP: ₹ 3950

PF21990W
MRP: ₹ 2200

EF21989W
MRP: ₹ 5800

EF22793MLT
MRP: ₹ 500

PF22725P
MRP: ₹ 700

BF22611R
MRP: ₹ 1000

EF22535R
MRP: ₹ 2200

GF22573/RG
MRP: ₹ 3800

GF22579RG
MRP: ₹ 3850

EF22551R
MRP: ₹ 1800

BF22605WBL
MRP: ₹ 950

Jewels in Vogue Brands: Lucera | VIOLA ITALIA | CHRISTY | Vivaaba | Galivar | DONATELLA | hoop | LOVE | KASHVI

Shop online at: www.Jewels○uk.com | www.gitanjaligifts.com

For Distribution & Franchisee enquires contact: +91 8130981098 / +91 7208007959 / +91 9967376464, For General enquires contact: +91 9987018638

Available at Shoppers Stop: Ahmedabad | Aurangabad | Bangalore | Baroda | Bhopal | Chandigarh | Coimbatore | Cyberabad | Chennai | Delhi | Faridabad Goa | Gurgaon | Hyderabad | Indore | Jalandhar | Lucknow | Ludhiana | Kolhapur | Kolkata | Mumbai | Nagpur | Noida | Pune | Siliguri | Surat | Vijaywada

Also available at selected outlets of: Central | Planet M | Hypercity | Globus | Taj Hotel | Big Cinemas | Big Bazaar

চিকিৎসা: পরিষেবা না ব্যবসা?

সুমিত মিত্র

দিল্লিস্থ অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (AIIMS)-এ আমি অনেকবার চিকিৎসা করিয়েছি। একবার তো গাড়ি দুর্ঘটনার ফলে মাস দুয়েক সেখানে কাটাতে হয়েছিল। আমার চোখে সম্প্রতি রেটিনা-ঘটিত সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার চিকিৎসা আমি কলকাতাতেই করিয়ে থাকি। সমস্যাটি হল রেটিনার কেন্দ্রস্থ অঞ্চল, যাকে বলে Macula, সেখানে রক্তক্ষরণ— রোগটির নাম Age-related Macula Degeneration! আগে AMD-র কোনও নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা ছিল না। এখন দু'-একটি ওষুধ বেরিয়েছে বাজারে, যা অক্ষিগোলকের মধ্যে ইঞ্জেকশন করলে প্রায় পাঁচ-ছ'সপ্তাহের জন্য রেটিনা থেকে ক্ষরণ বন্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে দৃষ্টিক্ষমতা। কিন্তু ছ'সপ্তাহ পরে আবার নিকট-অন্ধত্ব। তখন চাই আর-এক ডোজ ইঞ্জেকশন। এবার দিল্লিতে এসেই বুঝতে পারলাম, দৃষ্টিশক্তি পড়তে শুরু করেছে। কী করব? কলকাতায় যে-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা করাই সেখানে ফিরে যাব? হঠাৎ মনে পড়ল, AIIMS-এর রাজেন্দ্র প্রসাদ সেন্টার অফ অপথ্যালমোলজি-র তো খুবই নামডাক। একবার দেখাই যাক না।

এতকাল বাদে দক্ষিণ দিল্লির ওই বিশাল হাসপাতালে পৌঁছেই কেমন যেন দমে গেলাম। গিজগিজ করছে মানুষ। কেউ পঞ্জাব থেকে আগত শিখ, কেউ বা এসেছে নিকটবর্তী গুড়গাঁও থেকে। উদ্দেশ্য আঁখের জাঁক করানো দিল্লির 'মেডিকালে'। হাঁ, নিজের দেশে হাসপাতাল তো আছেই। তবে তাদের ইচ্ছা AIIMS-এই চিকিৎসা হোক। এক ব্যক্তি হাসপাতালের বাঙ্ময়কে ইম্পাতের বেঞ্চে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত। তার কী অসুখ সে জানে না। তবে সে চিন্তিত। কারণ, তার 'নজর' কম হো গয়া এবং সেই কারণেই সে তার বাসস্থল মধ্যপ্রদেশের কানি জেলা থেকে দিল্লির AIIMS-এ হাজির।

ইতিমধ্যে আমার ডাক পড়ল। চক্ষুরোগের এক খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ খুব খুঁটিয়ে আমাকে পরীক্ষা করলেন। হল চোখের অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি, অর্থাৎ ধমনির মধ্যে এক বিশেষ ক্রৈবরাসায়নিক রং প্রবেশ করিয়ে কয়েক মুহূর্ত পর রেটিনার ছবি তোলা। এর ফলে কোন উপশিরা দিয়ে জলীয় পদার্থ চুঁইয়ে আসছে তার হদিশ মেলে। তাছাড়া হরদম উঁচাল চোখের ভিতরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য ত্রিমাত্রিক ছবি— OCT। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সব পরীক্ষার রিপোর্ট জমা পড়ল ডাক্তারবাবুর হাতে। এবার আমাকে AIIMS-এই চোখের ইঞ্জেকশন নিতে হবে। অপেক্ষা করা চলবে না। ক্যাশ বিভাগে টাকা জমা দিয়ে পরের দিন অপারেশন থিয়েটারে হাজির হয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ভিড় দেখে। এত লোক আমার মতো নীল পাতলুন ও কামিজ পরে অপেক্ষা করছে চোখে অস্ত্রোপচারের জন্য!

চোখের ইঞ্জেকশনটি, বলা বাহুল্য, খুবই বেদনাদায়ক। আগেও যতবার অক্ষিগোলকে সূচ

বেঁধাতে হয়েছে, ততবারই শরীর সিঁটিয়ে গেছে ভয়ে ও যন্ত্রণায়। আবার AIIMS কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালের মতো একগাদা স্টেরয়েড-যুক্ত ওষুধ চোখে ঢালতে পরামর্শ দেয় না। তবে যন্ত্রণা প্রশমনে সময় একটু বেশি লাগলেও ফল হল খুবই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আগে যে-গতিতে মোটামুটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসত এখনও সেই গতিই বজায় আছে, কিন্তু একটি ব্যাপারে দিল্লি ও কলকাতায় আমার চক্ষু চিকিৎসার অভিজ্ঞতায় পার্থক্য আছে। AIIMS-এর মোট বিলটিতে ওই মহার্ঘ ওষুধটির মূল্য ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই। অ্যাঞ্জিওগ্রাফি বাবদ তিপান্ন টাকা ও অপারেশন থিয়েটার ব্যবহারের জন্য চৌত্রিশ টাকা। কলকাতার বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে অপারেশন থিয়েটারের খরচ পাঁচ হাজার টাকা। ইঞ্জেকশন দেওয়া, অর্থাৎ পরিষেবাটির মূল্য আরও পাঁচ হাজার। অ্যাঞ্জিও হয় না কলকাতার প্রতিষ্ঠানটিতে। তবে কলকাতায় অন্যত্র একবার করিয়েছিলাম ছ'-সাত বছর আগে। তখন দক্ষিণা ছিল আট হাজার টাকা। AIIMS-এ আমার মোট খরচ কলকাতার অর্ধেক। অনেক রোগীর ওষুধের খরচও লাগে না যদি সে কোনও সরকারি স্বাস্থ্যবিমার সঙ্গে যুক্ত হয়।

কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালে নিত্যন্ত আউপৌরে পরিষেবা দিয়ে কিন্তু রোগীর হাতে যে-ধরনের বিল ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার ফলে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে। গরিব মানুষের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে বেসরকারি হাসপাতাল। আমার চোখের ইঞ্জেকশনের খরচ তো ওষুধের মূল্যের ত্রিগুণেরও বেশি। তার উপর আছে চিকিৎসায় অবহেলা, যে-অপরাধে সুপ্রিম কোর্ট একটি হাসপাতালকে ছ'কোটি টাকা খেসারত দিতে বাধ্য করেছিল। এ রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে মুমূর্ষু রোগীকে প্রত্যহিত হতে হয় পদার্পণের মুহূর্ত থেকেই। নানা অজুহাতে প্রথমেই শূন্য করে দেওয়া হয় তার নিমার ভাঁড়ার। ওষুধ কিনতে বাধ্য করা হয় হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের নিজস্ব ফার্মেসি থেকে, অত্যন্ত চড়া দামে। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে ভেন্টিলেটরে বন্দি করা হয় তার নিকট আত্মীয়দের মিথ্যে আশা দিয়ে। রোগীর চিরবিদায়ের পর ভেন্টিলেটর ও ওই সুবাদে ব্যবহৃত উচ্চমূল্যের ঔষধপত্র বাবদ আত্মীয়দের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় এমন চড়া বিল, যাতে তাদেরই চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। ঠিক এই কারণেই যাঁরা নিঃসঙ্গল নন, তাঁরা চিকিৎসার জন্য পাড়ি দিচ্ছেন চেন্নাই, বেঙ্গালুরু বা হায়দরাবাদ।

বাংলার বেসরকারি স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই দুর্নীতি ও অমানবিকতার মূল কারণ, এখানে সরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থার চরম অবহেলন। ডাক্তারদের দুর্ব্যবহার, জুনিয়র ডাক্তারদের ট্রেড ইউনিয়ন সুলভ মনোবৃত্তি, দালালদের উৎপাত, সুপার থেকে সাফাই কর্মচারী সকলের রাজনীতিকরণ। ফলে মেডিক্যাল কলেজ, পিজি, আরজিকর প্রভৃতি সরকারি হাসপাতাল শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কাছে বিভীষিকা। AIIMS-এর একটি শাখা খোলার কথা আছে রাজ্যের কল্যাণীতে। ভাল কথা। আরও ভাল হত যদি সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাতেও তৈরি হত ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ মানুষের বন্ধু ওই উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানটি। তাহলে এরাজ্যের অসাধু চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা তাঁদের গলার সুর নামাতে বাধ্য হতেন। শুধু রোগীর মানিব্যাগটির দিকে নজর না দিয়ে মনোযোগ দিতেন তাঁর শারীরিক সমস্যার প্রশমনেও।

মতামত ব্যক্তিগত

কবির উপন্যাস ও কয়েকজন গুপ্তচর

সা য় ম ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

বরিস পাস্টেরনাক, ১৯৩৬

এক বিখ্যাত কবি লিখলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। তারপরই, বিশ্বজুড়ে তৎপর গুপ্তচর-গোয়েন্দারা!

একে-একে হারিয়ে যাচ্ছেন তাঁর বন্ধুরা। এক বছর বরিস পিলনিয়াক। পরের বছর ইসাক বাবেল। দু'জনই নামী লেখক, তাঁর মতোই। বাড়ি থেকে তাঁদের নিয়ে গিয়েছিল পিপলস কমিসারিয়েট ফর ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স (রুশভাষায় সংক্ষেপে, এনকেভিডি)-এর এজেন্টরা। জোসেফ স্টালিনের আজ্ঞাবহ ক্রুর সান্ত্রি এনকেভিডি। রুশ সমাজতন্ত্র-বিরুদ্ধ কাজকর্মের অভিযোগ ছিল পিলনিয়াক ও বাবেলের বিরুদ্ধে। দণ্ডও এক, দু'জনকেই গুলি করে হত্যা করা হয়। একদিন ধরা পড়লেন কবি ওসিপ মেন্ডেলস্টাম। তিনিও আর ফিরলেন না। মেন্ডেলস্টামের স্ত্রী দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিলেন স্বামী ওসিপের। ভাবতেন, তিনি দণ্ডিত হলেও মৃত্যুদণ্ডিত নন। ভুল ভাবতেন।

হারিয়ে গিয়েছেন জর্জিয়ার দুই কবি-বন্ধুও। টিটসিয়ান টাবিডজে ও পাওলো ইয়াসভিলি। টাবিডজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না পাওলো। অথচ বাঁচতে হলে তাঁকে সেটাই করতে হবে। উপায়ান্তর না দেখে আত্মহত্যা করলেন পাওলো। আর টাবিডজে? পাওলোর আত্মহত্যার কিছু পরই ধরা পড়লেন তিনি। মৃত্যুদণ্ড হল তাঁর।

পেরেডেলকিনোর বাড়িতে বসে বরিস পাস্টেরনাক ক্রমাগত এক নিদারুণ বৌদ্ধিক একাকিত্ব অনুভব করেন। মস্কো থেকে খুব দূরে নয় পেরেডেলকিনো। কথিত আছে, স্টালিন একবার ম্যাক্সিম গোর্কিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পশ্চিমে লেখকরা কীরকম বাড়িতে থাকেন। উত্তরে গোর্কি জানিয়েছিলেন, ভিলার মতো বাড়িতে। অতঃপর, স্টালিনের নির্দেশে পেরেডেলকিনোতে তৈরি হল একাধিক 'ডাচা'— ভিলার মতো বাড়ি। থাকবেন শুধু লেখকরা। ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট রাইটার্স সংগঠনের সদস্য-লেখকদের হাতে পেরেডেলকিনো কলোনি-আবাসন তুলে দেন গোর্কি, ১৯৩৪ সালে। কিন্তু এর নেপথ্য উদ্দেশ্য কী ছিল? লেখকের প্রতি নিঃস্বার্থ সম্মান প্রদর্শন না কি তাদের এক জায়গায় এনে চোখে-চোখে রাখা? কর্নে চুকভস্কি, বিখ্যাত রুশ শিশুসাহিত্যিক,

মন্তব্য করেছিলেন, পেরেডিলকিনো লেখক-কলোনি বাবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ছিল 'entrapping writers within a cocoon of comforts, surrounding them with a network of spies.'

পাস্টেরনাকের মনে পড়ে, এখানেই থাকতেন পিলনিয়াক, বাবেল। এখান থেকেই তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রায় রাতেই আসত এনকেভিডি-র লোকজন। আজ এসে তো কাল তাকে তুলে নিয়ে যেত তাদের গাড়িতে। সোভিয়েত রাইটার্স সংগঠনের এক সভায় হিসেবে পাস্টেরনাকও এখানে থাকেন। এখনও। কিন্তু একটা ভয় কাজ করে তাঁর ভিতর। তাঁর কণ্ঠ রোধ করতে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হবে না তো? প্রত্যেক লেখকেরই দায় সামাজিক উন্নতিসাধনের। সামাজিক বাস্তবতাই একমাত্র লক্ষ্য হবে সাহিত্যের, এমনই অভিমত, আদেশ ছিল পার্টির। স্টালিনের। স্টালিনের বক্র-চচিত সেই বিশেষণ— লেখকরা হবেন 'ইঞ্জিনিয়র অফ দ্য সোল', আত্মার স্থপতি।

যাঁরা একথা মানবেন না, তাঁরা হঠাৎই 'হারিয়ে' যাবেন।

পাস্টেরনাক যে অক্ষরে-অক্ষরে একথা মেনেছেন, বিশ্বাস করেছেন তা নয়। অথচ তাঁকে সেই সময় এনকেভিডি কেন ধরেনি? স্টালিনের স্ত্রীর আত্মহত্যার পর, স্টালিন-অনুগত বুদ্ধিজীবীদের সমবেত শোকপত্রে সই দেননি পাস্টেরনাক। পরিবর্তে, স্টালিনকে উদ্দেশ্য করে একটি একান্ত বার্তা লিখে পাঠিয়েছিলেন তিনি। সে বার্তায় ভাষায়-ভাবে স্টালিনের সঙ্গে তাঁর প্রায়-একাত্মতা বিশেষ লক্ষণীয়—

'On the evening before I had for the first time thought about Stalin deeply and interestingly as an artist. In the morning I read the news. I was shaken as if I had actually been there, living by his side, and seen everything.'

অনেকে বলেন, সম্ভবত, এতেই স্টালিনের 'ব্যক্তিগত'-কে স্পর্শ করেছিলেন তিনি। দাগিয়ে রাখা বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় পাস্টেরনাকের নাম দেখে স্টালিন বলেছিলেন, 'Leave the holy fool alone.'

আর-একবার সরাসরি পাস্টেরনাককে ফোন করেছিলেন তিনি। মেন্ডেলস্টাম সম্পর্কে জানতে। পাস্টেরনাক বলেছিলেন, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, তবে মেন্ডেলস্টাম নিয়ে নয়। স্টালিন জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে কী নিয়ে? পাস্টেরনাক জানালেন, জীবন ও মৃত্যু নিয়ে। স্টালিন ফোন রেখে দিয়েছিলেন। পাস্টেরনাক কলব্যাক করেছিলেন। স্টালিনের সচিব জানিয়েছিলেন, তিনি ব্যস্ত। বোধহয়, স্টালিন ভাবতেন, পাস্টেরনাক আবেগপ্রবণ, সেরকম কিছু করে উঠতে পারবেন না কখনও, অ্যানার্কিস্ট লেখক হওয়ার যোগ্যতা পাস্টেরনাকের নেই। বোধহয়, পাস্টেরনাক-কৃত জর্জিয়ান কবিদের অনুবাদ স্টালিনকে আনন্দ দিয়েছিল, স্টালিন যেহেতু জর্জিয়ার অধিবাসীই ছিলেন। বোধহয়, সাহিত্যসৃজনে পাস্টেরনাকের আপাত এক রাজনৈতিক বিতর্ক-বিহীন অভিমুখ পছন্দ করতেন স্টালিন। পাস্টেরনাকের আত্মতন্ময়তার নিদর্শন হয়ে আছে সে-সময়ের এই কবিতার শপথলিতে— 'Shielding my face at the window,/ And scarfed against the rasping air,/ I shall shout to the kids: Hey you,/ What century is it there?'

প্রথমজীবনে সমর্থক হলেও উত্তরোত্তর রুশ-বিপ্লব ও রুশ সোস্যালিজমের প্রতি শীতল্য হয়ে পড়ছিলেন পাস্টেরনাক। '৩৬ সালে শুরু হয়েছিল 'দ্য গ্রেট পার্জ', স্টালিনের মহাশুদ্ধিকরণ পরিকল্পনা। অ্যান্টি-কমিউনিস্ট লোকজন ও ক্রিয়াকর্মকে ছেঁটে ফেলার বিপুল আয়োজন। যার বলি হলেন পাস্টেরনাকের বন্ধুরা। ১৯৩৭-'৩৮ সালে স্টালিন নিজে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করেছিলেন। ১২ ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শুধুমাত্র এই একটি দিনেই স্টালিন এই একটি দিনেই স্টালিন ৩১৬৭ জনের মৃত্যুদণ্ডে সম্মতিদান করেছিলেন! এ বছরের জুন মাসের এক দিন পাস্টেরনাকের কাছে চাওয়া হল তাঁর স্বাক্ষর, সামরিক বিভাগের কয়েকজন 'বিকজাভরণকারী'-র মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে। বুদ্ধিজীবীর সমর্থন আদায়ে রাষ্ট্র তৎপর থাকে সারাক্ষণই। পাস্টেরনাক সই দিলেন না, অসহায়তা-বিরক্তিতে বলে উঠলেন যে, আমি যখন কাউকে প্রাণদান করতে পারব না, কারওর প্রাণহরণে সম্মতি দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পাস্টেরনাক যদিও জানতেন তিনি সই না

জোসেফ স্টালিন

দিলেও পিটিশনে তাঁর সইটি পড়েই যাবে। তাই-ই হয়েছিল। মাঝে-মাঝে পাস্টেরনাক বিস্মিত হতেন ভেবে যে, কী করে তিনি বেঁচে যাচ্ছেন গ্রেফতার থেকে— 'It is surprising that I remained whole during the Purges,' ১৯৫৪-য় একটি চিঠিতে লিখেছিলেন পাস্টেরনাক।

পার্জ শেষ হল '৪০-এ। তবুনিল, '৩৯-এ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। '৪৫-এ তার শেষ। মিত্রশক্তির জয়। স্টালিনের জয়। এরপর আবার ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা। পাস্টেরনাক বুঝতে পারেন, দশটি বছরে (১৯৩৬-'৪৬) আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে তাঁর আশপাশ। ইতিবাচক পরিবর্তন নয়, ভীষণরকম নেতিবাচক। সকলকে, সবকিছুকে একটি অতি কঠিন ব্যবস্থায় আনার প্রক্রিয়া চলছে। যে-ব্যবস্থা থেকে সামান্য বিচ্যুতিও ক্ষমার অযোগ্য বিবেচিত। কিন্তু এরকমটা তো হওয়ার কথা ছিল না! এত ভয়, এত অত্যাচার, মিথ্যাচার, এত নিধন— রুশ বিপ্লব কি এসবেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল? না, তা তো নয়। পাস্টেরনাকের মতে, গলদ ছিল রুশ বিপ্লবের অন্তর্মহলে। যার ফল হল লেনিন-উত্তর যুগের স্বৈরতন্ত্র, প্রশাসনিক কাঠিন্য, নিদয়তা। রাশিয়ার জনজীবনে অন্তর্ঘাতের মতো কাজ করেছে এসব। কবি-লেখকরাও এর ঘোরে আচ্ছন্ন। সবকিছু বুঝতে পারলেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চান না কেউ। দেখালেই প্রভূত বিপদের সম্ভাবনা! যেমন, কেবলমাত্র পাস্টেরনাকের প্রেমিকা হওয়ার জন্যই ওলগা ইভিনস্কায়া গ্রেফতার হলেন ১৯৪৯-এ, কৃত্যাত্ত ওলগা-র পাঁচ বছরের জন্য দন্ডিত হলেন ওলগা। সহ্য করলেন কেজিবি ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। ওলগার গর্ভে মিসক্যারেজ হল তাঁর এবং পাস্টেরনাকের সন্তান। তাও, প্রেমিক পাস্টেরনাকের নাম বলে বিশ্বাসহন্তারক হননি ওলগা।

পাস্টেরনাক এই সব ত্রুটির কথা বলতে চান। তবে এবার কবিতায় নয়, গদ্যে। তাঁর অনেকদিনের ইচ্ছে, নিজের দৃষ্ট ও অভিজ্ঞাত সময়কে নিয়ে তিনি এক বৃহৎ পরিসরের আখ্যানধর্মী গদ্য লিখবেন। উনিশ শতকীয় শৈলীতে, বাল্জাকের মতো। সেই কাজেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখছেন তিনি এখন। শুরু করেছিলেন অনেক আগে, ১৯৩২-এ। তখন তিনি অনেকটাই 'সমাজত্রী' ছিলেন। এখন আর

'৩৬ সালে শুরু হয়েছিল 'দ্য গ্রেট পার্জ', স্টালিনের মহাশুদ্ধিকরণ পরিকল্পনা। অ্যান্টি-কমিউনিস্ট লোকজন ও ক্রিয়াকর্মকে ছেঁটে ফেলার বিপুল আয়োজন। যার বলি হলেন পাস্টেরনাকের বন্ধুরা।

নন। অতঃপর তিনি সমাজতন্ত্রের মোড়কে যা-যা দেখেছেন তার পরে সে-ভাবধারা নিয়ে তাঁর মননে আর কোনও আশাবাদের স্থান নেই। এবার তাই নতুন করে লেখা শুরু করেছেন। কোথায় শেষ হবে, কবে শেষ হবে, কোথায় প্রকাশিত হবে বা আদৌ প্রকাশিত হবে কিনা, এসব কিছুই তখন জানেন না তিনি। বহুদিন ধরে, মৌলিক কোনও রচনাই তিনি আর লেখেন না। সরকারি কবি-সাহিত্যিকরা, আধিকাংশকাল মানাবাদে তাঁকে অপদস্থ করে, অপমান করার চেষ্টা করে। পাস্টেরনাকের কবিতাপাঠের আসরগুলির উপর কোপ পড়ে, আমন্ত্রণ আর আসে না তেমন কবিতাপাঠের। তাঁর মৌলিক সৃজনের প্রকাশ সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা চলতে থাকে। কেবল ছাড় থাকে সরকারি কমিশনড অনুবাদে। সেটিই করেন পাস্টেরনাক। শেক্সপিয়র, গ্যেটেসের রুশ ভাষায় অনুবাদ। অনুবাদই তখন তাঁর একমাত্র জীবিকা, উপার্জনের পন্থা। কখনও-কখনও অনুবাদের ভিতরেই, ভাষার ছলের আশ্রয় নিয়ে মিশিয়ে দেন তাঁর বিরোধী স্বর। যেমন 'হ্যামলেট' নাটকের অনুবাদে। অ্যাক্ট থ্রি, সিন ওয়ানে যেখানে শেক্সপিয়রের ভাষা, 'For who would bear the whips and scorns of time,/ Th' oppressor's wrong, the proud man's contumely,/ The pangs of despised love, the law's delay,/ The insolence of office, and the spurns/ That patient merit of th' unworthy takes,' সেখানে পাস্টেরনাকের রুশ থেকে পুনরায় ইংরেজি করলে, তা দাঁড়ায় এরকম— 'Who would bear the phony greatness of the rulers, the ignorance of the bigwigs, the common hypocrisy, the impossibility to express oneself, the unrequited love and the illusoriness of merits in the eyes of mediocrities.'

হ্যামলেটের ডেনমার্ক আর পাস্টেরনাকের রাশিয়া যেন এক হয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে সমসময়ের অন্যতম সেরা রুশ কবির আখ্যা তখন পেয়ে গিয়েছেন পাস্টেরনাক। কিন্তু স্বদেশেই, সরকারি মহল থেকে কোনও স্বীকৃতি মেলে না। সেখানে তিনি সবসময়ই এক আউটসাইডার, অপরিচিত। রুশ সংস্কৃতির সঙ্গে অসংলগ্ন এক কবি, এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহিত্যকর্ম পাশ্চাত্যেরা মেনে চলে না, তাঁর রচনায় রয় বেশি পাশ্চাত্য প্রভাব, বস্তুতান্ত্রিক দেশগুলির বৌদ্ধিক বিলাসিতার ছায়া। তাঁকে নিয়ে মাতামাতি চলে, পাস্টেরনাক তেমনটাও চান না, বরং স্বেচ্ছায় থাকতে চান আড়ালেই। তিনি বুঝে গিয়েছেন, নিজের দেশের যা পরিস্থিতি সেখানে বিখ্যাত বা সবসময় শিরোনামে থাকার অর্থ, নিজেকে পাটির কাছে, রাষ্ট্রের কাছে বিকিয়ে দেওয়া। পাস্টেরনাক তা পারবেন না। তিনি ব্রাত্য হয়েই থাকতে চান। এদেশেই থাকতে চান। এভাবেই।

যৌবনে, ইচ্ছে করলেই পাস্টেরনাক বার্লিন অথবা লন্ডনে স্থায়ীভাবে থেকে যেতে পারতেন। থাকেননি। কারণ, রাশিয়া ছাড়া তিনি নিজেকে, নিজের মননকে ভাবতেই পারেন না। সেই দেশই তাঁর প্রতি আশ্চর্যরকম বিরূপ। অভিমানাহত পাস্টেরনাক অনুবাদেই রত থাকেন। কিন্তু উপন্যাসের ব্যাপারটি মাথায় আসার পর থেকে তিনি আচমকাই মেতে উঠেছেন। লেখা শুরু করে নিমগ্ন হয়ে আছেন লেখাতেই। চিঠিতে, ঘনিষ্ঠজনদের লিখে জানাচ্ছেন উপন্যাসটির কথা। বলছেন, 'This is a very serious work. I am already old, I may soon die, and I must not perpetually put off giving free expressions to my true thoughts.'

এ উপন্যাস হবে তাঁর সৃষ্টির চূড়ান্ত পরিণতি, সর্বোত্তম প্রতিনিধি। যতদিন না এই উপন্যাস তিনি শেষ করছেন, ততদিন তিনি স্বস্তি পাবেন না, 'I could not go on living another year unless this novel, my alter ego, in which with almost physical concreteness certain of my spiritual qualities and part of my nervous structure have been implanted, went on living and growing, too.'

নিহত বন্ধু টিটসিয়ান তাবিডজের স্ত্রী নিনা স্বামীর পড়ে থাকা, অব্যবহৃত জলছাপ কাগজগুলি পাস্টেরনাককে দিয়েছিলেন। পাস্টেরনাক সেই কাগজেই তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করেন। নিনাকে বললেন, এভাবেই হয়তো তিনি টিটসিয়ানের স্মৃতিকে যথাযোগ্য সম্মান জানাতে পারবেন। প্রাথমিক খসড়াতে উপন্যাসটির নাম ছিল 'বয়েজ অ্যান্ড গার্লস'। পুনরায় লেখা শুরু করে পাস্টেরনাক তা পাল্টে দেন। নতুন কোনও নাম না দিয়ে ব্যবহার করতে থাকেন শুধু এক উপশিরোনাম, 'সিন্স ফ্রম হাফ আ সেঞ্চুরি অফ ডেলি লাইফ'। লেখা চলতে থাকে। পরে একদিন, পাস্টেরনাক অবশেষে নাম দিলেন তাঁর উপন্যাসের, 'ডক্টর জিভাগো'।

একটি অর্থোডক্স প্রার্থনাসংগীতের কথা থেকে পাস্টেরনাক পেয়েছিলেন 'জিভাগো' নামটি, "Ty est' voistinu Khristos, Syn Boga zhivago"। যার অর্থ, 'তুমিই খ্রীষ্ট, জীবিত ঈশ্বর।' পাস্টেরনাকের বয়ান, 'I did not think of the living God, but of a new one, who was only accessible to me through the name Zhivago—it took me a whole life to make this childish sensation real by granting the hero of my novel this name.'

পাস্টেরনাক লিখতে থাকেন। ছোট ছোট বন্ধু-পরিকরে শোনাতে থাকেন যতটা লেখা হয়েছে। কারওর ভাল লাগে, কারওর লাগে না।

আর, উপন্যাস পাঠের এই আসরগুলিতে শ্রোতার ছদ্মবেশে উপস্থিত থাকে রাষ্ট্রের গুপ্তচররা, সিক্রেট পুলিশের লোকেরা।

দ্বিতীয় পর্ব

একদিন লেখা শেষ হয়। পাস্টেরনাক দেখেন লেখা শুরু ও লেখা শেষের মাঝে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে একটি দশক। শুরু করেছিলেন ১৯৪৫ সালে, তাঁর বয়স তখন ছাপ্পান্ন। শেষ হল যখন, তখন ১৯৫৬। পাস্টেরনাক তখন সাতষট্টি বছরের এক প্রৌঢ়। স্বদেশের ইতিহাসেও এক বিশাল পতন হয়েছে— স্টালিন-এর মৃত্যু। রুশ রাজনীতির আবহাওয়ায় উদারপন্থার গন্ধ এখন। এবার প্রকাশের পালা 'ডক্টর জিভাগো'-এও। লেখা শুরু করার সময় উপন্যাসটির প্রকাশের চিন্তা অতটা না করলেও পাস্টেরনাক এখন চাইছেন তাঁর সেরা কাজটি যাতে মানুষের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছয়। কিন্তু কে করবে প্রকাশ?

পাস্টেরনাক পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন 'নোভি মির' ('Novy Mir') পত্রিকার দপ্তরে। 'নোভি মির' বিখ্যাত পত্রিকা, এই পত্রিকার দপ্তরেই একদা তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক তরুণী সম্পাদকের— ওলগা ইভিনস্কায়া। পাস্টেরনাকের বহু লেখাই আগে ছেপেছে 'নোভি মির'। তবে পত্রিকাটি পার্টি অনুগত, পার্টিলাইন অনুমোদিত লেখাই ছাপে (ছয়ের দশক থেকে তাদের নীতি পাল্টায় 'নোভি মির', ১৯৬২-তে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় আলেকসান্ডার সলঝেনিতসিন-এর গুলাগ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দিজীবন নিয়ে লেখা বহু-বিতর্কিত উপন্যাস 'ওয়ান ডে ইন দা লাইফ অফ ইভান ডেনিসোভিচ')। উত্তরকালে, 'নোভি মির' জর্জ অরওয়েল, জোসেফ ব্রডস্কি-র মতো তথাকথিত 'নিন্দিত' লেখকদের লেখাও প্রকাশ করেছে।

পাস্টেরনাক বুঝতে পারছিলেন, 'নোভি মির' তাঁর উপন্যাসটি প্রকাশ করবে না। তাও তিনি দিলেন। কারণ, স্টালিন-প্রায়োগের পরবর্তী সময়ে কিছুটা হালকা হওয়া পরিবেশে পাস্টেরনাক ভেবেছিলেন যে, 'নোভি মির'-এর পাতায় 'ডক্টর জিভাগো' প্রকাশ পেলেও পেতে পারে। য়াডিমির ডুডিন্সেভ-এর 'নট বাই ব্রেড আলোন' উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে 'নোভি মির'-এই। ডুডিন্সেভের উপন্যাসটিতে যথেষ্টই সমালোচিত রুশ আমলাতন্ত্র।

'নোভি মির' কিন্তু 'ডক্টর জিভাগো' ছাপল না। এল কয়েক মাস পর ফেরত এল পাণ্ডুলিপি, সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে একটি চিঠি, না ছাপানোর কারণ বর্ণিয়ে। চিঠিতে পত্রিকাটির পাঁচজন বোর্ডসদস্যের সই রয়েছে। তাঁরা লিখেছেন, 'The thing that has disturbed us about your novel is something that neither the editors nor the author can change by cuts or alterations. We are referring to

the spirit of the novel, its general tenor, the author's view on life... the spirit of your novel is one of non-acceptance of the socialist revolution. The general tenor of your novel is that the October Revolution, the Civil War and the social transformation involved did not give the people anything but suffering, and destroyed the Russian intelligentsia, either physically or morally.' কেজিবি (রাশিয়ার ইন্টেলিজেন্স সংস্থা) ততদিনে পাস্টেরনাকের উপর কড়া নজরদারি শুরু করে দিয়েছে। পাস্টেরনাক উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি শুধু 'নোভি মির'-এই পাঠানিল, পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্র প্রকাশনা বিভাগ 'Goslitizdat' এবং 'Znamya'-এও। স্বাভাবিক কারণেই, তারাও ছাপেনি 'ডক্টর জিভাগো'।

মস্কো শহরের তিনটি পরিচিত প্রকাশনা দপ্তরে পাঠানোর ফলে পাণ্ডুলিপিটি অনায়াসেই পৌঁছে গিয়েছিল পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সভাপতির অন্দরে। বিশেষ করে, যেখানে পাস্টেরনাকের উপর এমনিতেই নজর রাখা হচ্ছিল, সেখানে তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিই হাতে চলে আসার অর্থ গভীর। সোভিয়েট বিদেশমন্ত্রী ডিমিট্রি শেপিলভ কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটিকে পাঠানো একটি মেমোয় জানালেন, 'Boris Pasternak's novel is a malicious libel of the USSR.' নিজেদের একটি স্বতন্ত্র মেমোয় কেজিবি লিখে পাঠাল, 'a typical feature of this work is estrangement from Soviet life and a celebration of Individualism.' সেন্ট্রাল কমিটির সংস্কৃতি দপ্তর বলল উপন্যাসটি 'our revolution and our entire life'-এর বিরুদ্ধে এক অভিযোগ। এ লেখা কী করে ছাপবে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষণাপ্রাপ্ত প্রকাশনাগুলি! স্টালিনের পর তাঁর আসনে এসেছেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ। 'ডি-স্টালিনাইজেশন' প্রক্রিয়া তিনিই শুরু করবেন। পেন এসেই, ১৯৫৬-র ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বতম পার্টি কংগ্রেসে তিনিই দেবেন সেই বিতর্কিত 'সিক্রেট স্পিচ'— 'অন দ্য কাল্ট অফ পার্সোনালিটি অ্যান্ড হিজ কনসিকোয়েন্সেস'। যেখানে থাকবে স্টালিন-মিথকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন। ক্রুশ্চেভের আমলই ইতিহাসখ্যাত হয়ে থাকবে 'ক্রুশ্চভ থ' ('Thaw' শব্দটির প্রচলন ইলিয়া এহেনবুর্গের একটি উপন্যাসের নাম থেকে) নামে। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ গলানো বা গলে যাওয়া। ক্রুশ্চভের সময় কিছুটা হলেও স্টালিনিস্ট জমানার রুক্ষতা, একনায়কতন্ত্রী অভিমুখ 'গলে' গিয়েছিল। কিছুটা নিশ্বাস নেওয়ার মতো জায়গা পেয়েছিলেন লেখক-শিল্পীরা। অথচ এসব সত্ত্বেও রাজনৈতিক আবহাওয়া কিন্তু ততটা হালকা বা 'থ'-এ প্রভাবিত হয়নি। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-সুলভ বিধি-

জানজাকোমো ফেলট্রিনেলি

নিষেধ ছিল ভালমতোই বর্তমান, সমালোচনা-গ্রহণ করার ক্রিয়াটি তখনও সরলভাবে গৃহীত হয়নি। শাসন একটি প্রথায় পর্যবসিত হয়ে গেলে যা হয়। আর একই সময়ে সোভিয়েটের হাতেপায়ে আক্রমণে 'থ' কার্যত থমকে যায়।

'ডক্টর জিভাগো' তা হলে বৃহত্তর জগতে, তাঁর স্বদেশীদের কাছেই পৌঁছবে কী করে? অসহায় মনে হয় নিজেকে ফিভাগো-প্রেমীর, চিন্তামগ্ন থাকেন উপন্যাসটির ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাঁর এই কাজটিকে মানুষের কাছে পৌঁছনো জরুরি। দেশে না হলে বিদেশে প্রকাশ করা যায়? '৪৮ সালে উপন্যাসটির কয়েকটি প্রাথমিক-লিখিত অধ্যায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে, তাঁর বোনদের কাছে। কিন্তু তাঁদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন লেখাটি প্রকাশ করে না দেন— 'Publication abroad would expose me to the most catastrophic, not to mention fatal, dangers.' এ কথাগুলিই আবার স্মরণে আসে তাঁর। বিশ্বস্ত হয়ে পড়েন পাস্টেরনাক। আট বছরে রাশিয়াতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঠিক কতটা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি নিজেও ছিলেন এক প্রগতিস অবস্থায়, বিভ্রান্ত।

তৃতীয় পর্ব

রেডিও মস্কোতে কাজ করতেন ইটালিয়ান এক যুবক। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। নাম, সের্জিও ডি'এঞ্জোলো। তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির তরফেই, সোভিয়েট জনজীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসার জন্য। ১৯৫৬ সালে ২০ মে, সের্জিও মস্কো থেকে পেরেডেলকিনোর ট্রেনে উঠলেন। সঙ্গে ছিলেন এক রুশ সহকর্মী। তাঁদের গন্তব্য, বরিস পাস্টেরনাকের বাড়ি। সের্জিও কয়েকদিন আগেই খবর পেয়েছেন কবি পাস্টেরনাক লিখে ফেলেছেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। সের্জিও-র এক 'কমিউনিস্ট' বন্ধু সম্প্রতি ইটালির মিলানে একটি প্রকাশনা সংস্থা খুলেছেন, বন্ধুটির নাম জানজাকোমো ফেলট্রিনেলি। প্রকাশনা সংস্থাটির নামও 'ফেলট্রিনেলি'। ইতিমধ্যে তারা তাদের প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনী। পাস্টেরনাকের কাছে সের্জিও আবেদন রাখবেন, তাঁর উপন্যাসটি যাতে ফেলট্রিনেলিকে দেওয়া হয়। মস্কো আসার সময় সের্জিও বন্ধু ফেলট্রিনেলিকে বলেছিলেন তাঁর নতুন প্রকাশনার জন্য সাম্প্রতিক সোভিয়েট সাহিত্য জোগাড় করে দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন তিনি। পাস্টেরনাক প্রতিবাদমখর কবি। তাঁর প্রথম উপন্যাসের আবেদনই আলাদা। এই লেখাই যদি ফেলট্রিনেলি প্রকাশ করতে পারেন তা হলে তা বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক, দু'দিক থেকেই হবে গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। এবং যেহেতু প্রকাশকও একজন বামপন্থী, সেখানে গ্রন্থ প্রকাশে কোনওরকম অসুবিধে হবে না বলেই সের্জিওর বিশ্বাস। কবিকে তিনি একথাও বললেন যে, মূল রুশ ভাষায় প্রকাশ না হওয়া অবধি তাঁর বন্ধু ইটালিয়ান ভাষায়ও সেটি প্রকাশ করবেন না।

পাস্টেরনাকের কাছে স্বদেশে 'ডক্টর জিভাগো'-র প্রকাশের সম্ভাবনা ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। সের্জিওকেও তিনি জানিয়েছেন, 'In the USSR, the novel will not come out. It doesn't conform to cultural guidelines.' কোনও বিকল্পের সন্ধানে পাস্টেরনাককে যেতেই হবে উপন্যাসটি প্রকাশ করতে হলে। সের্জিও-র কথায় খুব একটা আশ্বস্ত না হলেও, তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর, ঘর থেকে তিনি বের করে আনলেন টাইপ করা ৪৩৩ পৃষ্ঠাবাগী 'ডক্টর জিভাগো'-র পাণ্ডুলিপি। ইটালিয়ান যুবকটির হাতে সেটি তুলে দিয়ে, পাস্টেরনাক বললেন, 'This is Doctor Zhivago. May it make its way around the world.' সের্জিও ও তাঁর সহকর্মী যখন পাণ্ডুলিপি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, দোরপ্রান্তে এসে তাঁদের বিদায় জানিয়ে, পাস্টেরনাক বিষাদাচ্ছন্ন এক হাসি হেসে হঠাৎই বললেন, 'You're hereby invited to my execution.'

পাস্টেরনাকের এই শেষ দু'টি বাক্য ছিল প্রোফেটিক, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতো। 'ডক্টর জিভাগো' কী বিস্তৃত আলোড়ন সৃষ্টি করবে, তা পাস্টেরনাক কেন, কেউ-ই ভাবতে পারেননি। প্রায় সারা বিশ্ব তো ঘুরল'ই 'ডক্টর জিভাগো', সেই সঙ্গে পাস্টেরনাকের প্রাণনাশ না করলেও তাঁকে প্রায় জীবন্মৃত করে দেওয়ার পর্যায়েই নিয়ে গেল তাঁরই লেখা!

'ডক্টর জিভাগো'-র বাকি ইতিহাস থ্রিলারের চেয়ে কিছু কম নয়।

পাস্টেরনাকের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে সের্জিঁ পরের সপ্তাহেই চলে গেলেন বার্লিন। মস্কো ছাড়ার আগে তাঁকে তেমন করে আর সার্চ করা হয়নি, তাঁর 'কমরেড' পরিচয়ের জন্যই। বার্লিনে পৌঁছেই সের্জিঁও মিলানে ফেলট্রিনেল্লিকে খবর দিলেন। ফেলট্রিনেল্লিও দ্রুততার সঙ্গে চলে এলেন বার্লিন শহরে। জোয়াশিমস্টালার-ষ্ট্রাসে-র একটি ছোট হোটেলে একটি সুটকেস থেকে আর-একটি সুটকেসে লেখক হিসেবে তিনি 'ডক্টর জিভাগো'। মিলানে ফিরে ফেলট্রিনেল্লি পাণ্ডুলিপিটি নিজে না পড়লেও একটি প্রাথমিক মতামতের জন্য পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এক বিশ্বস্ত বন্ধু পিয়েত্রো জেভেত্তরমিচকে। জেভেত্তরমি পড়েই জানালেন তাঁর অভিমত— 'Not to publish a novel like this would constitute a crime against culture.' 'ডক্টর জিভাগো'-র ইটালিয়ান অনুবাদক এই জেভেত্তরমিচ-ই।

ইতিমধ্যে, কেজিবি জেনে ফেলেছে, 'ডক্টর জিভাগো' রাশিয়ার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে, তাও জেনেছে তারা। কেজিবি চাপ দিতে শুরু করে ফেলট্রিনেল্লির উপর, পাণ্ডুলিপি ফেরতের জন্য, গ্রন্থকারকে লেখাটি না ছাপার জন্য। পাস্টেরনাককে দিয়ে জোর করে ফেলট্রিনেল্লির কাছে চিঠি লেখানো হয় এই বলে যে, তিনি এখন আর পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে চান না, যে-পাণ্ডুলিপি ফেলট্রিনেল্লি পেয়েছেন সেটি আসলে একটি খসড়া মাত্র, এখনও অনেক পরিশোধন পরিমার্জনা বাকি।

পাস্টেরনাক একদিকে যখন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণাধীন গুণ্ডচর সংস্থার চাপে পড়ে এসব চিঠি লিখে পাঠাচ্ছেন ফেলট্রিনেল্লিকে। অন্যদিকে, ফেলট্রিনেল্লিকেই গোপনে তিন চিঠি লিখছেন তাঁর প্রকৃত অবস্থান জানিয়ে, সংকেতের সাহায্য নিচ্ছেন, একটুও ভয় না পেয়ে প্রকাশনার কাজ জত এগিয়ে দিয়ে যেতে আদেশ দিচ্ছেন।

মাঝে-মাঝে বিমর্ষ, বিরক্তও হয়ে পড়ছেন। তিনি বুঝতে পারছেন হয়তো আন ভাষায় তাঁর উপন্যাসটি প্রকাশিত হবে, কশ ভাষাতেই কখনও হবে না— "We shall soon have an Italian 'Zhivago,' French, English and German 'Zhivagos' – and one day perhaps a geographically distant but Russian 'Zhivago' !"

কশ প্রশাসন ও কেজিবি চাইছিল, যেভাবেই হোক ডক্টর জিভাগোকে রাশিয়াতেই ফিরিয়ে আনতে। কশ ভাষায় প্রকাশকেই তারা টোপ হিসেবে ব্যবহার করল। যে-রাষ্ট্র প্রকাশনা সংস্থা পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়েছিল পাস্টেরনাককে, সেই Goslitidzat–এরই সম্পাদক আনাতলি স্টারোসিন চিঠি লিখলেন পাস্টেরনাককে, লেখাটি চেয়ে পাঠিয়ে; 'I shall make this into something that will reflect the glory on the Russian people,' লিখলেন স্টারোসিন। সহজেই অনুমেয়, এ ছিল নিছক এক প্রতারণা।

দিন চলে যায়। প্রকাশনার কাজ আটকে থাকে ফেলট্রিনেল্লির। কারণ স্টারোসিনের বার্তায় কিছুটা হলেও আশ্বাস্ত হয়েছিলেন পাস্টেরনাক। ইটালিয়ান ভাষায় একটি 'প্রকাশ্য' চিঠি লিখলেন পাস্টেরনাক ফেলট্রিনেল্লিকে, বললেন সোভিয়েট সংস্করণ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। গোপনে একটি চিঠি লিখলেন একই ব্যক্তিকে। সেখানে বললেন, বড়জোর ছ'মাস অপেক্ষা করতে। এও লিখলেন, লেখক হিসেবে তিনি চান যে, ফেলট্রিনেল্লির কাছে মূল রশ পাণ্ডুলিপি অবলম্বনেই ইটালিয়ান অনুবাদটি প্রকাশিত হোক, কাটছাঁট করে রাশিয়াতে যে-সংস্করণ বেরতে পারে, তা অবলম্বনে নয়।

ছ'মাস অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর ফেলট্রিনেল্লি আর অপেক্ষা করেননি। সোভিয়েট প্রশাসনকেও তোয়াক্কা করেননি। ১৯৫৭ সালের ২৩ নভেম্বরে প্রকাশিত হয় 'ডক্টর জিভাগো'। ইটালিয়ান ভাষায়। ১৯৫৮ সালের মধ্যেই বেরিয়ে যায় যথাক্রমে উদন্যাসটির ফরাসি, জার্মান ও ইংরেজি সংস্করণ। পাস্টেরনাক শুধু সের্জিঁও ডি'এন্ড্রোলোকেই তাঁর পাণ্ডুলিপি দেননি, সেটির তিনটি কপি দিয়েছিলেন অন্য তিন ব্যক্তিকে— আইসায়া বার্লিন, জর্জ কাটকভ এবং জাকলিন দা প্রোয়ার-কে। ইতিহাসবিদ-দার্শনিক জর্জ কাটকভ ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বার্লিনের সহকর্মী মুলত, তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশ পায় ইংরেজি 'ডক্টর জিভাগো'। অক্সফোর্ডে কাটকভেরই শিষ্যাত্রতিম ম্যাক্স হেওয়ার্ড শুরু করেন অনুবাদ অনুবাদ দ্রুত শেষ করার জন্য হেওয়ার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে সে কাজে হাত দেন মানইয়া হারারি, হারভিল প্রেসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। লন্ডনের প্রকাশনা কলিনস-এর একটি বিভাগ হারভিল প্রেস, সেখান থেকেই প্রকাশিত হয় 'ডক্টর জিভাগো'–র ইংরেজি সংস্করণ। অন্যদিকে, জাকলিন দা প্রোয়ার প্রস্তুত করেন জিভাগো-র ফরাসি সংস্করণ। ফরাসিতে 'ডক্টর জিভাগো' পাঠ করে মুগ্ধ আলবের কামু তাঁর পাঠ-প্রতিক্রিয়া জানান পাস্টেরনাক-কে। কামু লেখেন, 'I rediscovered in you the Russia that nourished and fortified me.'

যে-ক'টি ভাষায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, সে-সব সংস্করণই বাজারে আসার দিন থেকে বেস্টসেলার। আট বছর পর, ১৯৬৬ সালে পরিচালক ডেভিড লিন যখন চলচ্চিত্রায়িত করবেন 'ডক্টর জিভাগো', সে ছবিও তৈরি করবে ইতিহাস, জিতে নেবে পাঁচটি অস্কার।

সরকারিভাবে, রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে 'ডক্টর জিভাগো'-কে যত চেপে দেওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছিল, সমান্তরালভাবে তেই যেন সেটির প্রকাশে আনারও চেষ্টা চলছিল। দ্বিতীয় চেষ্টার মধ্যে মিশে ছিল দু'রকমের অভিমুখ— রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক।

'ডক্টর জিভাগো'-র পরিকল্পা তখনও অনেকটাই বাকি। রশ ভাষাতেই তো প্রকাশ পায়নি সে!

চতুর্থ পর্ব

২ জানুয়ারি, ১৯৫৮। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সিআইএ-র অফিসে এল দুই রোল মাইক্রোফিল্ম। ফিল্মে রয়েছে 'ডক্টর জিভাগো'-র মূল রশ পাণ্ডুলিপির (ফেলট্রিনেল্লির কাছে যে-পাণ্ডুলিপির সংস্করণ রক্ষিত) প্রেরিকা! কে পৌঁছলাং জানা যাচ্ছে, সেটি সিআইএ-র কাছে পৌঁছেছে এমআইসিক্স (MI6), ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সংস্থা। কিন্তু এমআইসিক্স কী করে পেল এই পাণ্ডুলিপি? সেকথা নির্দিষ্ট করে জানা না গেলেও অনুমান, অক্সফোর্ডের সমাজতন্ত্র-রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আইসায়া বার্লিন (যাঁকে পাস্টেরনাক একটি কপি দিয়েছিলেন) তাঁর বন্ধু ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত উইলিয়ম হেটারকে দিয়েছিলেন পাণ্ডুলিপিটি, রাশিয়া থেকে লন্ডনে সেটিকে পাঠানোর জন্য। বার্লিন নিজের সঙ্গে লেখাটি নিয়ে ইংল্যান্ডে যাওয়ার ঝুঁকি কখনওই নিতেন না। এই হেটারের সূত্রেই সম্ভবত 'ডক্টর জিভাগো' পৌঁছে গিয়েছিল এমআইসিক্স-এর হাতে, সেখান থেকে সিআইএ-র কাছে।

ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে। সোভিয়েট রাশিয়া তথা আয়রন কার্টেন ভেদ করে কমিউনিজমকে দুর্বল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। বরিস পাস্টেরনাক ও তাঁর 'ডক্টর জিভাগো' সিআইএ-র সামনে এনে দিল এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ। 'We have the opportunity to make Soviet citizens wonder what is wrong with their government when a fine literary work by the man acknowledged to be the greatest living Russian writer is not even available in his own country [and] in his own language for the people to read.'— ২ এপ্রিল, ১৯৫৮-র একটি মেমোতে এসব্য লেখেন এক সিআইএ অফিসার। সিআইএ-র ডিক্লাসিফায়েড ফাইল বলছে, এমআইসিক্স-ও ছিল 'in favour and have offered to provide whatever assistance they can.'

কিন্তু কীভাবে এগোবে সিআইএ? ম্যাক্সিম গোর্কি বলতেন, সাম্যবাদী সংস্কৃতিতে বই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীদের একনাই এত প্রতিপত্তি ছিল সোভিয়েট ভূখণ্ডে, আশুবাক্য হিসেবে তারা মেনেছিল গোর্কির কথা। বইকে তারা এক গণমাধ্যম হিসেবে চাইত, আবার ভয় পেত বইকেই।

সোভিয়েটদের দেখানো পথেই তাদের বিপাকে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছে সিআইএ, 'ডক্টর জিভাগো'-র প্রকাশের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। একটি 'কোভার্ট' প্রোগ্রাম শুরু

হয়েছে সিআইএ-র। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— রাশিয়াতে যা হয় নিষিদ্ধ না হয় বিতর্কিত— রাশিয়াতে পৌঁছে দিচ্ছে তারা। তবে, গোপনে। কখনও সোভিয়েট-নিবাসী টুরিস্টদের হাতে বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হচ্ছে বহুগুলি যাতে তারা দেশে নিয়ে গিয়ে পড়তে ও পড়াতে পারেন, কখনও বেনামি ডাকে পাঠানো হচ্ছে মার্কিন বই, পত্র-পত্রিকা। রুশ ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় সাহিত্যের বিখ্যাত কাজগুলিকে, সিআইএ-র ছদ্মবেশ প্রকাশনা সংস্থাগুলিকে প্রকাশ করতে। আর উক্ত মাধ্যমে ঢুকে যাচ্ছে রাশিয়ায়। আনুমানিক প্রায় দশ মিলিয়ন বই ও পত্র-পত্রিকা এসময়ে এভাবে রাশিয়ায় পৌঁছেছিল। পরিকল্পনাটির আধিকারিক নাম AEDINOSAUR বা 'অপারেশন ডাইনোসর'। 'ডক্টর ক্রিভাগো'-কে এ প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর পরিচালনায় থাকে সিআইএ-র সোভিয়েট রাশিয়া ডিভিশন। গোপ্য প্ল্যান অনুমোদন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট আইসেনহাওয়ার-এর অধীনস্থ অপারেশনস্ কো-অর্ডিনেটিং বোর্ড। ফলে, 'ডক্টর ক্রিভাগো'-র ভাগ্য নির্ধারিত হতে থাকে একেবারে হোয়াইট হাউস থেকে!

তবে সিআইএ-র কর্তারা বুঝতে পারছিলেন, 'ডক্টর ক্রিভাগো'-র 'প্রপাগান্ডা ভ্যালু' দুর্দান্ত হলেও উপন্যাসটির ইংরেজি সংস্করণ রাশিয়াতে পাঠিয়ে কোনও লাভ হবে না। পাস্টেরনাক ও ডক্টর জিভাগোর পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে প্রয়োজন রুশ ভাষায় উপন্যাসটির প্রকাশ ও প্রচলন। পাস্টেরনাককে আন্তর্জাতিক এক ঘটনায় পরিণত করার প্রথম ধাপ হিসেবে এই পদক্ষেপ নিতে হবেই। কিন্তু মূল রুশে যেহেতু বইটি এখনও বেরোয়ইনি, সেহেতু পুনর্মুদ্রণও করা যাবে না। সিআইএ কি তা হলে সরাসরি উপন্যাসটির রুশ সংস্করণ প্রকাশ করে দেবে? পাস্টেরনাক কিন্তু চান না আমেরিকায় তাঁর উপন্যাস মুদ্রিত বা প্রকাশিত হোক, এতে তাঁর বিস্তর 'ক্ষতি' হওয়ার সম্ভাবনা। তাঁকে গুপ্তচর বা মার্কিন পুঁজিবাদের গোলাম বলবে কম কমিউনিস্ট সরকার— ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এরকম জানিয়ে সতর্ক করে দেয় সিআইএ-কে। উপায় কী তবে? একটিই উপায় ছিল তাদের কাছে, উপন্যাসটির একটি 'ব্ল্যাক' সংস্করণ প্রকাশ করা। তারা ঠিক করে বইটির প্রকাশনার কাজ তারা আমেরিকাতেই করবে, বইটি মুদ্রিত হবে ইউরোপে। '৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাসেলস্-এ ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড ফেয়ার-এ কপিগুলি সোভিয়েট দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, কিছু কপি দেওয়া হবে সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করা জাহাজগুলির নাবিকদের হাতে।

সেই মতোই তারা ফেলিক্স মোরো নামে নিউ ইয়র্কের এক প্রকাশককে বরাত দেয় রুশ ভাষার ডক্টর ক্রিভাগো-র টাইপসেট করতে ও দুই সেট ফোটো-অফসেট প্রুফ তৈরি করতে। কিন্তু মোরো ঘটনা ও পরিস্থিতির যথাযথ গুরুত্ব না বুঝে পুরোটাই নিজের বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। একিক-ওকিক বলেও দেন রুশ ক্রিভাগো-র কথা। শুধু তাই নয়, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বন্ধুর কাছে পাণ্ডুলিপিটির একটি কপি দিয়ে দেন, বলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে তারা যেন সেটি প্রকাশ করে। সিআইএ-র হাত থেকে তাদের অতি গোপনীয়, সাজানো প্ল্যান প্রায় ভেস্তে যেতে বসেছিল মোরো-র কাজেকর্মে!

মোরোকে দিয়ে হবে না, বুঝে যায় সিআইএ। এবার ডাচ গুপ্তচর সংস্থার প্রবেশ। নেদারল্যান্ডস-এর ইন্টেলিজেন্স 'বিডিউ'র সাহায্য নেয়

ওলগা ইভিনস্কায়া

সিআইএ উপায়ান্তর না দেখে। শোনা যাচ্ছিল, ফেলটিনেল্লি ভাড় অ্যাসোসিক প্রকাশনা সংস্থা মুটন-এর সঙ্গে নাকি যৌথভাবে ডক্টর ক্রিভাগো-র একটি রুশ সংস্করণ প্রকাশ করার পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু যখন জানা গেল ফেলটিনেল্লি এ-বিষয়ে আপাতত কিছু ভাবছেন না, সিআইএ ও বিডিউ নিজেরাই এগিয়ে গেল। ১৯৬০ কপি ছাপার আদেশ দেওয়া হল মুটন-কে (একটি ছোট ভুল হয়ে গিয়েছিল শেষ মুহূর্তে। মুটন-এর কর্মী ভেবেছিলেন প্রকাশনার কাজটি ফেলটিনেল্লিই করাচ্ছেন, তাই প্রকাশক হিসেবে তিনি ফেলটিনেল্লির নামটিই দিয়ে দেন। যদিও পরে মুটন-এর তরফে ঘটনাটিতে অতান্ত দুঃখ হওয়া ফেলটিনেল্লির কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়।)

পরিকল্পনা অনুযায়ীই সেপ্টেম্বরে রাসেলস-এর আন্তর্জাতিক বিশ্ব মেলায় চলে ডক্টর ক্রিভাগো। বই বিতরণের জন্য সাহায্য নেওয়া হল ভ্যাটিক্যানের! তাদের স্টল থেকেই একে-একে সরতে লাগল পাস্টেরনাকের 'heretical literary work'-এর কপি। ঢুকতে থাকল 'কমিউনিস্ট ব্লক'-এর দেশগুলিতে।

২৩, অক্টোবর ১৯৫৮। স্টকহোমের নোবেল কমিটি ঘোষণা করল, তাঁর 'important achievement both in contemporary lyrical poetry and in the field of the great Russian epic tradition'-র জন্য সাহিত্যে নোবেল পাচ্ছেন বরিস পাস্টেরনাক।

পঞ্চম পর্ব

'৫৮ সালের গোড়ার দিকেই কেজিবি যেন কিছুটা হলেও আঁচ পাচ্ছিল যে, এ বছর নোবেল পেতে পারেন পাস্টেরনাক। কিন্তু 'In the summer of 1958, a large campaign to award Pasternak a Nobel prize was initiated by Americans and launched in the West,' কেজিবি এধরনের কথা ভাবলে বা প্রচার করলেও, তা ভিত্তিহীন। কারণ, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য বরিস পাস্টেরনাক চারের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মনোনীত হচ্ছিলেন। নোবেল কমিটির গুবেষণাগার আর্কাইভেও সে প্রমাণ বর্তমান। পাস্টেরনাকের পুত্রও জানাচ্ছেন, 'Rumors that Pasternak was to receive the Nobel Prize started right after the World War II was over... his nominee was discussed every year from 1946 to 1950, then again in 1957'। 'ডক্টর ক্রিভাগো'-কে হাতিয়ার করে সিআইএ বা অন্য কোনও বাম-বিরোধী ইউরোপীয় গোষ্ঠী পাস্টেরনাককে নোবেল পাইয়ে দিয়েছে বা পেতে সাহায্য করেছে, উদ্ভরকালে বারবারই শোনা গিয়েছে এমন এক হাইপোথিসিস। যদিও ঐতিহাসিক নথি-দলিল-পত্র বিপরীত সাক্ষ্যই বহন করছে। পাস্টেরনাক নিজেই বলেছিলেন 'I did not think the Prize was awarded to me for "Doctor Zhivago", but rather for my entire work as it was formulated. I could think so, because my nomination was on list in times when this book did not exist and no one knew about it.'

কয়েকটি অনুমান হয়তো ঠিক। প্রথমত, 'ডক্টর ক্রিভাগো' ছবাদিহ করেছিল পাস্টেরনাকের নোবেল প্রাপ্তি, নোবেল সাইটেশনে যে-'great Russian epic tradition'-এর উল্লেখ রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে 'ডক্টর ক্রিভাগো'-কে স্মরণে রেখেই। পাস্টেরনাক আর কোনও উপন্যাসই (ছোট আখ্যানধর্মী কয়েকটি গদ্যরচনা আছে মাত্র) লেখেননি, 'এসিস' তো দূরঅস্তু। তবে পাস্টেরনাক পুরস্কারটি পেয়েছিলেন

সাহিত্যগুরুদেই। কারণ, নোবেল কমিটি ১৯৫৮–তে অতটাও বাম-বিরোধী হয়ে ওঠেনি যে, তারা মেতে উঠবে রাশিয়াকে হেয় করার কোনও চক্রান্তে। ১৯৬৫-তেই সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহিত্য-মুখপাত্র মিখায়েল শলোকভ।

দ্বিতীয়ত, পাস্টেরনাক নোবেল পাওয়াতে সুবিধেই হয়েছিল সিআইএ-র। সুবিধে হয়েছিল ঠান্ডা যুদ্ধের মঞ্চে এক অভিনব দৃশ্যপট রচনায়। তাদের প্রাথমিক সাফল্যে উজ্জীবিত সিআইএ ১৯৫৯-এই একবারে নিজেদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করে 'ডক্টর জিভাগো'-র একটি মিনিয়েচার রুশ এডিশন। সিআইএ হেডকোয়ার্টারসেই মুদ্রিত হয় বইগুলি, প্রকাশক হিসেবে দেওয়া থাকে একটি কাল্পনিক নাম, 'Societe d'Edition et d'Impression Mondiale'! আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সোভিয়েট ইউনিয়নে এই পকেট-সংস্করণ।

কিন্তু পাস্টেরনাকের অন্তস্থার কি কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল নোবেল প্রাপ্তিতে?

নোবেল-প্রাপ্তি সংবাদের দু'দিন পর উদ্ভাসিত পাস্টেরনাক টেলিগ্রামে করলেন নোবেল কমিটিকে— 'Immensely thankful, touched, proud, astonished, abashed.'

এই টেলিগ্রামের দিন তিন-চার পর আর-একটি টেলিগ্রাম গেল নোবেল কমিটির কাছে। প্রেরক পাস্টেরনাকই। কিন্তু লেখার বয়ান সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'Considering the meaning this award has been given in the society to which I belong, I must reject this undeserved prize which has been presented to me. Please do not receive my voluntary rejection with displeasure.'

এ পরিবর্তন কেন?

কারণ, পুরস্কার ঘোষণা ও তৎপরবর্তী দু'দিন-দিনেই পাস্টেরনাকের উপর নেমে এসেছিল তীব্র রাষ্ট্রীয় প্রতিহিংসা, চরম আক্রমণ। তাঁকে সতর্কবার্তা দেওয়া হল, তিনি যদি পুরস্কার অস্বীকার না করেন, স্টকহোমে যদি তা গ্রহণ করতে যান, এদেশে তিনি আর ফেরত আসতে পারবেন না।

নিজের দেশেই চারদিক থেকে এল তাঁর বিরুদ্ধে অপমানকর ভাষা। তিনি এক 'সাহিত্যের আগাছা', এমন এক 'শুয়োর যে নিজের খোঁয়াড় নিজেই নোংরা করেছে' ইত্যাদি। ঘটনার ক্রমে পাস্টেরনাক এতটাই আহত, আশাহত হয়ে গিয়েছিলেন ওই কয়েকদিনে যে, তিনি আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলেন!

প্রেমিকা ওলগার পরামর্শে শেষ পর্যন্ত পুরস্কার গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন পাস্টেরনাক। পুরস্কার অস্বীকারের দিন বিকেলের চিত্র ধরা পড়েছে পুত্র জেভজেনি পাস্টেরনাকের রোমন্থনে: 'I couldn't recognize my father when I saw him that evening. Pale, lifeless face, tired eyes, and all talks about the same: "Now it all doesn't matter, I declined the Prize."'

আশ্চর্য যে, তিনি পুরস্কার অস্বীকার করেছেন— এ ঘোষণার পরও থামল না পাস্টেরনাকের উপর মানসিক নির্যাতন। ৩১ অক্টোবর, ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট রাইটার্স সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হল পাস্টেরনাককে। পলিটবুরো-তে পিটিশন জমা দেওয়া হল অবিলম্বে পাস্টেরনাকের সোভিয়েট নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে, তাঁকে সে দেশ থেকেও বহিষ্কার করা হোক।

পাস্টেরনাক লিখলেন একটি কবিতা। নাম

বিল মলডিন-এর পুলিৎসারজয়ী সেই বিখ্যাত কার্টুন

'I WON THE NOBEL PRIZE FOR LITERATURE. WHAT WAS YOUR CRIME?'

পাস্টেরনাক ও নেহরু, কেউ-কারওকে মুখোমুখি দেখেননি। কিন্তু, পাস্টেরনাকের সত্তরতম জন্মদিনে জওহরলাল নেহরু তাঁকে একটি অ্যালার্ম ঘড়ি উপহার পাঠান, যদিও নেহরু জানতেন, 'বন্ধু'-র 'শত্রু'-কে তাঁর এ উপহার পাঠানো এক অর্থে সরকারি প্রোটোকল ভাঙা।

'নোবেল প্রাইজ'। তার কয়েকটি লাইন— 'Am I a gangster or murderer?/ Of what crime do I stand/ Condemned?/ I made the whole world weep/ At the beauty of my land.' কবিতাটি প্রকাশের জন্য দেশপ্রেহী-র তকমা পড়ল পাস্টেরনাকের উপর।

বিশ্বজুড়ে পাস্টেরনাকের পক্ষে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। টি এস এলিয়ট, স্টিফেন স্পেন্ডার, গ্রাহাম গ্রিন, বার্ট্রান্ড রাসেল, ই এম ফরস্টার, পার্ল বাক-এর মতো খ্যাতিমান লেখকরা আবেদন জানালেন পাস্টেরনাককে রেহাই দেওয়ার। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে জানালেন, যদি পাস্টেরনাক বহিষ্কৃত হন, তা হলে তিনি পাস্টেরনাকের বসবাসের জন্য তাঁকে একটি দুর্গ দান করবেন।

মার্কিন কার্টুনিস্ট বিল মলডিন আঁকলেন তাঁর বিখ্যাত 'পাস্টেরনাক কার্টুন'। বাঙ্ময়চিত্রিতে লেখা যাচ্ছে, গুলাগ ক্যাম্পে বন্দি পাস্টেরনাক আর-একজনকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'I won the Nobel Prize for literature. What was your crime?' কার্টুনটির জন্য মলডিন পেলেন 'পুলিৎসার প্রাইজ ফর এডিটোরিয়াল কার্টুনিং'।

মনোভাবে কিন্তু কোনও পরিবর্তন এল না সোভিয়েট প্রশাসনের। বাধ্য হয়ে পাস্টেরনাক চিঠি লিখলেন ক্রুশ্চেভকেই, কবির বিনীত আর্তি তাঁকে যেন দেশছাড়া না করা হয়— 'Departure beyond borders of my country would be for me tantamount to death and I therefore request you not to take this extreme measure against me.'

পাস্টেরনাক-পুত্র আরও জানাচ্ছেন, 'Pasternak had to sign the party-written references to "PRAVDA" and Khruschev. It doesn't matter if their texts are good or bad, and what dominates there— repentance or self-affirmation, what matters is Pasternak did not write them, and was forced to sign.'

কিন্তু এসব সত্ত্বেও 'He would have been exiled straight away, but for Jawaharlal Nehru, who phoned Khrushchev and said he would head the Committe for Pasternak's protection.' নেহরু-জীবনীকার সর্বপল্লী গোপাল লিখছেন, "When the Soviet Government refused to allow Boris Pasternak to receive the Nobel Prize, Nehru, claiming to act more in his capacity as the Chairman of the Sahitya Akademi... than as Prime Minister, conveyed, again informally, to Moscow his feeling that the injustice done to Pasternak would damage the prestige of the Soviet Union. In whatever capacity Nehru professed to function, his views carried weight and the

Soviet authorities assured him that there was no reason to fear for Pasternak... Thereafter Nehru declared publicly that Soviet attitude towards Pasternak 'pained us somewhat' because it was entirely opposed to India's position: a noted writer, even if he expressed views which conflicted with the dominant ones in his country, should be respected rather than subjected to any kind of restrictions. Word of Nehru's interest in him had reached Pasternak, who expressed his gratitude..."

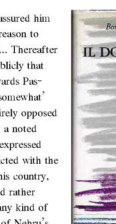

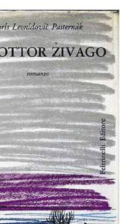

ফেলট্রিনেলি-প্রকাশিত ইটালিয়ান ও সিআইএ পৃষ্ঠপোষণায় প্রকাশিত রুশ সংস্করণ

১৯৫৯ সালেই অমিয় চক্রবর্তী ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাস্টেরনাকের সঙ্গে দেখা করতে যান। পাস্টেরনাক তাঁকে জানান, 'If I ever go out of Russia, I'll spend ten days in India. I hope I'll see the face of Nehru.' তাঁর হাত দিয়েই নেহরুর উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে পাঠান পাস্টেরনাক, 'Dear Prime Minister Nehru: Somehow the streams of our lives have met, and this is a beatitude of my heart: if ever I go out of this country, I hope I can see India before I die. My good wishes to you. Yours sincerely, Boris Pasternak.' পাস্টেরনাকের সন্তরতম জন্মদিনে নেহরু তাঁকে একটি আলার্ম ঘড়ি উপহার পাঠান, যদিও নেহরু জানতেন, 'বন্ধু'-র 'শত্রু'-কে তাঁর এ উপহার পাঠানো এক অর্থে সরকারি প্রোটোকল ভাঙা।

কেউ-কারও-কে মুখোমুখি দেখেননি, এক বিশেষ সময়ে তাঁরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, পরিচিত হয়েছিলেন; নেহরু-পাস্টেরনাক সম্পর্ক এক লুপ্ত সময়ের সত্তার মতো জেগে আছে।

মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন পাস্টেরনাক। শারীরিক দিক থেকে তো দুর্বলতর হয়েই যাচ্ছিলেন। ভূমধ্যসাগরীয় ফুসফুসের ক্যানসারে। হৃদযন্ত্রের অবস্থাও ভাল ছিল না, 'ডক্টর জিভাগো' রচনাকালীনই (১৯৫২) একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হল ৭ মে, ১৯৬০। ৩০ মে, ১৯৬০-এ প্রয়াত হলেন বরিস পাস্টেরনাক।

মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে সামনে উপস্থিতদের বললেন, 'Don't forget to open the window tomorrow.'

১৯৬৪ সালে, পাস্টেরনাকের মৃত্যুর চার বছর পর, রেজনিভের ষড়যন্ত্রে ক্রুশ্চেভকে 'স্বেচ্ছাবসর' নিতে বাধ্য করা হয়। পদ-হারানো ক্রুশ্চেভ সীমাবদ্ধ হয়ে যান তাঁর ডাচশা-তেই। '৬৬ সাল থেকে লিখতে শুরু করেন তাঁর স্মৃতিকথা। সেখানেই শোনা যায় তাঁর অনুশোচনা— 'In connection with Doctor Zhivago, some might say it's too late for me to express regret that the book wasn't published. Yes, may be it's too late. But better late than never.' গ্রন্থকারে ১৯৭০-এ প্রকাশিত হয় 'ক্রুশ্চেভ রিমেমবার্স'। কিন্তু পাস্টেরনাকের উপন্যাসের মতোই দেশে প্রকাশিত হতে পারেনি সে বই। 'ডক্টর জিভাগো'-র মতোই ক্রুশ্চেভকে তাঁর স্মৃতিকথা 'স্মাগল' করতে হয়েছিল স্বদেশের বাইরে।

কবিকে বোধহয় তখন আরও বেশি মনে পড়ছিল রাষ্ট্রনায়কের।

উত্তর পর্ব

রাশিয়াতে পাস্টেরনাকের 'rehabilitation' হয়েছে আটের দশকে। ১৯৮৮ সালে 'নোভি মির' পত্রিকাতেই ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় 'ডক্টর জিভাগো'। রুশ দেশে রুশ ভাষায়, সেই প্রথমবার। এক বছর পর, ৯ নভেম্বর, বার্লিন প্রাচীরের পতন। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন; গর্বাচভের পেরেস্ত্রৈকার, গ্লাসনস্তের চূড়ান্ত লয়। আর ১৯৮৯ সালেই, ভেভজেনি পাস্টেরনাক স্টকহোমে নিয়ে পাস্টেরনাকের নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন। নোবেল কমিটি সেই ১৯৫৮-তেই জানিয়ে দিয়েছিল, পাস্টেরনাক বাধ্য হয়ে ফিরিয়েছেন পুরস্কার, তারা পুরস্কার প্রত্যাহার করবে না।

যিনি থাকতে চেয়েছিলেন অন্তরালে, জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'বাইরে কোন শত্রু?', তাঁকেই সময় ও ইতিহাস টেনে এনেছিল এক অদ্ভুত জটিলতায়

যা তাঁকে ধ্বস্ত করে দিয়েছিল, জীর্ণ করে দিয়েছিল। শব্দের কাছে তাও সতত নতজানু থেকেছেন বরিস পাস্টেরনাক। তাঁরই এক পূর্বসূরি মিখায়েল বুলগাকভের মতো তিনি যেন বিশ্বাস করতেন 'Manuscripts never burn'.

হাইপারটেক্সটের অনুপ্রবেশে, বই, পাণ্ডুলিপির কাগজ, মসীর গন্ধ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন থেকে। অবগুণ্ঠনে চলে যাচ্ছে শব্দ, ইমেজের চাকচিক্যের সামনে জৌলুস হারিয়ে ক্রমশ এক শূন্যতায় তাদের আবেগ, আকর্ষণ, আবেদন বাঁধা রাখছে সকলে, প্রত্যেকে। এমন এক সময় একটি বই ও সেটি ঘিরে বিশ্বজুড়ে তোলপাড়ের কাহিনি, একজন কবি ও তাঁর উপন্যাস নিয়ে আন্তর্জাতিক গুপ্তচর সংস্থা-গোয়েন্দাদের অশ্লীল ছোটাছুটি, এই সব যেন কোথাও এক শিকড় সন্ধানে যাওয়ার আহ্বান জানায়। যে-শিকড় সন্ধানের শেষে গিয়ে দেখা যাবে, আমাদের অস্তিত্বের আদিতে ও বিস্তারে কেবলই শব্দ আর শব্দ।

বাইরে শতাব্দ যা-ই হোক না এখন, শব্দকে সম্মান জ্ঞাপন যেন অহর্নিশ প্রবহমান থাকে।

তথ্যসূত্র:

সিলেক্টেড পোয়েম্স, বরিস পাস্টেরনাক, অনুঃ জন স্টলওয়ার্দি ও পিটার ফ্রান্স, পেঙ্গুইন।

সিলেক্টেড রাইটিংস অ্যান্ড লেটার্স, বরিস পাস্টেরনাক, প্রগ্রেস পাবলিশার্স।

লেটার্স টু জর্জিয়ান ফ্রেন্ডস, বরিস পাস্টেরনাক, পেঙ্গুইন।

আ ক্যাপটিভ অফ টাইম, ওলগা ইভিনস্কায়া, ডলফিন।

দা জিভাগো আফেয়ার: দা কেমেলিন, দা সিআইএ অ্যান্ড দা ব্যাটল ওভার আ ফরবিডেন বুক, পিটার ফিন ও পেট্রা কুভে, হার্ভিল অ্যাড সেকার।

ইনসাইড দা জিভাগো স্টর্ম: দি এডিটোরিয়াল অ্যাডভেঞ্চার্স অফ পাস্টেরনাক্স মাস্টারপিস, পাওলো মানকোসু, ফেলট্রিনেলি।

ক্রুশ্চভস রাশিয়া, এডওয়ার্ড ক্র্যাঙ্কশ, পেঙ্গুইন।

জওহরলাল নেহরু: দা এক্সপেরিমেন্ট, তৃতীয় খণ্ড, সর্বপল্লি গোপাল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

অমিয় চক্রবর্তী-র সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখাটির জন্য, *www.parabas.com*

সিআইএ অপ্রেবসাইট; ২০১৪ সালে সিআইএ পাস্টেরনাক ও 'ডক্টর জিভাগো' সম্পর্কিত সমস্ত ফাইল (প্রায় একশোটি) প্রকাশ করেছে। তাদের অপ্রেবসাইটে এ বিষয়ে আরও তথ্য পাওয়া যায়।

গুরুত্বের বিচারে তালিকাটি করা হল। স্থানাভাবে সকল তথ্যসূত্রের উল্লেখ করা গেল না।

প্রেমের কবিতা : আমি শুধু একলা করে তুলি

বি ভা স রা য় চৌ ধু রী

সাঁকো ভাঙার পর

শূন্যতায় মানিয়ে গেছি বেশ...
কোথাও তুমি
নেই জেনেই
পুঁতেছি কত গাছ
প্রতিটি বর্ষায়!

ধারণা থেকে
এই জীবন
খাদের দিকে যায়...

আয়না কোনও সত্যি কথা বলে না কক্ষনও!

জলও নয়
জলও নয়
জলও নয়...

আমার ছিল সাঁকো ভাঙার পর
আগের চেয়ে
একাকিত্বে ভয়...

সন্ধের অলিগলি

বৃষ্টির প্রবণতা
আঁচলে ঢেকেছ তুমি...
আগলে রেখেছ ভিজবার অধিকার!

কাছাকাছি থাকি পাশাপাশি থাকি শুধু...
আমার জন্য
কিছুই আনোনি আর...

সহজ মিলন-সংকেতে ডাকে জল...

শূন্যতা দিয়ে
শূন্যতা মাপা কাজ...

ঝড়কে দিয়েছ পাখিটির শোক!
ঠোঁটে
ঠোঁটে কুড়োনোর
সন্ধ্যা নামেনি আজ...

দাবি

হাওয়াকে বলিনি, তাই
পরবর্তী হাওয়া ছুটে আসে...

জলের মহিমা এই—
সে অনিয়ন্ত্রিত...

গাছ কি প্রকৃত শান্ত? জানি না বলেই
বুঝতে পারি না কিছু,
সমস্ত শিকড় তার হন্যে হয়ে ছোটে!

দায় থেকে জোটে
বিদায় থেকেও জোটে
আমি দেখি তোমার শরীর
বোবা কান্না আমার জীবনে

দেখার পরেও দেখি... দেখার পরেও দেখি...
দেখি আর ভাবি—

"ভিড়ের নাগাল থেকে
আমাকে আগলে রেখো..."

— কবিতার এটুকুই দাবি!

আগামীকাল

খালি ঠোঁটেই ফিরে আসছি...

চুম্বনেরও চিন্তাশরীর লাগে!

মেঘের নিচে কেমন-যেন
আলোয় দু'জন পাখি
উড়েই যাচ্ছে...
উড়েই যাচ্ছে
তীর হবার আগে...

খালি ঠোঁটেই ফিরে আসছি...
ভাল্লাগে না...

মৃত কৃষক
ছিন্ন মেয়ে
সন্ন্যাসিনীর ক্ষত
আমার জন্য কাঁদছে মলিন
সন্ধেগাছের তলায়...

দু'চোখ মুছি... পারতে হবে... হবেই...
কবি তো সব ধারণ করে,
ঠোঁটকে দিয়ে বলায়!

ঘুরে দাঁড়াই...
অবসাদের সন্ধে মুছে
ভোরের চোখে দেখি—

দেওয়ার ঠোঁটে নেওয়ার ঠোঁটে পাগল কোনও জুটি
দুঃসময়কে
বলছে যেন
আগামীকালের গলায়...

দিনশেষে রিকশা থামল

মে ঘ ব সু

লেখা এল মায়ের অশ্রুর মতো ভেজা ভেজা!
বাবা গেছে কতদিন হল! ঘরে অসুস্থ সন্তান!
অহর্নিশ ব্যথা নামে। ব্যথা কারও অনুগত নয়।
জলের মুন্সায় শুধু বেঁচে থাকে চোখ। স্বপ্ন আসে।
কত কত দেশ ঘুরে তার আসা! ঠিক যেন
আমার লেখার মতো। ঠিক যেন আমার অফিস ফেরত বাবার মতো!

দিনশেষে রিকশা থামল উঠোনের ঘাসে, দড়িতে ঝুলছে—
পরার ইলিশ: 'অপর্ণা,' 'অপর্ণা...'

মন বাদল

তু ষা র কা ন্তি রা য়

ঝাঁকড়া চুলের কমবয়সি মেঘ
মাঠ পেরিয়ে আলতো ডানা মেলে
মাথার উপর আকাশ হয়ে গেলি
নকশা তুলে বাড়ালি উদ্বেগ

সন্ধ্যা হঠাৎ টুপটিপটাপ জল
চমক দমক গায়েতে বিদ্যুৎ
কাছে দূরের গন্ধ ভেজা হাওয়া
মেঘ চরানো জলযাপনের ছল

আচমকা তুই উধাল-পাথাল নীল
গইথই সুর খেলার বারান্দায়
ঝামুর-ঝুমুর নামিয়ে বিরামহীন
দিন রাতদিন লিখিস জলমিছিল

আসলে তুই ঘুমের ভিতর ঘুম
পাখির খেলা খেলতে শেখা মন
তোকে ছোঁয়ার ইচ্ছে নিয়ে বুকে
জানলা খুলে দাঁড়াল নিঃঝুম

দু'টি কবিতা

গৌতমকুমার ভাদুড়ি

যাত্রা

এইখানে
তুলসীমঞ্চের নিচে চতুষ্কোণে ঘেরা এই ক্ষেত্রখানি
তোমারই সকল স্মৃতি বুকে নিয়ে পড়ে আছে আজও।
এখানে দক্ষিণশিরে শেষবার শুয়েছিলে তুমি
পৃথিবী মায়ের বুকে যেন কী আরামে!
উঠেছিলে সেজে শেষবার চন্দনে কুমকুমে আর
শ্বেতশুভ্র ফুলের সজ্জায়
খইয়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার সে নতুন যাত্রায়।

কলমির দামে ঢাকা পুকুরের ধার দিয়ে
হেঁটেছি অনেক পথ আমরা ক'জন;
লেবুর ঝোপের তলে জোনাকির দলও বুঝি
স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তোমার সে ফেলে যাওয়া
পুকুরের ঘাটটির মতো।
ধীর পায়ে পৌঁছে গেছি পবিত্র সে ভূমিখণ্ডটিতে
অনলের আলিঙ্গনে সমর্পণ করেছি তোমাকে—
'ওঁ দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ এনং দহন্তু'।

শান্ত হলে সে অগ্নির সর্বগ্রাসী ক্ষুধা গৃহে ফিরে
তারই তাপ নিয়েছি আবার, লৌহখণ্ড স্পর্শ ক'রে
দাঁড়িয়েছি ঘরের দাওয়ায়— দাঁতে কেটে নিমপাতা, চাল।
সাঙ্গ যেন হল আজ পৃথিবীর দীর্ঘ পরিক্রমা। অবশেষে
নির্জন ঘরের কোণে বসে থাকা লোকটির
নির্বাক মুখের পানে চেয়ে গোপন করেছি অশ্রুধারা
সেকথা কি জানো তুমি, মা?

দেহি পদপল্লবমুদারম্

আখড়া পেতেছে যত সহজিয়া কথক ফকির
ভেসে আসে কীর্তনের কথাগুলি জীর্ণপ্রায় ছাউনির থেকে—
'মিলন হবে কত দিনে
আমার মনের মানুষের সনে?'
সুমধুর কলিগুলি তার কী মধুর অনুভবে
পরিপূর্ণ করে তোলে সমস্ত আকাশ
ভক্তিরসে ভারী হয় কেঁদুলির পবিত্র বাতাস।

বাউলানি সাধিকার একতারা থেকে উঠে সুরের পাখিরা
ভেসে যায় দূর থেকে দূরে
তমালতলির মেঠো-পথে সেই সুর
সুধারসে পূর্ণ করে সহস্র হৃদয়
হারিয়েছে পথ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড়ে।

সারারাত নিষ্পলক প্রতীক্ষার শেষে
সংক্রান্তির নিশি ওই ভোর হয় হয়; গঙ্গার পবিত্র গন্ধখানি
অজয়ের গর্ভ থেকে উঠে এসে পৌষের দিগন্তে ছড়ায়।
কদম্বখণ্ডির ঘাটে আজও ওই ধীরপায়ে চলেছেন কবি এক
গৃহে রেখে ভূর্জপত্রে অসম্পূর্ণ পদখানি তাঁর,
চিন্তাক্লিষ্ট মনে তিনি নেমে যান জলে। স্নান সমাপনে
ফিরে এসে চক্ষুদু'টি বিস্মিত পরম
স্বয়ং মাধব এসে গিয়েছেন পূর্ণ করে পদখানি তাঁর—
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

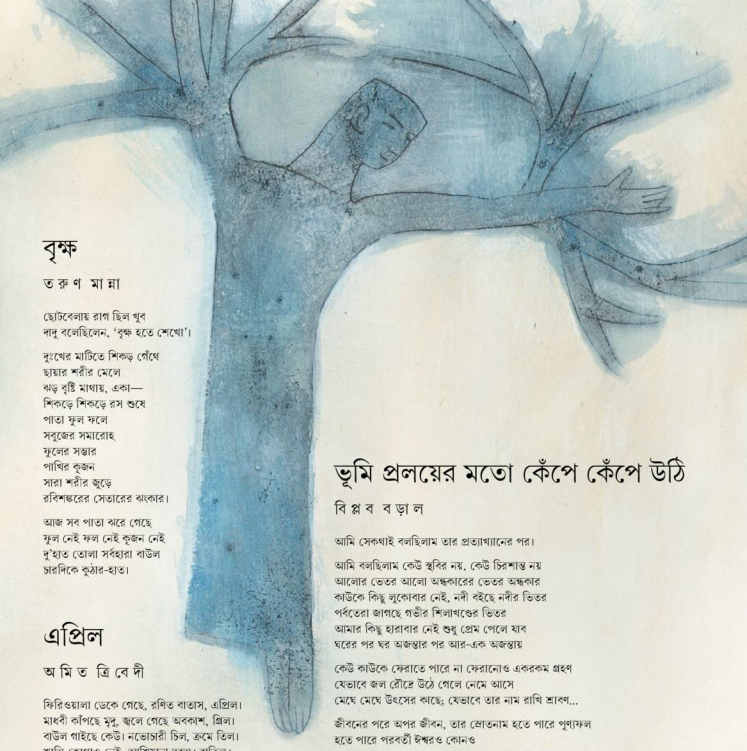

বৃক্ষ

তরুণ মান্না

ছোটবেলায় রাগ ছিল খুব
দাদু বলেছিলেন, 'বৃক্ষ হতে শেখো'।

দুঃখের মাটিতে শিকড় গেঁথে
ছায়ার শরীর মেলে
ঝড় বৃষ্টি মাথায়, একা—
শিকড়ে শিকড়ে রস শুষে
পাতা ফুল ফলে
সবুজের সমারোহ
ফুলের সম্ভার
পাখির কূজন
সারা শরীর জুড়ে
রবিশঙ্করের সেতারের ঝঙ্কার।

আজ সব পাতা ঝরে গেছে
ফুল নেই ফল নেই কূজন নেই
দু'হাত তোলা সর্বহারা বাউল
চারদিকে কুঠার-হাত।

এপ্রিল

অমিত ত্রিবেদী

ফিরিওয়ালা ডেকে গেছে, রণিত বাতাস, এপ্রিল।
মাধবী কাঁপছে মৃদু, জ্বলে গেছে অবকাশ, প্রিয়।
বাউল গাইছে কেউ। নভোচারী চিল, ক্রমে তিল।
শান্তি কোথাও নেই, আশিয়ানা দুরন্ত! বাতিল!

পিঁপড়ের সারি ধরে এগিয়ে গিয়েছি। ফাটলে।
এখনও হইনি বড়, মা, আমাকে ধরো! পা টলে!
ঘাটের তলায় ছায়া মায়াময়। সম্ভাবনায়।
হঠাৎ মেঘলা হলে দুপুরটি, সন্ধ্যা ঘনায়।

স্মৃতির আলগা টান, পিছনে। সামনে অগণন
ডাক ডাক ডাক ডাক! কিছু রব, বাকিটা রণন।
সাড়া দিতে গিয়ে দেখি দিনলিপি হাঘরে, হাভাতে।
রাতটি আমায় দাও! রানি করে দেব প্রভাতে।

পৈতৃক কলসটি জলহীন। সঙ্গীতময়।
ভাসিয়ে দিয়েছি ছায়া, গহন হয়েছে জলাশয়।

ভূমি প্রলয়ের মতো কেঁপে কেঁপে উঠি

বিপ্লব বড়াল

আমি সেরুথাই বলছিলাম তার প্রত্যাখ্যানের পর।

আমি বলছিলাম কেউ স্থবির নয়, কেউ চিরশান্ত নয়
আলোর ভেতর আলো অন্ধকারের ভেতর অন্ধকার
কাউকে কিছু লুকোবার নেই, নদী বইছে নদীর ভিতর
পর্বতেরা জাগছে গভীর শিলাখণ্ডের ভিতর
আমার কিছু হারাবার নেই শুধু প্রেম পেলে যাব
ঘরের পর ঘর অন্ধকার পর আর-এক অন্ধকার

কেউ কাউকে ফেরাতে পারে না ফেরানোও একরকম গ্রহণ
যেভাবে জল রৌদ্রে উঠে গেলে নেমে আসে
মেঘে মেঘে উৎসের কাছে; যেভাবে তার নাম রাখি শ্রাবণ...

জীবনের পরে অপর জীবন, তার স্তোত্রনাম হতে পারে পুণ্যফল
হতে পারে পরবর্তী ঈশ্বরও কোনও
হতে পারে চুপ করে থাকা, নত থাকা মানে
বেন ঋষিদের বিচূর্ণ প্রলাপ...

ভূমি প্রলয়ের মতো কেঁপে কেঁপে উঠি যে-সময়
আকাশ বিশ্বাসে নত হয়ে আসে
চলে প্রাণ জাগে বিশ্বস্ত সমান হাত
পাখির ডানার মতো উজ্জীবিত বিস্ময়
উড়ে চলি উড়ে চলি আলোছায়াময় হরিণ চত্বরে

আমি প্রেম থেকে ভালবাসা থেকে
কখনও মুক্তি পাব না জানি...

অজন্তঃ সুব্রত চৌধুরী

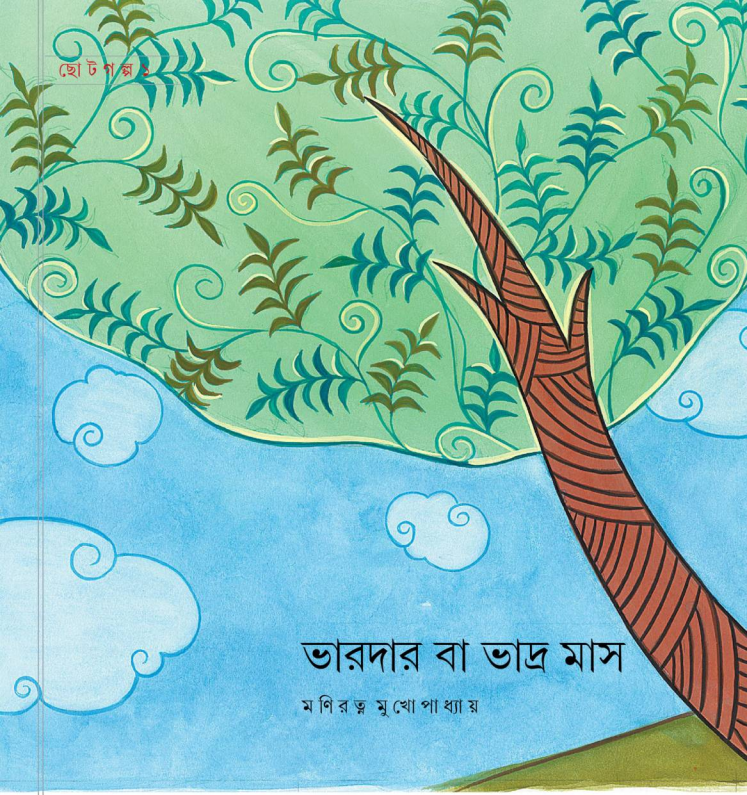

ভারদার বা ভাদ্র মাস

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়

চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে মেজাজটা ভাল ছিল না। ওটা এসেছে আমার পুরনো ঠিকানা থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে। তবু ভাল যে, চিঠিটাকে পোস্ট করা হয়েছিল, ক্যুরিয়ার করা হয়নি। দেরি হয়েছে, কিন্তু এসেছে ঠিক। লিখেছেন ত্রিনিদাদ থেকে শিউরাম ভুইঁনা। অনেক কিছু লেখার পর উচ্ছ্বসিত হয়ে জানিয়েছেন যে, ত্রিনিদাদের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার নাইরায়োন ভারদার আসবেন ইন্ডিয়ায়। তিনি তাঁর নিজের জন্মভূমি বিহারের লিচ্ছুয়া গ্রামে যেতে চান। একবার নিজের পিতৃপুরুষের জন্মভূমিকে নিজের চোখে দেখতে চান। আমি যেন তাঁকে একটু সাহায্য করে দিই। সস্ত্রীক আসছেন সোজা কলকাতা। ডিপ্লোম্যাটিক মিশনকে খবর দিতে বারণ করেছেন। তারা জানতে পারলে সব কিছু তাদের মতে করতে হবে। নিজস্বতা বলে কিছু থাকবে না।

সেই কবে একবার আমাকে যেতে হয়েছিল ত্রিনিদাদ, বিদেশমন্ত্রীর ডেলিগেশনের সঙ্গে। তখন আমি ভারত সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলাম হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে। ওখানে অনেক ইস্কুল আর একটা কলেজে ভারত সরকার গ্রান্ট দিয়েছে, ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি এবং লাইব্রেরিতে বইপত্র কেনার জন্য। হিন্দি পড়ানোর জন্যেও গ্রান্ট দিয়েছে। তারই বিলিব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

কোন ইস্কুল কত ডলার পাবে কোন খাতে, কলেজের ল্যাবরেটরিতে কোন কোন যন্ত্রপাতি লাগবে লিস্ট করে এনেছিলাম। দিন তিনেকের মধ্যে ওখানে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর রিটায়ার করেছি, দিল্লির কোয়ার্টার ছেড়ে কলকাতায় এসে নিজের জায়গায় থিতু হয়েছি। শিউরাম ছিলেন সেই কলেজেরই প্রিন্সিপ্যাল। মানুষটিকে আমার পছন্দ হয়েছিল। উচ্চশিক্ষিত, পড়াশোনা করেছেন ইংল্যান্ডে। আমি তাঁর নিজের দেশের লোক বলে খুব খাতির করেছেন তিনটে দিন ধরে। তাঁর কলেজের ল্যাবরেটরিতে সাজসরঞ্জাম ঠিকমতো পৌঁছে যাওয়ার পরেও ফোন করতেন। দিল্লিতে আমার অফিসের যখন কাজের সময়, তখন ওখানে অনেক রাত। তবু বাড়ি থেকে ফোন করে খবর নিতেন। বোটানি ল্যাবের জন্যে দশটা মাইক্রোস্কোপ পেয়ে কত উপকার হয়েছে, সেইসব গল্প করতেন। অত জনের মধ্যে শিউরামকে আমি ভুলিনি। কারণ, তিনি ভাল মানুষ, নিজে যোগাযোগ রেখেছিলেন বলে মনে আছে আজও।

কিন্তু তাই বলে একজন মন্ত্রী এসে উঠবেন কলকাতায়, গোপন রাখতে হবে তাঁর আসার সংবাদ, ব্যাপারটা ঠিক মনে হচ্ছে না। তারপর তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে আনছেন। উনি হয়তো আন্দাজ করতে পারছেন না, এ দিকের গ্রামের অবস্থা কতটা খারাপ হতে পারে। যদিও অবস্থাটা আমারও ঠিক জানা নেই, তবে মনে হয় ত্রিনিদাদের সঙ্গে তুলনা করলে নরক মনে হবে বিহারের গ্রাম লিচ্ছুয়াকে। গ্রামটা যে কোথায় তাই জানি না!

চিঠির জবাবে আমার অসুবিধের কথা লিখলাম। আমি এখন রিটায়ার করেছি, কলকাতায় আছি। লিচ্ছুয়া যে কোথায় তা-ই জানি না। গ্রামটা কোথায়, কোন জেলায়, স্টেশন কোনটা, কেমন করে যেতে হবে, মোটরগাড়ি সোজা গ্রাম পর্যন্ত যাবে কি না, উনি কলকাতায় এসে কোথায় উঠবেন, আমাকে কী কী করে দিতে হবে, সব খুলে জানাতে বললাম।

জবাব এসে গেল, একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে শিউরাম লিখেছেন সব কিছু। আমার চিঠি পাওয়ার পর তিনি মিস্টার নাইরায়েনের সঙ্গে কথা বলেছেন।

শিউরাম জানিয়েছেন, লিচ্ছুয়া যেতে হলে ভাগলপুর থেকে জামালপুরের দিকে কয়েকটা স্টেশন পরে নামতে হবে সুলতানগঞ্জ স্টেশনে। সেখান থেকে গঙ্গা পার হতে হবে নৌকো করে। ওপার থেকে মোটরগাড়িতে যেতে হবে মাত্র তিন মাইল রাস্তা। গ্রামের হীরালাল মিশ্র ওঁদের জাতি। তিনি বেঁচে আছেন কি না উনি জানেন না। লালকিলা এক্সপ্রেসে শিয়ালদা থেকে লুপুরবেলা উঠে ভোররাতে সুলতানগঞ্জ স্টেশন পৌঁছনো যাবে। কলকাতায় এসে উনি উঠবেন একটি ভাল হোটেলে, তার জন্যে আমাকে কিছু করতে হবে না। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলের গাড়ি ওঁকে পিকআপ করবে। আমাকে শুধু ওঁকে একবার লিচ্ছুয়া দেখিয়ে দিতে হবে। বেশি কেউ যেন জানতে না পারে। আমি যেন আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাই, তাতে মিসেস ভারদার স্বস্তিতে থাকবেন। কেননা, গ্রামের দিকে যেতে হলে বিদেশি মহিলাদের অসুবিধা হওয়ার কথা। সমস্ত খরচ উনি করবেন, আমাকে এক পয়সা

খরচ করতে হবে না। আমার ফোন নম্বরটা দিতে বলেছেন শিউরাম। যাওয়া-আসার জন্যে ট্রেনের রিজার্ভেশন করিয়ে রাখতে হবে। কবে যাবেন সুলতানগঞ্জ এবং কত দিন পরে ফিরবেন জানা নেই। রেলের টাইমটেবিল চেয়ে আনা হল একজনের কাছ থেকে। বসে বসে দেখছিলাম, লালকিলা এক্সপ্রেস কখন ছাড়ে, কখন পৌঁছয় সুলতানগঞ্জ। আমাদের যখন সঙ্গে যেতে হবে, তখন চিন্তা আমাদের জন্যেও আছে। আমার একটা বড় চিন্তা হল, ওদিকের লোকে বাথরুম রাখে না বাড়িতে। সবাই মাঠে-ময়দানে যায়। আমাদের সকলের পক্ষেই সেটা বেশ অসুবিধেজনক হবে। দেখলাম, রাত সারটে নাগাদ লালকিলা এক্সপ্রেস পৌঁছবে সুলতানগঞ্জ। অত রাতে অতিথিকে নিয়ে আমি কী করব ভাবতে বসলাম। তার চেয়ে হাওড়া জামালপুর এক্সপ্রেসে গেলে রাত দশটায় হাওড়া ছেড়ে সকালবেলায় পৌঁছবে এবং ট্রেনটতে এসি ফার্স্ট ক্লাস আছে। এই ট্রেনটাই আমার ঠিক মনে হল। টেলিফোন নম্বর সমেত সমস্ত কথা লিখে জানালাম শিউরামকে।

দুই

যখন টেলিফোনটা এল তখন ভোরবেলা, মনে হয় পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। আজকেই নাইরায়ানের কলকাতায় পৌঁছনার কথা। উনি কি এসে গেলেন নাকি? টেলিফোনে 'হ্যালো' বলতেই উচ্ছ্বসিতভাবে কেউ কত কিছু বলে গেলেন, তার একবর্ণ বুঝতে পারলাম না। প্রথম উচ্ছ্বাসটা কেটে গেলে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইজ ইট হোটেলটা ঠিক কোন জায়গায় জেনে নিলাম।

আজ আমি নিজেই ড্রাইভ করব। কাল থেকে ড্রাইভার আসবে সারা দিনের জন্যে। এগারোটার সময় হোটেলে পৌঁছলাম আমরা দু'জন। গিয়ে শুনলাম, ভারবার লম্পতি সকালবেলাতেই ব্রেকফাস্টের পর একগাদা ঘুরে এসেছেন কাছাকাছি। ভাবলাম, কথার ফাঁকে একবার বলে নেব এরকম করে ওঁদের ঘোরাঘুরি ঠিক হচ্ছে না। মিস্টার ভারদার একেবারে আমাদের দেশের চাষাভুষোর মতো দেখতে। স্যুট-টাই ছেড়ে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে রাস্তায় বের হলে কেউ বলতে পারবে না, উনি আমাদের দেশের লোক নন। সে জায়গায় মিসেস ভারদার, যাঁর নিজের নাম মার্থা ইমানুয়েল, একেবারে কুচকুচে কালো, নিগ্রো বংশজ, বিরাট দশাসই মহিলা এবং তাঁর বেশভূষা বেজায় রংচঙে। উনি কলকাতার দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখবেন, সেগুলো নিয়ে সামান্য পড়াশোনাও করে এসেছেন। প্রথমেই বললেন, 'আই ওয়ান্ত তু সি ক্যালিঘাট, এনড শিহালদাহ রেলওয়ে স্টেশন, দ্য গ্রান্ড অফ হিউম্যানিটি।'

'আর তুমি, মিস্টার নাইরায়ান? তুমি কী দেখতে চাও?'

'আই ওয়ান্ত তু সি মাই নেতিভ গ্লেস, লিওচ্ছুয়া।'

ম্যাপ-ট্যাপ খুলে, গাইডবুক খুলে, আমার ছক করা প্রোগ্রামটা ওঁদের দু'জনকে বুঝিয়ে দিলাম। দেখলাম, বেশ খুশি হয়েছেন দু'জনেই। যাওয়া আর আসার স্লিপ টিকিটে দাম দেখলেন উনি। আজকাল কম্পিউটার প্রিন্টআউটে দাম লেখা থাকে। টাকাটা হিসেব করে আমাকে দিলেন। আমিও নিলাম। আমি এত বেকুব নই যে, মানাগণ্য লোক। তারপর রাতের ট্রেনে হাওড়া থেকে চলেছি সুলতানগঞ্জ। শুধু ভাবছি, এত রকমের অত্যাচার ওঁদের সইবে কি না। ট্রেনের মহোই টিকিট চেকার বলে দিয়েছেন, গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার রাস্তাতেই বেশ ভাল হোটেল আছে। দুটো রিকশা নেবেন, বেটা পছন্দ হবে সেখানে রিকশা দাঁড় করিয়ে রুমগুলো দেখে নেবেন। বাইরে থেকে দেখতে যা-ই হোক, সব হোটেলের ঘরগুলো সুবিধের নয়।

আমি ঠিক করেছি সবাইকে বলব অজগৈবিনাথ দর্শন করতে এসেছেন এঁরা, বিদেশি হিন্দু। ওঁরা যে সম্মানিত মন্ত্রী, সে কথা কাউকে বলার দরকার নেই। এবং আমার ইচ্ছে অনুযায়ী সব ঠিক-ঠিকমতো হয়েছে। হোটেলটি পছন্দসই হয়েছে। একেবারে চান-টান করে অজগৈবিনাথের মন্দিরে এসে পুজো দিয়েছেন ওঁরা। নাইরায়েন বলেছেন, 'বাদুর কাছে এই মন্দির সম্বন্ধে কত কথা শুনেছি। কত ইচ্ছে ছিল এই মন্দিরটা দেখব, এখানে পুজো দেব, প্রসাদ খাব। তুমি আমার সেই ইচ্ছা আজ পূর্ণ করলে মুখারিয়া। ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড।'

বললাম, 'লেট আস মুভ টু দা ফেরিঘাট।'

মস্ত বড় বড় সব নৌকো। সে নৌকোয় কী নেই! মানুষ, মানুষের কোলে ছানা, বাচ্চাপ্যাঁচরা, সাইকেল, মোটরসাইকেল, সবকিপাতির বড় বড় ঝুড়ি— সব আছে। জনা পঞ্চাশেক লোক হবে, কিন্তু সবার মতো বেঞ্চ বা চেয়ার নেই, সবার মতো আমরাও পাটাতনের ওপর বসেছি। মনে মনে ভাবছি এই তো সবে শুরু। কিন্তু নাইরায়ানের বা তাঁর স্ত্রীর কোনওরকমের খিধা বা অস্বস্তিতে দেখলাম না। বেশ আনন্দে চারদিক দেখতে

১০ ড্রাইভার বলল যে, পণ্ডিত হীরালাল মিশ্র মারা গেছেন

মিস্টার নাইরায়েন?'

'ইয়েস ইয়েস। নাইরায়েন হিয়ার।'

তারপর আবার সেই ঝড়ের মতো 'ত ত' উচ্চারণে ইংরেজি ভাষা বলে গেলেন। ঠিক বুঝতে পারলাম না কী বলতে চাইছেন। বললাম, 'গুডমর্নিং মিস্টার নাইরায়েন। কোন হোটেলে উঠেছেন?'

হোটেলের নাম বললেন।

আবার অনেক কথার তোড়ে ভেসে গেলাম আমি। একসময় ওঁর কথার তোড় থামিয়ে বললাম, 'মিস্টার নাইরায়েন, আই শ্যাল কাম টু ইয়োর হোটেল অ্যাট ইলেভেন ও'ক্লক, অ্যান্ড ডিসকাস কমপ্লিট প্রোগ্রাম।'

'ওকে, ওকে, অ্যান্ড ব্যাক ইউ।'

গাইডবুক থেকে হোটেলের নম্বর পেয়ে গেলাম, ফোন করে জেনে নিলাম ফোর ফিরো নাইনে আছেন মিস্টার নাইরায়েন ভারদার।

ত্রিনিদাদের মন্ত্রীর সমস্ত খরচ বহন করবা উনি এসেছেন, খুব ভাল কথা। ঘুরে ঘুরে দেখবেন, খুব ভাল কথা। আমি তাঁর জন্য টাকাপয়সা খরচ করতে যাব কেন!

তিন

কলকাতায় আমি ওঁদের একটি ভাল চাঁ, ইংরেজ আমলের কবরখানা, মাদার টেরেসার নির্মল হৃদয়, ভিক্টোরিয়া, মনুমেন্ট ইত্যাদি দেখিয়েছি। হেস্টিংসে গঙ্গায় চান করিয়েছি, কলকাতা মেট্রো চড়িয়েছি, একটা বড় শপিংমলে গিয়ে বাজার দেখিয়েছি। শিয়ালদহ স্টেশনে সন্ধেবেলার ভিড় দেখিয়েছি। কালীঘাটের মন্দিরে ভক্তিভরে পুজো করে ওঁরা ইচ্ছেমতো রাস্তার ধারে শালপাতার ঠোঙায় ফুচকা খেয়েছেন— আমি চেয়ে চেয়ে দেখেছি। ওঁদের নিজেদের দেশে এসব সম্ভব নয়। সেখানে ওঁরা দেখতে চলেছেন। অজগৈবিনাথের মন্দির ক্রমশ দূরে চলে গেল। এপারে এসে কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে সাবধানে নামলাম এবং কী আশ্চর্য, একটা গাড়িও পেলাম। জিপগাড়ি, ঝড়ঝড়ে, তবু পেয়েছি যে, এই ঢের!

জিপগাড়ি তো নয়, গোরুর গাড়িরও অধম। তবে আমরা বসে আছি, সুতরাং ভয়ের কারণ নেই। রাস্তা থেকে প্রায়ই নেমে পড়ছে জিপ— মাঠের আলের ধারে ধারে চলাই ড্রাইভার শ্রেষ্ঠ মনে করছে। রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়ার উপায় নেই এত খারাপ সেটা। লোকে বিকল্প বের করে নিয়েছে। তবু ভাল এখন বর্ষাকাল নয়। তবে মাঠের ধুলোয় আমরা সবাই ধূলিধূসর করে নিচ্ছি।

এক ঘণ্টা লাগল না, তার আগেই আমরা লিচ্ছুয়া পৌঁছে গেলাম। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হীরালালজি মিত্রাকা মকান খানা হ্যায় হমেঁ।'

ড্রাইভারকে কিছু বলল লোকটা, বলে দাঁড়াল না একদম। যেমন আসছিল তেমনই চলে গেল। গ্রামে ঢুকে পড়ে জিপগাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। ইতি-উতি লোকে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। আমাদের নামতে বলল ড্রাইভার। বুঝিয়ে দিল, পন্ডিত হীরালাল মিশ্র মারা গেছেন বছর কুড়ি আগে। তাঁর বিধবস্ত বাড়িটাতে ভূত আছে। ওদিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না। লোকটা বলে গেছে, গাড়ি আর যাবে না। তোমরা হেঁটে চলে যাও। শেষপ্রান্তে গোড়োবাড়িটা ঠিক চিনতে পারবে। আমি বললাম, 'মিস্টার নাইয়ার, ইয়োর রিলেটিভস হীরালাল এপায়ার্ড ট্রুয়েন্টি ইয়ার্স এগো। তাঁর বাড়িটাতে কেউ থাকে না, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে।'

মুখটা মলিন হয়ে গেল ওঁর। আমাদের সকলেরই কিছুটা দুঃখ হল। ড্রাইভার এল না সঙ্গে, গাড়ি পাহারা দিতে হবে, নইলে বিচ্ছু ছেলেরা সব খুলে নেবে। আমাদের চারজনের দলটা চলতে লাগল। ভাবছিলাম, হীরালাল নেই তো কী হয়েছে, ওঁর পরিবারের শাখা-প্রশাখা তো থাকবে গ্রামে। গ্রামটা শেষ হয়ে পাশের দিকে একটা টিউবওয়েল দেখা গেল। বউ-ঝি'রা কাপড় কাচছে, তারা আমাদের দেখে মাথায় কাপড় তুলে দিল। বহু বিচিত্র রঙের শাড়ি আর হলুদ রঙের জিন্স পরা মিসেস ভারদারকে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল। একটি মেয়ের মাথায় ঘোমটা দিল না, মনে হয় সে এই গ্রামের মেয়ে। তাকে ডাকল আমার স্ত্রী। মেয়েটার সাহস আছে বলতে হবে, সঙ্গে-সঙ্গে চলে এল আমাদের কাছে।

আমি একবার নাইয়োনকে দেখলাম, বেশ বড়। নাইয়োন বললেন, 'আমি এখানে একটা ইস্কুল করে দেব। তুমি গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলো। আজ যতটুকু কথা হয় ভাল, না হলে কাল আবার আসব। আমাদের গাড়ি তো সেই রাতের দিকে।'

দু'-একজন বয়স্ক লোক এসে গেলেন, তবে তাঁরাও ছেলেদের মতোই পাঁচেলটা রাস্তাটা পেরিয়ে ভিটেতে উঠে এলেন না। আমি নেমে এসে ওঁদের বোঝালাম, এই ভদ্রলোক মিস্টার নাইয়ারিন, থাকেন ত্রিনিদাদে। ওঁর দাদুর দাদু এই গ্রামের লোক ছিলেন। বহুদিন আগে উনি যান ত্রিনিদাদে আখচাষের জমিতে কাজ করতে। তাঁর নাম ছিল চতুরানন মিশ্র। তবে ওখানে গিয়ে নাম নিয়েছিলেন চতুর বাঙ্গালি। কলকাতা থেকে ওঁদের জাহাজে করে নিয়ে গিয়েছিল বলে বাঙালি নাম নিয়েছিলেন। ওঁর দাদু ওঁকে বলে গিয়েছিলেন একবার দেশের বাড়িতে আসতে। চতুরানন মিশ্র ছেলে-বউকে নিয়ে যাননি। তিনি অত্যন্ত গরিব ছিলেন। টাকা পাঠাতেন বউকে, ছেলেকে। তারপর ওখানেই আর-একটা বিয়ে করেছিলেন। তাঁর নাতি ছিলেন ওঁর দাদু, নাম ছিল শিবারা সেরাওন, শিব থেকে শিবারা, আর শ্রাবণ মাসে জন্ম বলে সেরাওন। উনি ওখানে বেশ বড় চাকরি করেন, পিতৃপুরুষের দেশ দেখতে এসেছেন। এই জায়গাটাতে উনি একটা ইস্কুল করে দিতে চান।

প্রচণ্ড গুলতানি শুরু হল গ্রামবাসীদের মধ্যে। এখানে এই ভূতের ভিটেতে কেউ পড়তে আসবে না। এখানে ইস্কুল করার মানে হয় না। ওঁরা বলতে চান যে, বড় দেখে জমি আমরা দেব, সেখানে করুন ইস্কুল। কথাটা বলার মানে ভারদারকে, উনি রাজি হলেন না। ওঁর মতে, একটা কুসংস্কারের বশে গ্রামবাসীরা চলেছেন। ভূত বলে কিছু নেই। কোথায় থাকেন আপনারের হীরালালের ভূত? আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে পুজো করে দেব।

গ্রামের লোকের কাছে নিমগাছটাই আসল, মাঝারি সাইজের ওটা। ওই গাছটাতেই থাকেন হীরালাল। সব কথা ভাল করে শুনে ভারদার বললেন, 'ঠিক আছে, আমি নিজে কেটে দেব নিমগাছটাকে। তাহলেই তো হল?'

পকেট থেকে একটা সুন্দর কীটো বের করে ভিটের মাটি একটুখানি সংগ্রহ করলেন ভারদার। এই মাটি তাঁর ত্রিনিদাদের বাড়িতে ছড়িয়ে দেবেন। পিতৃপুরুষের আত্মার শান্তি হবে। বললেন, 'এই জমির ওপর একটা ইস্কুল তৈরি হবে। কাল এখানে ইয়াগ্না (যজ্ঞ) হবে। সকলে প্রসাদ খাবেন। আমার আত্মীয়রা কে কোথায় আছে খুঁজে বের করুন। কাল আবার আমরা আসব।'

দলটা বেশ বড় হচ্ছে দেখতে দেখতে। দুটো প্রায় বাজতে চলল। আমাদের সবাইকে নিয়ে চললেন একজন বয়স্ক লোক, তাঁর বাড়িতে একটু জল খাব আমরা। কিন্তু হীরালালের ভিটের মাটিসুদ্ধ কীটোটাকে আমাদের রেখে আসতে হল নিমগাছের নিচে। ওটা কেউ বাড়িতে ঢোকাবে না।

কারও বাড়ি থেকে মস্ত বেল হল, কারও বাড়ি থেকে গজা। আমরা জল খেলাম। আলোচনা আরও একটু এগোল। কাল সকাল দশটা থেকে হোম হবে, নিমগাছটায় কুড়লের প্রথম কোপ মারবেন নাইয়ারিন। তারপর সেটা কাটা হলে ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হবে সেই কাটা গাছটার তলায়। উনি হিসেব দিলেন তিনশো টাকা খরচ হবে পুজো করতে। আমি ওঁর হাতে পাঁচশো টাকা দিলাম। বললাম, 'টাকার জন্যে ভাববেন না। সবাইকে প্রসাদ দিতে হবে, কিছু বেশি টাকা রাখুন আপনি। আর যদি খিচুড়ি ভোগ খাওয়ান সবাইকে, তাহলে মনে হয় আরও কিছু বেশি লাগবে।'

একটি ছোট ছেলে ভারদারের কৌটোটা হাতে করে নিয়ে এসে আমাকে দিল। সকলে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এখনও হীরালালের আত্মার শান্তি হয়নি, কৌটোটা ছোঁয়া ঠিক হল না। বললাম, 'ভয় করবেন না, পন্ডিত হীরালাল কিছু মনে করবেন না। উনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর ব্যবস্থা করতে আমরা অত দূর থেকে এসেছি। বালকের কোনও ক্ষতি হোক তিনি চাইবেন না।'

তবু তার মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হল। আর-একবার আমরা গেলাম সেই ভিটেটার কাছে। এবার কয়েকজন সাহস করে ঢিপিটার ওপরে ওঠে এল। একটি বউমানুষ আমাকে বলল,

বছর কুড়ি আগে। তাঁর বিধ্বস্ত বাড়িটাতে ভূত আছে।

ইমোশনাল হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। আমার স্ত্রী মেয়েটির সঙ্গে কিছু কথা বলছিল। মেয়েটি জানাল, হীরালাল মারা গিয়ে ভূত হয়েছে, সারা গ্রামের লোক তাঁর কথা শুনতে চায় না। বাড়িটাও দেখিয়ে দিল হাত তুলে, খানিকটা দূরে রয়েছে শূন্য ভিটেটা। তার পাশে একটা মাঝারি উচ্চতার নিমগাছ। ওই গাছেই নাকি তিনি থাকেন। মেয়েটা জেনে গেল, বহু দূরের দেশ থেকে এঁরা এসেছেন খবর নিতে, আত্মীয় হন। মেয়েটাকে আমি বললাম, 'আপ গাঁও মে খবর কর দিজিয়ে, লোগোঁকো বুলাইয়ে। হম বাত করেঙ্গে।'

আমরা অনেকগুলো ভয়ার্ত মহিলার চোখের সামনে দিয়ে সেই শূন্য ভিটেতে গিয়ে উঠলাম। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেখতে দেখতে কিছু ছেলেছোকরা এসে গেল। প্রথমে তারাও আমাদের কাছে আসছিল না। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাড়ি ছিল এটা। ভিটেটার চৌহদ্দি

চার

সুলতানগঞ্জের হোটেলে রাতটা ভালই কাটল। ভোরবেলায় আমরা একেবারে চান-টান করে তৈরি। আজ মার্থাকে একেশি সালোয়ার-কামিজ পরিয়ে দিয়েছে মিনু। আমি কাল পাঞ্জাবা-পাজামি পরেছি। নাইয়োনকে পরেছে একটা ধুতি, আর শার্ট। ধুতিটাকে টাইট করে কোমরে বাঁধতে হয়েছে একটা টাই দিয়ে। জিপগুলাকে বলাই ছিল। সে প্রস্তুত হয়েই ছিল ওপারে। নশার আগেই পৌঁছে

গেলাম লিচ্ছুয়া। হইচই পড়ে গেছে গ্রামে। রাস্তায় লাল-নীল কাগজের শিকলি ঝুলছে। হীরালালের বিশাল ভিটের পুরোটা ঘেরা হয়েছে বাঁশ পুঁতে শিকলি টাঙিয়ে। একটা উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। টিউবওয়েলের সামনে একটা শামিয়ানা টাঙিয়ে মাটি কেটে চড় উনুন জ্বালানো হয়েছে। সেখানে বড় ডেকচিয়ে খিচুড়ি রান্না করা হবে। ফুলকপি, আলু কাটছে কয়েকজন মহিলা চাটাই পেতে।

নাইরোয়েনের চোখে জল এসে গেল। বলল্যম, 'মাই ডিয়ার মিস্টার ডারবার, ডোন্ট ফরগেট ইয়োর গোত্র, ইট্স ভরদ্বাজ গোত্র।'

দু'বার 'ভারদ্বাজ ভারদ্বাজ' আউড়ে নিল তিনিই তো ভূতেদের দেবতা। ফুল-বেলপাতা দেওয়া হল। তারপর সীমর আর ওপুজোটুজো হল। এবার হোম হবে। কপালে সিঁদুর লাগিয়ে নাইরায়োনকে সত্যি এদেশের লোক লাগছে। তারস্বরে মন্ত্র পড়ছে পুরোহিত আর স্বাহা শব্দে আগুনে ঘি দিচ্ছে নাইরায়োন। সেই যজ্ঞের ভস্ম আর কিছু ফুল-বেলপাতা রাখা হল নিমগাছের নিচে। একটা কুড়ুলকে ধুয়ে সিঁদুর লাগিয়ে আনা হল, সেটা দিয়ে প্রথম কোপ লাগালেন নাইরায়োন। কিছু শুকনো নিমফল ঝরে পড়ল মাটিতে। হইহই করে উঠল গ্রামের সবলে। হয়েছে হয়েছে, হীরালালের শান্তি হয়েছে। তাঁর নিজের জাতি ভরদ্বাজ গোত্রের নাইরায়োন সাহেব চারজন মেম্বার। যারা মাস্টার হবে তাদের কমিটিতে রাখা হল না। দেখতে দেখতে শালপাতা পেতে বসে গেল ছেলেমেয়েরা শামিয়ানার পিছন দিকে। গরম গরম খিচুড়ি এসে গেল। খিচুড়ি খেতে শুরু করল বাচ্চারা। তারা হইহই করছিল আনন্দে।

একে একে বউ-ঝি'রা সবলে খেয়ে নিল। তারপর পুরুষদের সঙ্গে আমরাও বসে গেলাম। সতি সুন্দর হয়েছে খিচুড়িটা। বুদ্ধ মানুষটির হাতে আমি আরও পাঁচশো টাকা দিলাম। বললাম, 'বাবুজি, দরকার মতো যেন খরচ করবেন। গ্রামে কেউ যেন অভুক্ত না থাকে কোনওদিন। আর আজ থেকেই কাজ শুরু করে দাও। পথচারীকে খবর

১৯ মার্থা লোকটার কলারবোনে একটা ঘুসি মেরে ভেঙে

ভারদ্বার। আমার নিজের গোত্রটাই বলে দিলাম। ভিটের ওপর পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা লোহার যজ্ঞপাত্রও এসেছে। কাঠ, ঘি, ফুল ইত্যাদি এসেছে। আমি ভেবে দেখলাম এদের একটা কমিটি করে দেওয়া দরকার। কার কাছে টাকা আসবে, কে সেটা খরচ করবে, ইস্কুল বাড়িটা কত বড় হবে, সেইসব নিয়ে একটা মিটি হওয়া ভাল। কালকের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ডাকলাম।

কমিটি ওরা তৈরি করেছিল। গ্রামের একজনেরই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। সেটা নোট করে নিলাম। ডলারের চেক আসবে আমার কাছে কলকাতায়। আমি সেটাকে ভাঙানোর পরিবর্তে করে এদের পাঠাব। ইস্কুল বাড়িটা দুটো ঘরের হবে, ইটের থাম দেওয়া সিমেন্টের বারান্দা। কথাটা আমার পছন্দ হল না। বললাম, বড় করো— চারটে ক্লাসরুম, একটা রান্নাঘর, একটা মাস্টারদের ঘর, একটা স্টোররুম। বাচ্চাদের জন্যে কাঠের বেঞ্চ, মাস্টারদের জন্যে কাঠের চেয়ার-টেবিল। ইস্কুলটার চারদিক ঘেরা থাকবে বারান্দা দিয়ে। সামনে একটা খেলার মাঠ আর নিমগাছটার জায়গায় ঝাণ্ডা তোলার বেদি। এখানে নেতাজি জয়োৎসব, রবীন্দ্রনাথের জয়োৎসব, স্বাধীনতা দিবস— সব পালন করা হবে। যারা খুব গরিব তাদের পড়ার খরচ দেবে ইস্কুল। এমনিতে বাচ্চাদের মাইনে হবে এক টাকা মাত্র। বলো, তোমরা রাজি? এক সুরে সবাই বলল, 'রাজি।'

আসনে বসে আছেন নাইরায়োন, বারবার চোখ মুছতে হচ্ছে। শার্টটা খুলে রেখেছেন, গা খালি। সামনে ঘট বসেছে, তার ওপর আমপাতা। আসলে পণ্ডিত হীরালালের ভূত ছাড়ানোর উৎসাহটাই লোকের মনে বেশি করে লেগেছে। তাতেই সকলের উৎসাহ। সে যাই হোক, পুজো চলতে লাগল, বাকি তিনজন অতিথি আমরা বসেছি একটা শতরঞ্চির ওপর। দুর দিয়ে মান করানো হল কালো রংয়ের একটা শিবলিঙ্গকে। কত দূর থেকে এসে ঝাঙটা উদ্ধার করে দিলেন। হীরালাল জানান দিয়েছে নিমফল মাটিতে ফেলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিমগাছ কাটা শেষ। সেটা একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গোড়াটা কেটেকুটে একটুখানি গর্ত করে দিল ছেলেরা। সেখানে একখানা ইট পাতা হল, তার ওপর একটু কাদা লাগিয়ে আর-একখানা ইট রাখলেন নাইরায়োন। ইস্কুলের নাম কী রাখা হবে? সবাই নাইরায়োনের দিকে তাকিয়ে। নাম আমার ঠিক করা ছিল আমি বললাম, 'নাম রাখা হোক পণ্ডিত হীরালাল প্রাথমিক বিদ্যালয়। একটা শ্বেতপাথরের ওপর নামটা লিখিয়ে আনবে ওরা ভাগলপুর থেকে। সেটা যখন লাগানো হবে, তখন একবার আসতে হবে নাইরায়োন সাহেবকে।'

পুরোহিত নাইরায়োন সাহেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়ে ছাড়লেন। বললেন, 'পিতৃপুরুষের ভিটে দেখতে এসেছ, ভাল করে প্রণাম করো। এঁদের আত্মার শান্তি হবে। তোমার মতো ছেলে এসেছে বংশে, এঁদের কত বড় ভাগ্য!'

মার্থাকে আর নাইরায়োনকে মিনু ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিল কে কী বলছে, কী হচ্ছে এখানে। গরিব ছাত্রছাত্রীরা বিনাপয়সায় পড়ার সুযোগ পাবে, এই কথাটা ওঁদের দু'জনের খুব ভাল লেগেছে।

ইস্কুল চালানোর জন্য মাস্টারমশাইদের মাইনে থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ হিসেব করে নাইরায়োনকে বললাম, 'ইস্কুলের জন্যে আড়াই হাজার, আর মাসে মাসে দেড় হাজার ডলার লাগবে।'

উনি একবাথায় রাজি।

মার্থা বলল, 'তুমি জানো মুখার্জি, আমি নিজে ডাক্তার, আমি একাই দিতে পারি টাকাটা। তুমি আমাদের জন্য যা করে দিলে তার পক্ষে এটা সামান্য টাকা। ডোন্ট ইভ ওরি।'

ওঁরা আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিল কমিটির। দাও। টাকার দরকার হলে আমাকে জানাবে, আমি টাকা পাঠাব। মাস্টারদের বলো, তারা কাল থেকেই ইস্কুলের কাজ শুরু করে দিক। শতরঞ্চি পেতে কাল থেকেই ইস্কুল শুরু হয়ে যাক। সামনের মাসের মাইনে আমি মানিঅর্ডার করে পাঠাব।'

তিনটি মাস্টার পাওয়া গেল। সকলেই দশ ক্লাস পাশ। একজন মহিলা মাস্টার দরকার। পুনম চার ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, ওকেই মাস্টারনি করে দিলাম সবচেয়ে নিচু ক্লাসের জন্যে। তবে অন্য গ্রাম থেকে ওকে আসতে হবে। সেটা ওরা বুঝুক। লিচ্ছুয়াতে আর কোনও মহিলা নেই, যে চার ক্লাস পাশ করেছে।

পাঁচ

মনের আনন্দে আমরা ফিরলাম সুলতানগঞ্জের হোটেলে। একতলার একশো টন নম্বর ঘরটার দরজা খোলা রয়েছে। ওটাই নাইরায়োন আর মার্থার ঘর। পরেরটা আমাদের দু'জনের। ঘরের তেতর মার্থার খাটে বসে আছে একজন, তার চোখে চশমা, পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, মুখে সিগারেট আর টেবিলের ধারে দুটো চেয়ারে বসে আছে আরও দু'জন ছেলে। ঘরের দরজা থেকে ওদের দেখেই মার্থা চিৎকার করে উঠল, 'হু আর ইউ পিপল? হোয়াই আর ইউ ইন মাই রুম?'

মুখিয়ে ছিল হোটেলের ম্যানেজার, বলে উঠল, 'এমএলএ ম্যাডাম, এমএলএ।'

'সো হোয়াত? হোয়াই হ্যাভ দে ত্রেসপাসড?'

ডোন্ট হোয়াত্ভাব দেখিয়ে এমএলএ সাহেব হাত মুঠো করে সিগারেটে কষে দম লাগালেন। ঘরের মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া ঘুরছিল। সহ্য হল না মার্থার। এগিয়ে এসে লোকটার পাঞ্জাবি কষে ধরে টেনে তুলল। কুচকুচে কালো বিশাল শরীর

মার্থার, বাঁ হাতের হ্যাচকা টানে লোকটা ছিটকে উঠে এল খাট থেকে। সঙ্গে সঙ্গে একখানা চড় পড়ল তার মুখে। চশমা ছিটকে গেল, মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ল গিয়ে বিছানায়। চাদর থেকে ধোঁয়া বের হতে লাগল। বাকি দুটো ছেলে সুড়সুড় করে পালানোর তালে ছিল, মার্থা বলল, 'স্তব দোঞ্জ বাস্তার্ডস!'

তাদের আক্কেলানোর জন্যে নাইরায়োন আছে, আমি আছি বরজাত মানের দায়িত্বে। কিন্তু মার্থা বোধহয় কাজটা ভাল করলেন না। এটা বিহার, আর এখানে রাজনীতি করে কেবল অসভ্য ধরনের লোক। তৎক্ষণে আমি জিজ্ঞেস করে নিয়েছি ম্যানেজারকে, 'কী চান এমএলএ এঁদের কোরো না, যদি মার খেতে না চাও।'

পোড়া চাদরটাকে খাবার জল রাখা জগের জলের সাহায্যে নিভিয়ে দেওয়া গেল। মার্থা তাঁর ব্যাগ থেকে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বের করে এমএলএ সাহেবকে দুটো হাতসমেত বধিরনে বুকের ওপর দিয়ে। পোড়া চাদরের, ঘরের ভেতর এমএলএ সাহেবের ব্যান্ডেজ বাঁধা মূর্তির এবং বাকি সকলের ছবি তুলে রাখলেন মার্থা নিজের সেলফোনে। বললেন, 'তেক হিম টু হসপিত্যাল। ফোত মাম্থস তু রিকভার।'

লিচ্ছুয়া গ্রাম থেকে নিমগাছের একটি ডালকে কেটে আনা হয়েছে স্মৃতি হিসেবে নিয়ে যাবেন এঁরা। মার্থা সেটাকে নিজের হাতব্যাগে করে মিনিস্টার এবং তাঁর স্ত্রী। দেশের বাড়ি দেখতে আর অজৈবিনাথের পুজো দিতে এসেছিলেন। ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি রয়েছে এঁদের। সেই জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে এঁদের সঙ্গে। ব্যাপারটা খুব ভাল হয়ে উঠবে যদি এঁরা বিশেষমন্ত্রীকে সব জানিয়ে দেন।'

'উত্ত এমএলএ বীরেন্দরসাব কিধর গয়া?'

'হাসপাতাল।'

'কিউ?'

'এমএলএ মন্ত্রীকো মারনে আয়া থা। উলটা হো গয়া,' বেখিয়ে লিলাম শিশালদেহী মার্থাকে।

সাব-ইন্সপেক্টর পকেট থেকে সাদা কাগজ বের করে অনেক কিছু লিখলেন। আমাকে বললেন,

দিলেন সেটা। লোকটা ব্যথায় চিৎকার করে উঠল।

কাছে।'

'পার্টি ফান্ডমে চান্দা চাহিয়ে এক লাখ। নেহি তো ইস্কুল নাম্বানে নেহি দেগা।'

বাপের জমিদারি পেয়েছে এরা। ভারদারের ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি রয়েছে। যা পারে করুক। এদের ঘরে চড়াও হয়ে এসেছে, বিছানায় আগুন লাগিয়েছে। খুব মুখরোচক খবর হবে কালকের খবরের কাগজে। মার্থা পৌঁছিয়ে ধরেছেন ওর হাত পিছনের দিকে। হাত দুটোকে পিছনে তুলে কলারবোনের ওপর ডান হাত দিয়ে একটা ঘুসি মেরে ভেঙে দিলেন সেটা। লোকটা ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। আর-একটি ঘুসিতে অন্য দিকের কলারবোনটাও ভেঙে দিলেন। লোকটাকে ছেড়ে দিলে সেটা গেল হাত দুটো ঝুলে পড়েছে দু'পাশে। মার্থা বলেছেন তিনি ডাক্তার। কেমন করে কলারবোন সহজে ভাঙা যায় তা তিনি জানেন।

'কল দা পুলিশ, উইল ইউ?' ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়ে মার্থা আমাকে বললেন, 'হোয়াত দে ওয়ান্ত মুখারিয়া?'

'ওয়ান লাখ রুপিজ।'

'হাও মাচ ইজ দ্যাত?'

'আবাউট থাউজ্যান্ড ডলার। ইউলডন দ্যাট হি উইল নট অ্যালাউ দ্য স্কুল টু ফাংশন।'

'হোয়াত!'

অকেজো দুটো হাতের মালিকের গালে আর একটি বিশাল মাপের থাপ্পড় পড়ল এবং তার ফলে তার কষ থেকে গড়িয়ে নামল রক্ত। আমি এগিয়ে এসে মার্থাকে থামালাম। এমএলএকে বললাম, 'ইনি ত্রিনিদাদ টোবাগোর ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার। এঁদের ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি আছে। এঁদের কেউ কিছু করতে পারবে না। তুমি খুব খারাপ জায়গায় এসেছ। তোমার কীর্তিকাহিনি কাল খবরের কাগজে প্রথম পাতায় বের হয়ে যাবে।' ছেলে দুটোকে বললাম, 'পালাবার চেষ্টা এনেছেন আমি দেখেছি। এখন সেটা বের হল। মার্থা সেটাকে নাচিয়ে লোকটার হাঁটুতে মারলেন মালাইচাকির ওপর। ফট করে আওয়াজ হল একটা। ককিয়ে উঠল এমএলএ।

'দিস উইল বি পার্মানান্ত। ইউ শ্যাল নত ওয়াক এগেন ফ্রিলি। দা স্কুল উইল ফাংশন, বাট ইউ উইল নত।'

ব্যাপার-স্যাপার দেখে পুলিশ ডাকতে নিচে নেমে গেছে ম্যানেজার। ছেলে দুটোর একটাকে আমি দেখেছি লিচ্ছুয়াতে। একে অ্যারেস্ট করাতেই হবে। আসুক পুলিশ, ততক্ষণে এমএলএকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। অতি কষ্টে তাকে নামিয়ে আনা হল এবং একটা রিকশায় বসিয়ে পাঠানো হল হাসপাতাল। বলে দিলাম, যদি তুমি অন্য কোনও মতলব করে থাকো, তাহলে এঁদের কাছে রিভলভার আছে, গুলি করতে একটুও কই হবে না। আর বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। থিতিয়ে যাবে ঘটনাটা। তবে তোমার শাগরেদরা ছাড়া পাবে না।

ছেলেদুটোকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল ম্যানেজারের কাছে রিসেপশনে। পুলিশ আসতে বেশি দেরি করেনি। দু'জন লাঠিধারী পুলিশের সঙ্গে যিনি এলেন তাঁকে আমি পরিচয় দিলাম, হোম মিনিস্ট্রিতে জয়েন্ট সেক্রেটারি বলে। এই ছেলেদু'টি দরজা খুলে মিসেস মার্থার ঘরে ঢুকে চুরি করেছে, তাঁর বিছানায় বসে সিগারেট খেতে গিয়ে আগুন লাগিয়েছে। আগে এদের ব্যবস্থা করুন তারপর অন্য কথা। ছেলে দুটোর কোমরে দড়ি বাঁধা হল। সরবলসে সকলে দোতলায় উঠলাম। পোড়া বিছানা, মেঝেতে জল ছেড়ে সাব-ইন্সপেক্টরের চোখ কপালে।

আমি তাঁকে বললাম, 'কাল সমস্ত হিন্দি আর ইংরেজি কাগজে এমএলএ সাহেবের কীর্তি প্রকাশ হয়ে যাবে ছবিসমেত। আপনাকে একটু সাবধানে কেস দিতে হবে। এঁরা ত্রিনিদাদের ডেপুটি প্রাইম

'আপ কুছ হেল্প কিজিয়েগা। বিল্লিকা রিপোর্টমে জিয়াদা কুছ মাত লিখনা সাব।'

এক ঘণ্টার ভেতর সব কাজ মিটিয়ে আমি মোটামুটি সবাই যাতে শুনতে পায় তেমনই করে বললাম, 'দিল্লি পৌঁছনে দো, ফির দেখতা হুঁ।'

কারণ, এরা না পারে এমন কাজ নেই। হয়তো ট্রেনের মধ্যে আক্রমণ করে বসবে। সুতরাং বিল্লি যাওয়ার ট্রেনে খুঁজে আমাদের। হোটেল থেকে চেক আউট করে আমরা স্টেশন চলে গেলাম না। তার বদলে গঙ্গার ধারে বেঞ্চে বসে রইলাম আমাদের ট্রেন আসার সময় পর্যন্ত। স্টেশনে এসে গাড়িতে উঠে বেঞ্চলাম, একজন পিসারি পর্যন্ত আমাদের সুরক্ষার জন্যে। সে লোকটা ভাগলপুর পর্যন্ত এল আমাদের সঙ্গে। গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, বার দুই নমস্কে করল, তারপর নেমে গেল। তবু আমার কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছিল। মোগলসরাই জংশন পার করলাম বিহারের সীমানা। সেলফোনের ছবির প্রিন্টসমেত কলকাতার সবকটি হিন্দি কাগজকে একটা নিউজ় হ্যান্ড আউট করে দিয়েছিলাম। সেটা তার পরের দিন ভাল করেই কাগজে ছেপেছিল। আর এই শেষ দুটো দিন আমি ওঁদের আমার বাড়িতেই রেখেছিলাম। ভারদার আর মার্থা চোখের জলে বিদায় নিয়েছিলেন এয়ারপোর্ট থেকে। আমারও মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল। সব কিছুই ঠিক ছিল, কিন্তু রাজনীতির যে ছবি ওঁরা নিয়ে গেলেন, তার কথা ভুলতে আমার অনেকদিন লাগবে। আমি আমার নিজের মতো যতটা পারি করেছি, যা আমার হাতের বাইরে, তার জন্যে আমি কী করতে পারি?

মিনু বলল, 'ভেবো না, ওঁরাও তো ভারত থেকেই উদ্ভূত হয়েছেন। সব কিছুই বুঝতে পারবেন।'

অঙ্কন: বৈশালী সরকার

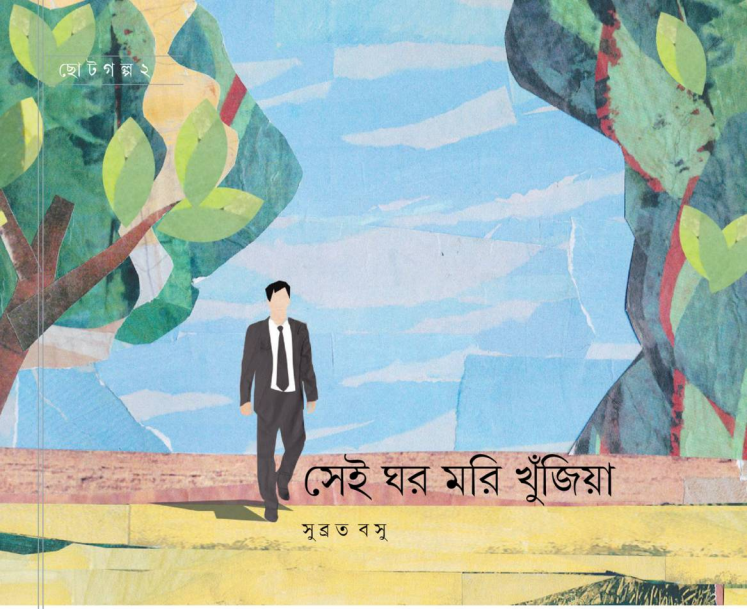

সেই ঘর মরি খুঁজিয়া

সুব্রত বসু

'কী বললেন? একটা আস্ত বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে মাটির তৈরি, একেবারে গ্রাম্য পরিবেশ। সঙ্গে ফল-ফুলের বাগান। মাঝারি মাপের পুকুর, তাতে কাচের মতো জল। উঠোনে ধানের মরাই, অবশ্য ধান ভরা থাকবে না। শুধুমাত্র গ্রাম্য পরিবেশটা বজায় রাখার জন্য এইসব ব্যবস্থা।'

'মাটির বাড়ি!'

'নাক সিঁটকোবেন না। বললাম না পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য এইসব ব্যবস্থা। ভেতরে ঢুকলে বুঝতে পারবেন এসি, মডার্ন ফেসিলিটিস।'

'কিন্তু কেনই বা শোনাচ্ছেন এসব?'

'বাঃ! এটাই তো আমাদের লটারির প্রথম পুরস্কার। ন'শো বাহান্তর জন লাকি ওনারদের মধ্যে আপনি সেই ভাগ্যবান মানুষ, সেজন্যই তো ভূমিকা করছিলাম। অনিন্দিতা দেবী জানেন, কনট্রাক্টের সময় বলেছিলাম একটা হিডন সারপ্রাইজ আছে।'

প্রিয়ব্রতর মনে হল তিনি যেন এফএম রেডিয়োর কোনও আর জে-র ভাষা শুনছেন। কোনও লটারির যে এই ধরনের প্রাইজ হতে পারে ভাবতেও পারেননি। নিজের অপছন্দটা জানিয়ে দিলেন সরাসরি, 'গ্রামের মধ্যে একটা মাটির বাড়ি নিয়ে করবই বা কী?'

'কেন? উইকএন্ডে গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন। ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড, পলিউশন ফ্রি ফ্রেশ এয়ার। ফুসফুস দুটো বোঝাই করে নিয়ে ফিরে আসবেন রোববার রাত্তিরে।'

কথাগুলো সহজ হলেও প্রিয়ব্রতর কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। কিছুটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন, 'দিকচক্রবাল' আবাসনের সদ্য উদ্বোধন হওয়া ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের সামনে অস্থায়ী ছাউনির কাউন্টারে। সামনের লোকগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও জানেন, এঁরাই এই বিশাল আবাসনের প্রোমোটার গোষ্ঠী। মৌখিক আলাপপরিচয় এঁদের সঙ্গে এর আগে কখনও

হয়নি। কারণ, বুকিং থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক যাবতীয় কথাবার্তা, পছন্দ-অপছন্দ, ছোটখাটো সমস্যা সবই সামলিয়েছে স্ত্রী অনিন্দিতা। প্রিয়ব্রত শুধু সাক্ষর জোগান দিয়ে গিয়েছেন সময়মতো। এঁদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে এই অভাবনীয় সংবাদে নিজেকে একটু অপ্রস্তুত মনে হল প্রিয়ব্রতর। সেটা এঁদের চোখে যেন ধরা না পড়ে, সেজন্যই কর্মক্ষেত্রের পদমর্যাদাসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, 'দেখুন, এসব ব্যাপারে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই, কিসের কী লাভারি, কবেই বা খেলা হল! আজ বলছেন আমি ফার্স্ট প্রাইজ় পেয়েছি। কিছু মনে করবেন না, পুরোটাই আমার কাছে কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। আমি আসছি। নমস্কার।'

'প্লিজ় স্যার, প্লিজ়,' সামনে বসে থাকা প্রোমোটার ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোককে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজেদের বক্তব্য শোনানোটা সত্যিই সৌজন্যবিরোধী। সেটা উপলব্ধি করেই পাশে রাখা একটা চেয়ার দু'হাতে তুলে কাউন্টারের ওপাশে প্রিয়ব্রতর সামনে নামিয়ে রেখে মুখে হাসি টেনে বললেন, 'বসুন স্যার। সব বুঝিয়ে বলছি।'

কৌতূহল যে প্রিয়ব্রতর মনে ছিল না তা নয়। এ ছাড়া একটা অজানা উত্তেজনা উঁকি মারছিল মনের মধ্যে। দেশের বাড়ি ছাড়ার পর ফ্ল্যাটের জীবনযাত্রা খুব একটা পছন্দ ছিল না প্রিয়ব্রতর। যদিও বর্তমান ফ্ল্যাটে প্রচুর জায়গা, দু'হাজার স্কোয়্যার ফুটের ওপর, সর্বত্রই সুগ্রথিত পরিচর্যার ছাপ। তবু মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়, পায়ের তলায় পাওয়া যায় না মাটির ছোঁয়া। মাথার ওপর দেখা যায় না নীল আকাশ। পুব-খিদের জানালা দিয়ে আসা রোদ যেন সীমিত সময়ের জন্য নির্ধারিত। চৈত্র মাসের শেষে সন্ধেবেলা ফুরফুরে হাওয়ার সত্যিই যেন আকাল। আশপাশের মাথা উঁচু করা বাড়িগুলো যেন পাহারাদারের মতো খাড়া হয়ে আছে।

অথচ দ্বারিকাপুরে গরমকালের সন্ধেবেলায় রজনীগন্ধার গন্ধে ম-ম করত উঠোনটা। চৌকিতে বসে বাবা মাকে উদ্দেশ করে বলতেন, 'বিমলা, আজ আর আমাকে ঘরে যেতে বোলো না, এখানেই একটা বালিশ এনে দাও, শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই।'

শীতকালে বাড়ির উঠোনে মা মাদুর পেতে পিঠে রোদ লাগিয়ে উল-কাঁটা নিয়ে বসতেন। একে একে যোগ দিত শান্তনুর মা, প্রমীলাবউদি, দীপ্তিকাকিমা, রেবাদি আসত সোয়েটারের প্যাটার্ন তুলতে। আর ছিল শান্তা, নির্ভন দুপুরে ছুটোছুটি করার সঙ্গী। চুরি করা আচারের সদ্গতি হত পুকুরপাড়ে বসে।

তখন নতুন চাকরি, মা মারা যাওয়ার পর দেশের বাড়ি, জমি-জায়গা বিক্রি হয়ে গেলে প্রিয়ব্রত কতবার ভেবেছেন, ধন নয়, মান নয় একটুকু বাসা। ধন, মান সবই হয়েছে, হয়নি শুধু ধরণির এক কোণে একটি ছোট্ট বাড়ি। স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের কতবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখানে বাড়ির প্ল্যান পাশ, বিদ্যুৎ সংযোগ, জল সরবরাহের ব্যবস্থা, এ ছাড়া আছে মিস্ত্রিদের থামখেয়ালিপনা, প্রতিনিয়তই মনে হবে কেউ যেন ঐকান্তে ইত্যাদির কথা তুলে ফ্ল্যাটে বসবাসের সামগ্রিক সুবিধার কথাই জাহির করত

অনিন্দিতা। এসব শুনে, পরে প্রিয়ব্রতর নিজেরই মনে হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালন করে, এই সমস্ত অসুবিধে মিটিয়ে প্রত্যেকটি ব্যাপারের যথাযথ ব্যবস্থা কি তিনি করে উঠতে পারবেন? মনে তো হয় না, তাই একান্ত অনুভূতি গোপন করে ফ্ল্যাটে বসবাসের পক্ষে সায় দিয়েছেন।

চেয়ারে বসে প্রোমোটারদের কাছ থেকে কিছু শোনার পরিবর্তে নিজেই প্রশ্ন করলেন প্রিয়ব্রত, 'এসব করে আপনাদের লাভ কী, তা তো বুঝতে পারছি না।'

'সরসময় কি লাভ-ক্ষতির হিসেব করে চলে স্যার! শুনলেই বুঝতে পারবেন আমাদের এই পরিকল্পনাটার পিছনে দুটো দিন আছে।'

প্রত্যেক ব্যবসাদারই নিজেদের সম্পর্কে লম্বা-চওড়া কথা বলে। লাভ ছাড়া যে এই সব লোক এক পা-ও এগোবে না সেটা জানা সত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে প্রিয়ব্রত প্রশ্ন করলেন, 'সেটা কীরকম?'

'আপনি জানেন নিশ্চয়ই, ফরেনারদের মধ্যে একটা কালচার আছে, সারা সপ্তাহের খাটাখাটুনির পর তারা লং উইকে চলে যায় কোনও এক কাউন্সির নিজস্ব ফার্ম হাউসে। সারা সপ্তাহের গ্লানি কাটিয়ে ফ্রেশ এনার্জি নিয়ে ফের তাদের আসে সামনের সপ্তাহে নতুন উদ্যমে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে। আমরা চাইছি আপনাদের মতো মানুষদের মধ্যে এই রেওয়াজটা গড়ে উঠুক।'

'এটা তো বুঝলাম একটা দিক, আর অন্যটা?'

'সেটা একেবারেই প্রফেশনাল। এটাকে আপনি এক ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কাম ইনভেস্টমেন্ট বলতে পারেন। এই ধরুন উইকএন্ডে আউটিং-এর হবিটা যদি একবার গ্র্যাব করে নেন...'

'তাহলে?'

'তখনই কিন্তু অনেকেই ফরাসে এই ধরনের ফার্ম হাউসের জন্য রিকোয়েস্ট করবেন। সেরকম একটা চিন্তাধারা আমাদের মাথায় আছে, তাছাড়া নেক্সট প্রজেক্টে আমাদের গুডউইল কতখানি বেড়ে যাবে ভাবতে পারছেন!'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন প্রিয়ব্রত। না দিয়ে উপায়ই বা কী। পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, গ্রামখাংলার চাষের জমিগুলোর ওপর এই শকুনগুলোর নজর পড়েছে। প্রিয়ব্রতকে করতে চাইছে অলিখিত বিজ্ঞাপনের মডেল। বলা যায় না, কাগজে পরবর্তী বিজ্ঞাপনের সময় প্রিয়ব্রতর হাসি, মুখের ছবি ছাপাতেই পারে। যাই হোক, ব্যাপারটা আর-একটু পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার বলে মনে হল। যদিও জিজ্ঞেস করতে বাধো-বাধো ঠেকছিল, তবু না বলে পারলেন না, 'আচ্ছা এত বড় সম্পত্তি, সে রুরালেই হোক আর যেখানেই হোক, এমনি এমনি দিয়ে দেবেন, এটা বিশ্বাস করতে একটু অসুবিধেই হচ্ছে। আমার তরফে একেবারেই কি কোনও খরচ নেই?'

'একেবারেই নেই সেটা বলি কী করে স্যার, রেজিস্ট্রেশনের খরচটা তো আপনাকে দিতেই হবে। না হলে মালিকানাটা কী করে বর্তাবে?'

'না, মানে শুনেছি আর কী।'

এর পর আর কথা বাড়ানিন প্রিয়ব্রত। কী জানি কী প্রসঙ্গক্রমে কোনও কথা যদি বেরিয়ে পড়ে। সাউর হতে দেরি হবে না। নমস্কার জানিয়ে সোজা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে পড়েছিলেন।

ফ্ল্যাটে ফিরে ডোরবেল বাজাতে ঈষৎ অনিন্দিতা দরজা খুলেই অপছন্দের স্বরে বললেন, 'সেই টং টং করে বাজার গেলে। নিজের স্টেটাসটা যদি না বোঝো...'

'কে বলল যে, আমি বাজারে গিয়েছিলাম?'

'বলবে কে? বাজারে না গেলে এত দেরি হয় নাকি, এই সামান্য ক'টা জিনিস কিনতে?'

'বললাম তো আমি বাজারে যাইনি,' প্রিয়ব্রত একটু খাঁজের সঙ্গে উত্তর দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

'বললে আবার কখন? বাজারে যদি নাই গেলে এত দেরি হল কেন?'

অনিন্দিতার এই ঘ্যানঘ্যানানি পছন্দ হচ্ছিল না প্রিয়ব্রতর। কথার উত্তর না দিয়ে সরাসরি কিচেন ঘরে ঢুকে এলেন। অদ্ভুত মহিলা। বাজারে গেলে

১৯ বাজারে গেলে যে দু'পয়সার সাশ্রয় হয়, অনিন্দিতা

'ওঃ! সেটাও তো কিছু কম নয়।'

নিঃশব্দে হাসলেন প্রোমোটার ভদ্রলোক। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিময় প্রিয়ব্রতকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন, 'সেটা স্যার আপনার পক্ষে খুব একটা বার্ডেন হবে না। প্রায় দেড় একরের ওপর জায়গা, যত দিন যাবে ভ্যালুয়েশন বাড়বে। সুতরাং আপনার রাজি না হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

'আচ্ছা, জায়গাটা কোথায়?'

'ছারিকাপুর।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন প্রিয়ব্রত। আবার বসে পড়লেন ধপ করে।

'কী বললেন?'

'ছারিকাপুর, কেন? চেনেন নাকি?'

কী বলবেন প্রিয়ব্রত! হ্যাঁ! তাহলেই তো অনেক প্রশ্ন এসে পড়বে। মনের ভাবনা যতটা সম্ভব সামলে স্বাভাবিক স্বরে বলার চেষ্টা করলেন, 'না, মানে শুনেছি আর কী।'

এর পর আর কথা বাড়ানিন প্রিয়ব্রত। কী জানি কী প্রসঙ্গক্রমে কোনও কথা যদি বেরিয়ে পড়ে। সাউর হতে দেরি হবে না। নমস্কার জানিয়ে সোজা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে পড়েছিলেন।

ফ্ল্যাটে ফিরে ডোরবেল বাজাতে ঈষৎ অনিন্দিতা দরজা খুলেই অপছন্দের স্বরে বললেন, 'সেই টং টং করে বাজার গেলে। নিজের স্টেটাসটা যদি না বোঝো...'

'কে বলল যে, আমি বাজারে গিয়েছিলাম?'

'বলবে কে? বাজারে না গেলে এত দেরি হয় নাকি, এই সামান্য ক'টা জিনিস কিনতে?'

'বললাম তো আমি বাজারে যাইনি,' প্রিয়ব্রত একটু খাঁজের সঙ্গে উত্তর দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

'বললে আবার কখন? বাজারে যদি নাই গেলে এত দেরি হল কেন?'

অনিন্দিতার এই ঘ্যানঘ্যানানি পছন্দ হচ্ছিল না প্রিয়ব্রতর। কথার উত্তর না দিয়ে সরাসরি কিচেন ঘরে ঢুকে এলেন। অদ্ভুত মহিলা। বাজারে গেলে যে দু'পয়সার সাশ্রয় হয়, এটা বুঝতে চান না কিছুতেই। তাতে নাকি স্টেটাস নষ্ট হয়। যেহেতু ফ্ল্যারে লোক বেশি দাম দিয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে জিনিস কেনে, সুতরাং প্রিয়ব্রতকেও সেখান থেকেই কিনতে হবে। আজ যে বাজারে না গিয়ে ওঁর পছন্দের জায়গা থেকে জিনিস কেনা হয়েছে, সেটা বিশ্বাস করানো যাবে না দেরি হওয়ার কারণ।

ওদিকে অনিন্দিতা ফাটা রেকর্ড বাজিয়েই চলেছেন।

'যতই চুপ করে থাকো, আমার বুঝতে কিছু বাকি নেই। তোমার আর কী? অসুবিধে তো আমার। কারণ, আমি একটা সোসাইটি মেনটেন করি। গেটের দরোয়ানগুলো যখন বলবে মিসেস সেনকে...'

'আঃ!' প্রিয়ব্রত একরকম ধমকেই থামাতে

বাংলা প্রকাশনায় কেতাবি নাম

চাইলেন অনিন্দিতাকে, 'তোমার পছন্দের জায়গা থেকেই জিসিস কিনে আনা হয়েছে।'

'তাই যদি হবে এত বেরি হল কেন?'

'সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে নাকি?' প্রিয়ব্রতর গলা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতটা উত্তেজিত না হলেও চলত। দ্বারিকাপুরের নামটা শোনার পর থেকেই মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা তাঁকে আনমনা করে রেখেছিল। তারপর ঘরে ঢোকার পর থেকেই অনিন্দিতার অসঙ্গত কথাবার্তা মেজাজ হারানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

পাশের ঘরে অম্বেষা ডেস্কটপে কাজ করছিল। বাবার উত্তেজিত গলার স্বর যে তার কানে যায়নি তা নয়। সে-ও চেয়ার ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মেজাজ হারানো প্রিয়ব্রত গুম মেরে বসে আছেন নিজের ঘরে। অনিন্দিতা হয়তো আবার কিছু বলতেন, মেয়ের ইশারায় চুপ করে গেলেন। অম্বেষাই জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তোমার কী আমি কিন্তু বন্ধুদের ট্রিট দেব। এর জন্য তুমি টেনশন করছ! কেন?'

টেনশনের কারণটা আর প্রকাশ করলেন না মেয়ের কাছে। তবে খবরটা শোনার পর অম্বেষার উচ্ছ্বাসের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না অনিন্দিতার মধ্যে। সেটা প্রকাশ পেল পরবর্তী কথায়, 'দেখো আমার মনে হয় এই প্রস্তাবে তোমার রাজি হওয়া উচিত নয়। কোথায় কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে রেজিস্ট্রেশনের পিছনে একগাদা টাকা খরচ করে একটা মাটির বাড়ি দখল নিয়ে কী লাভ হবে তোমার? কলকাতার কাছেপিঠে হলেও না হয় কথা ছিল। জায়গাটা কোথায় কিছু বলেছে?'

'না, জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'বাঃ, প্রাইজ পাওয়ার আনন্দে এতই মশগুল ছিলে, জায়গাটা কোথায় সেটাই জিজ্ঞেস করলে না!'

কথাটা হজম না করে প্রিয়ব্রত করবেনই বা কী, অনিন্দিতা বলেই চললেন, 'সম্পত্তি তো পেলেই হল না, মেনটেন্যান্সের খরচা নেই? ওদের পরিষ্কার বলে দাও, এই পুরস্কারের ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই। পরিবর্তে ক্যাশ প্রাইজ দিয়ে দিক।'

'মা! কী বলছ কী! ছুটির দিনে একটা নতুন জায়গায় বেড়াতে যেতাম।'

'থাম তো। ভারতবর্ষে যেন আর বেড়াতে যাওয়ার জায়গা নেই। ওসব জায়গায় না আছে কোনও সিসিএরটি, না আছে মেডিক্যাল ফেসিলিটি।'

'ওখানে কি লোকজন থাকে না, মা?'

'যারা থাকে, তারা থাকে। ওভাবে তুমি কখনওই মানুষ হওনি,' মেয়েকে চুপ করিয়ে প্রিয়ব্রতকে বললেন, 'তুমি কি ওদের কথা দিয়ে এসেছ নাকি?'

'না, না, সেরকম কিছু বলিনি।'

'ঠিক আছে, যা বলার আমি বলব।'

দুই

অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলেন প্রিয়ব্রত, সত্তর-বাহাত্তর কিলোমিটার রাস্তা। সব জায়গা তো সমান নয়, ফিরতে ফিরতে সন্ধে পার হয়ে যাবে আশঙ্কা করে নিজে গাড়ি চালানোর ঝুঁকি নেননি। সেই কবে দ্বারিকাপুর ছেড়েছেন। মাঝখানে ছাব্বিশ বছরের ব্যবধান। তখন দ্বারিকাপুর যাওয়া মানে ছিল অভিযান।

বাবা মারা যাওয়ার পর মা একলাই দেশের বাড়ি আগলে পড়ে থেকেছেন। বারবার বলা সত্ত্বেও কলকাতায় আসতে চাইতেন না। প্রিয়ব্রতর কেরিয়ার তখন সবে গড়ে উঠছে। কলকাতায় না থাকলেই নয়। সেই সময় দেশের বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার কথা একবার তুলেছিলেন। মা রাজি হননি, উপরন্তু অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন। কথাগুলো এখনও মনে পড়ে প্রিয়ব্রতর, 'হ্যাঁ রে প্রিয়, এতদিনের ভিটেমাটি বিক্রি করে দিবি, বললি কী করে কথাটা?'

বুঝতে চান না কিছুতেই। তাতে নাকি স্টেটাস নষ্ট হয়।

হয়েছে কী?'

মেয়ের কথায় তো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন না কখনওই, উপরন্তু মুখে ফুটে উঠল অনুশোচনার চিহ্ন। অম্বেষা বাবার কাঁধে হাত রাখল, 'তুমি তো এরকম করো না, বাবা। কেউ কিছু বলেছে?'

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাবে কিন্তু মেজাজ হারানোর আসল কারণটা প্রকাশ পেল না।

অম্বেষার স্বাভাবিক প্রশ্ন, 'তবে?'

এর পর তো আর চুপ করে থাকা যায় না। বাধ্য হয়েই প্রিয়ব্রতকে বলতে হল, 'বোস, বলছি।'

দ্বারিকাপুরের কথাটা উহ্য রেখেই প্রিয়ব্রত বলতে শুরু করলেন সব কথা। শোনা শেষ হতেই অম্বেষা দুই হাতে তালি মেরে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, 'গ্র্যান্ড বাবা। এ তো দারুণ খবর!

কথা বাড়িয়ে মায়ের সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর চেষ্টা করেননি প্রিয়ব্রত। অল্প কিছুদিনের মধ্যে মা মারা যেতে নিছক সেন্টিমেন্টকে গুরুত্ব দিয়ে দেশের সম্পত্তি টিকিয়ে রাখার কোনও যুক্তি খুঁজে পাননি সেই সময়। তাহলে আজ কিসের টানে চলেছেন দ্বারিকাপুরের উদ্দেশে? ফ্ল্যাটবাড়িতে তো ভালই আছেন। যদিও সীমিত পরিসরে হাঁটাচলা। হয়তো নেই মাটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, কিংবা পাশেন না নিজের হাতে দুটো চারাগাছ লাগাতে। তবে সেই অভাব তো মেটে, যখন দেখেন বারান্দায় ঝুলে থাকা টিনেমাটির টবে অযত্নের অর্কিডগুলো জাহির করছে তাঁরই স্টেটাস সিম্বল। গরমের সন্ধ্যায় নিজস্ব ঘরে এসি চালিয়ে ওয়েস্টার্ন মিউজিক শুনতে শুনতে ছইস্কিতে চুমুক দেওয়া কি যথেষ্ট ভাল থাকা নয়! তাহলে হল কী তাঁর?

সানন্দা club

৫০০ টাকায় ১০০০ সুযোগ

সানন্দার ৬ মাসের গ্রাহক হোন মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে এবং এক বছরের জন্য
সানন্দা ক্লাবের মেম্বারশিপ পান বিনামূল্যে। আর সানন্দা ক্লাবের মেম্বার হলেই পাবেন হাজারও সুযোগ।

SANANDA SUBSCRIPTION FORM

No. of issues	Cover price (Rs.)	You pay (Rs.)	You save (Rs.)
13	520	500	20
24	1060	1000	60

Subscriber's Name :

Date of Birth : Gender : ☐ M ☐ F Marital Status : ☐ Married ☐ Single

Residential Address :

Pin code :

Mobile No. : Email ID :

ABP / TT Sub Customer ID if any :

DELIVERY MODE

I want my Copy delivered by vendor at my residence ☐

PAYMENT MODE

Cheque No. : Cheque Date Amount Rs

Bank Name :

Branch Name :

Bank Account No. : IFSC Code

Subscriber's Name

A/c Payee Cheques in favour of "ABP Pvt. Ltd." (CTS cheques only)

TERMS & CONDITIONS : 1. This offer is open ot residents of Calcutta and its suburbs only 2. Only neatly filled legible Reader Acceptance Form complete in all respects will be accepted 3. Subscription at residence will start only after receiving Vendor Information Coupon through your vendor and realization of payment through cheque only. 4. Cheques must be account payee only in the name of ABP Pvt. Ltd. and payable at Calcutta. 5. A valid personal contact number must be stated by the Subscriber, which can be a subscriber's personal mobile no. or the subscriber's residential telephone no., any other contact phone no. will not be entertained 6. Redemption coupon ABP Pvt. Ltd. may make follow up calls / SMS to its valued subscriber for their feedback. Objections if any to such call may be recorded in writing by the subscribers at the time of signing of this form 9. The section paginations design or layout of the magazine availed through the subscription program may change at any point of time without any prior intimationjn at the sole discretion of ABP PVT LTD shall not be responsible for any loss or damage that the subscriber may suffer due to such change 10. ABP Pvt. Ltd. reserves the right to reject a subscription at its discretion. * Conditions apply.

VENDOR INFORMATION COUPON

Subscriber's Name ----------
Mobile No. ----------
Address ----------
Pin Code ----------
Agency Code ----------
Distribution Centre ----------
Vendor Name ----------
Mobile No. ----------
Sub Vendor's Name ----------

Important information for vendor :

1) This vendor information Coupon (VIC) should be presented in distribution centre immediately for timely implementation of the subscription 2) Loss of the coupon will delay the starting of the subscription till the identification of the vendor is endorsed by particular subscriber in writing 3) (C) Please start delivery of subscription copies only from the start date mentioned in the distribution sheet given to you on each implementation date from our distribution centre, in any deviation centre from above will lead to inappprriate payment.

VENDOR INFORMATION COUPON

(Please retain this section for your record)

Subscriber's Name ----------
Mobile No. ----------
Address ----------
Pin Code ----------
Agency Code ----------
Distribution Centre ----------
Vendor Name ----------
Mobile No. ----------
Sub Vendor's Name ----------

On behalf of ABP Pvt. Ltd.

Signature with date

For any queires: Call 033 22600680 or 8584029089 (Mon-Fri: 10am to 6pm) Email: bmagsubs@abp.in
Send your filled up forms to: ABP PVT. LTD. Bengali Magazine Circulation, 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 001

শুধুমাত্র প্রোমোটারের দেওয়া অভাবনীয় প্রস্তাব আর তার সঙ্গে প্রায়বিস্মৃত একটা গ্রামের নামই কি যথেষ্ট এই গোপন যাত্রার যুক্তি হিসেবে? কী পাবেন তিনি সেখানে? নাকি একবার খুঁজে দেখবেন শীতকালে ছেঁড়া কাঁথার তলায় লুকিয়ে থাকা ভাল থাকার ওম। অন্ধকার ঘরের কোণে ভালবাসার সরঞ্জামের তল্লাশ করে কি উঠতে পারবেন? জানেন না প্রিয়রত।

মনের মধ্যে এক অদ্ভুত কৌতূহল নিয়ে শহর থেকে শহরতলি ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছেন। রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে হাওয়াই মিঠাইওলা। কাঁধে ঝোলানো কাপ্তের বাক্সে তীব্র গোলাপি রঙের গোলাকার বস্তু। স্কুলের ছুটি হয়েছে। ছেলেমেয়েরা ভিড় করে ঘিরে রয়েছে এক ফেরিওয়ালাকে। দু'-একজন ভিড় থেকে বেরিয়ে আসছে, শালপাতায় কাঠের চামচ দিয়ে কিছু খেতে খেতে। চলন্ত গাড়ি থেকে প্রিয়রত ঠিকই দেখেছেন— আলুকাবলি। একবার মনে হল গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে কিনিয়ে আনেন ছোটবেলার অন্যতম প্রিয় আছে নাকি এখনও? ঘটনাটা মনে পড়তেই নিজে নিজেই লজ্জা পেলেন প্রিয়রত।

এই আত্তাগাছটার নিচেই একা-কোঙার ঘর কেটে ঘুঁটি চালছিল শাশ্বা। ঘুঁটি কুড়োবার সময় ফকের গলার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছিল একটা বোলতা। বের করতে পারছিল না কিছুতেই। অহেতুক লাফালাফি করছিল। কোনও উপায় না দেখে ফ্রকের পিছনে আটকানো সেফটিপিনটা খুলে এক টানে ফতটা মাথার ওপর তুলে ধরেছিলেন প্রিয়রত। বোলতাটা বেরিয়ে গিয়েছিল সহজেই। কিন্তু সেই সময় তার হাতে ছোঁয়া লেগেছিল শাশ্বার সদ্যপ্রস্ফুটিত বুক। কোমল পেলব স্পর্শ হাতে থেকে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। সেই প্রথম চোখে পড়েছিল শাশ্বার লুকানো সম্ভার।

প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নিরাকরণ। এর চেয়ে বোলতা কামড়ালে এত বিচলিত হত না শাশ্বা, তীব্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রিয়রতর ওপর। কিল, ঘুসি, নখের আঁচড়ে বিব্রত

আখের টুকরোটা দাঁত দিয়ে ছুলতে ছুলতে নির্জন বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললেন প্রিয়রত পশ্চিম দিবের পুকুরপাড়ে। কলমিশাকের ঝাড়ের পরিবর্তে সবুজ কুচো পানায় ভরতি পুকুরের জল। ঘাটের সিঁড়ি অনেকগুলোই ভেঙে গেছে। দেখেই বোঝা যায়, ব্যবহার হয় না পুকুরটা। সিঁড়িরই একটা ধাপে বুলো ঝেড়ে বসলেন বহু বছর পর।

শাশ্বাকে দিনের আলো বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসে। হাঁসগুলো জল থেকে উঠে পাখা ঝাড়তে ঝাড়তে রওনা দিচ্ছে আস্তানার দিকে। অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দূরের ঘরগুলোয় আলো জ্বলে উঠছে। এককালে দেখা কাঁচা বাড়িগুলো আর নেই, সবলেই রূপ পরিবর্তন করে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জাহির করছে। ইলেকট্রিক এসে গেছে প্রায় সর্বত্র। শোনা যাচ্ছে দু'-একটা শাঁখের আওয়াজ। উঠোনের তুলসীমঞ্চে বিকেলে দেখা বউটি হয়তো জ্বালিয়ে দিচ্ছে সন্ধ্যাপ্রদীপ, যেমনটি তাঁর মা দিতেন শাড়ির

১৯ এককালে দেখা কাঁচা বাড়িগুলো আর নেই।

বস্তুটি না, হল না। মুখ ফুটে বলতে পারলেন না কথাটা। দ্রুতগতির গাড়ি অনেকটাই এগিয়ে চলে এসেছে। শরীরটা এলিয়ে দিলেন আরামদায়ক সিটে। সময় বড় নির্মম প্রিয়রত, ফিরিয়ে দেয় না পুরনো কিছু, দিলেও খাকে না অতীতের সুবাস।

চেনা বাসস্ট্যান্ডটা পার হওয়ার পরেই পাকা রাস্তার ধারে গাড়িটা দাঁড় করাতে বললেন। পায়ে হেঁটে খানিকটা কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। শীতের বেলা পড়ে আসছে। বিকেলের রোদ তখন গাছের মাথায়। কী আশ্চর্য! উঠোনে এখনও মাদুর পাতা। মাদুর ছেড়ে ধুলোয় হামা দেওয়ার চেষ্টা করছে একটা বাচ্চা ছেলে। আটপৌরে কাপড় পরা, সম্ভবত ওর মা, কী যেন সেলাই করছে ছই মাদুরে বসে। পায়ের শব্দ পেয়ে অবাক চোখে তাকাল সে প্রিয়রতর দিকে, সুট-প্যান্ট পরা মানুষ দেখতে অভ্যস্ত নয়। তাই সমীহ বোধ করল কিছু জিজ্ঞেস করতে। প্রিয়রতও তার চোখের আড়ালে চলে যেতে চাইলেন। রোদ চলে গেলেও বসানো রয়েছে আচারের বয়াম। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়া নিজের পুরনো বাড়িটা দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন বাগানের দিকে। অনেক গাছই কাটা পড়েছে। বাগানের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মেঠো রাস্তা ইট ফেলে মোরাম দেওয়া হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ওদিকেই ছিল দক্ষিণপাড়া, শাশ্বাদের বাড়ি।

মুখের সামনে একটা বোলতা অনেকক্ষণ ধরে উড়ছে। বারেবারে তাড়াতে চাইলেও আবার সেই মুখের সামনে। আত্তাগাছে বোলতার চাকটা প্রিয়রতকে মাটিতে পেড়ে ফেলে উদাত হয়েছিল তাঁর হাফপ্যান্টের বোতাম খুলে দিতে। নির্দিবাদে মার খেয়ে অপরিসীম লজ্জার ভার থেকে নিজেকে বঁচাতে পেরেছিলেন কোনওক্রমে। শোধ তুলতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল শাশ্বা। শঙ্কিত ছিলেন প্রিয়রত আরও কিছু অনর্থ ঘটার আশঙ্কায়। না, সেরকম কিছু ঘটেনি। বেশ কিছুদিন পরে শাশ্বা আবার ফিরে এসেছিল। তবে, প্রিয়রতর সঙ্গ ছেড়ে সে মায়ের কাছে মাদুরে বসে অন্যান্যদের সঙ্গে গল্প করত। প্রিয়রতর মন হয়েছিল শাশ্বা বড় হয়ে গেছে।

রাস্তা দিয়ে একটা লোক ধামা বিক্রি করে ফিরছিল। অবশিষ্ট রয়ে গেছে কয়েকটা। হঠাৎ কী মনে করে ডাক দিলেন প্রিয়রত, 'ও ভাই!'

লোকটা চলতে চলতে ফিরে তাকাল। সাইকেল পোশাকপরা লোক তাকে ডাকবে! সন্দেহ হল, 'আমায় কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ, আখ কত করে?'

'গোটা নেবেন?'

'হ্যাঁ গোটাই নেব, টুকরো করে দেবে তো। দাম কত পড়বে বলো!'

'পনেরো টাকা দেবেন।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা কুড়ি টাকার নোট বরিয়ে দিলেন।

'পাঁচ টাকা খুচরো নেই যে।'

'ঠিক আছে, তুমি পুরোটাই নাও, একটা টুকরো আমায় দিয়ে বাদবাকিগুলো বড় রাস্তায় আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভারের হাতে দিয়ে দিয়ো।'

আঁচল গলায় জড়িয়ে।

দুটো কথা ছড়ে গেছে প্রিয়রতর। দাঁতে বোধহয় আর সেই জোর নেই। আসল কথা অভ্যেসটাই চলে গেছে। আধখাওয়া আখটা ছুড়ে ফেললেন পুকুরের জলে। দেখা গেল না কোথায় পড়ল। রুমাল বের করে মুখ মুছলেন প্রিয়রত।

অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এসেছে। ঠান্ডা বাড়ছে। শোনা যাচ্ছে একটানা ঝিঁঝিপোকার ডাক। কারও জন্য কি প্রতীক্ষা করার কথা ছিল! না, তা তো নয়। একটা ঘোরের মধ্যে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনের অন্ধকারের দিকে। কোথায় ফেলে আসা ভাল থাকা? হয়তো সর্বত্রই, কিংবা কোথাও নেই, বৃথাই তার সন্ধান এখন।

'স্যার, আপনি এখানে?'

চমক ভাঙল প্রিয়রতর। হড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। পিছন ফিরতেই চোখে পড়ল দাঁড়িয়ে থাকা সন্তোষ ড্রাইভারের হাতে জ্বলতে থাকা টর্চের আলো।

'রাত হয়ে যাচ্ছে স্যার। আমাদের ফিরতে হবে।'

'হ্যাঁ চলো।'

জোনাকি পোকার জ্বলা-নেভা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে প্রিয়রত ফিরে চললেন শহরের আলোকোজ্জ্বল আবাসনের উদ্দেশে।

অঙ্কন: রৌদ্র মিত্র

দূরবিন

শমীক ঘোষ

কাচের শার্সির নিচটা সাদা হয়ে গিয়েছে। বাইরের সব কিছুই সাদা। ঝুরো ঝুরো সাদা বরফ ধীরলয়ে ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে মাটির ওপর। ঢেকে দিচ্ছে মাটিকে। সব রং মুছে দিচ্ছে পৃথিবীর। অনাবিল শুভ্রতায় ঢেকে যাচ্ছে জানালার বাইরেটা।

কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে চোখ আনে শুভম। ফেসবুকের পাতাটাও সাদা। চাট-বক্সে সবুজ আলো জ্বেলে অনেক মানুষ। সবাই বন্ধু। অথচ কথাই হয় না প্রায়। খুলে রাখা চাট-বক্সে সোহিনী লিখে যাচ্ছে অনেক কিছু।

শুভম থামায়, 'জানিস, আজকে বরফ পড়ছে।'

'বরফ!' একটা স্মাইলি আসে সঙ্গে। অবাক হওয়ার। মানুষের মুখের অভিব্যক্তিগুলোও কেমন কার্টুনের মতো হয়ে উঠেছে। একটা স্মাইলি কত কিছুই বলে দেয়!

'হ্যাঁ। আমার বাড়ির সামনেটা একদম সাদা। যেন নুন ছড়িয়ে রেখেছে কেউ।'

'ওখানে টেম্পারেচার কত?'

'মাইনাস আঠারো। তবে ঘরের ভেতরে নয়।'

'শুনে আমার নিজেরই শীত করছে রে। এমনিতেই আজ এইখানে ভাল শীত পড়েছে, বারো-তেরো ডিগ্রি হবে।'

'তোর বারো-তেরো আর আমার মাইনাস আঠারো।'

'সত্যি বলছি, তোর এই কাঁদুনি গাওয়ার স্বভাবটা গেল না। মাইনাস আঠারো-মাইনাস আঠারো করে যাচ্ছিস। তোর ঘরে যেন রুম হিটার নেই! নিশ্চয়ই কম্বল মুড়ি দিয়ে আছিস।'

শুভম মুচকি হাসে। দাঁত বের করা একটা স্মাইলি পাঠায়, 'আমি এখন ভদকা খাচ্ছি। জুরুভকা। বাইসন ঘাসের ভদকা।'

'যে যে-রকম। গোরুরা ঘাসই খায়।'

'তুই এইসব বুঝবি না। এটা এখানকার একটা বিখ্যাত মদ। তোর গবেট বুদ্ধি দিয়ে কী হবে।'

'ভারী তো গিয়েছিস ইউরোপে ৮'-সাত বছর। এখনই সাহেব। শালা, কালো সাহেব।'

অনেকদিন পর আজ ফেসবুকে বসেছে শুভম। সময়ই পাচ্ছিল না। কালকে একটা পেপার প্রেজেন্টেশন ছিল ইউনিভার্সিটিতে। গত কয়েক রাত জেগে জেগেই কেটেছে। পেপারটা অবশ্য ভালই হয়েছে। মিহাদিনা আজকে দুপুরে বলছিল হয়তো ফেলোশিপটা বেড়ে যাবে কয়েক বছর। ভাবতে অবাক লাগে। স্কুলে, কলেজে কোনওদিন ভাবেনি পোল্যান্ডে আসবে। পোল্যান্ড। মারি এবং পিয়ের কুরির দেশ। এইটুকুই জানত। তাছাড়া বাঙালি বিশেষ বলতে বোঝে আমেরিকা। ইউরোপ বলতে চোখে ভাসে প্যারিস। ব্যস। পেশাদার অঙ্কের জীবন তাকে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপে নিয়ে এল পোল্যান্ড। ওয়ারশ শহরে। এরা অবশ্য বলে ভারশাভা।

সোহিনী শুভমের স্কুলজীবনের বন্ধু। কলকাতার এক নামী মিডিয়া হাউসে সাংবাদিকতা করে। স্কুলে পড়ার সময় খুব বন্ধুত্ব ছিল। তারপর যা হয়, কলেজজীবনে এসে ছাড়াছাড়ি। অনেকদিন পর ফেসবুকে দেখা। শুভম তখন ম্যানচেস্টারে। স্বাভাবিক কথা হয়। চ্যাট-বক্সে। একবার ভেবেছিল ফোন করবে। করেনি। কী দরকার? পেশাগত অন্ধকারে জীবনে প্রেম, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক সব হারিয়ে যায় জটিল ইকোসিস্টেমে। পেপার, পেপার, আরও পেপার। পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ছোটা।

'আজ বুঝলি একটা ঘটনা ঘটেছে...'

'কেন রে, কোনও পোলিশ মেয়ে তোকে প্রপোজ করেছে বুঝি!'

'ধুস, থাক তোকে বলব না।'

হা হা হা। আবার স্মাইলি। অনেকগুলো।

'আজকে বুঝলি মিহালিনার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। মিহালিনা হল আমাদের ইউনিভার্সিটির কোঅর্ডিনেটর। তোদের উচ্চারণে হবে মিহালিনা। আমরা ছোট করে বলি মিশা।'

'ঠিক বুঝেছি। নারীঘটিত ব্যাপার।'

'আরে না না। মেয়েটা বিবাহিতা।'

'তাতে প্রেম হয় না নাকি? বিয়ে করলেই প্রেম করা বন্ধ?'

'শোন না। আমরা গিয়েছিলাম কফি খেতে। কাল আমার একটা পেপার প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। সেই নিয়ে কথা বলছিলাম। তারপর দু'জনে হাঁটতে গিয়েছিলাম। আমাকে একটা পুরনো বাজারে নিয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত বাজারটা। শহরের মাঝখানে একটা বিরাট উঠোনের মতো। আলো হয়ে গিয়েছে। চাঁদের আলো, বরফে মোড়া এক টুকরো প্রান্তর। অনেক দূরে ওক, বার্চ, অ্যাশ, অল্পার গাছগুলো বরফ মেখে সাদা এক টুকরো টিলার মতো দেখাচ্ছে। শুধু কয়েকটা বলগা হরিণ আর একটা ব্লেজ পেলেই হত। ছোটবেলার স্বপ্নের ক্রিসমাস। ফোনটা নিয়ে ছবি তুলল শুভম। সস্তার ফোনে রাতের ছবি কেমন অস্পষ্ট।

দোকানটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল শুভম। এসবও বিক্রি হয়? মনে হচ্ছিল যেন ক্যাপসুলের ভেতর আটকে থাকা একটা সময়ে পৌঁছে গেছে সে। এখনই যেন দু'জন নাৎসি সৈন্য এসে দাঁড়াবে তার দু'ধারে। হাত তুলে বলবে হাইল হিটলার।

মিহালিনাকে বলেছিল, 'ইটস সো ইরি।'

মিশা হেসেছিল। একটা গোটা দোকান জুড়ে বিক্রি হচ্ছে কয়েকটা পুরনো যুদ্ধের হেলমেট। জার্মান ভাষায় লেখা কিছু ফিল্ড ম্যাপা। রাশিয়ান সৈন্যদের ব্যবহার করা দস্তানা। পুরনো রাশিয়ান অর্থোডক্স মার্চের বাইবেল। কয়েকটা টার্কিশ তরোয়াল। চ্যাপটা ইম্পাতের তৈরি একটা প্লেট। তার ওপর রোমান হরফে লেখা নুয়ের ফুয়ের ডয়েশ।

'জার্মান, না?'

'জার্মান। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডওয়ারের জিনিস সব। সেই সময় ভারশাভা শহরের ট্রামগুলোর একটা কি শুধু জার্মানদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। লেখা থাকত নুয়ের ফুয়ের ডয়েশ। ওনলি ফর জার্মানস।'

'কী আশ্চর্য! আমাদের দেশেও রেলের ফার্স্ট ক্লাস কামরা রিজার্ভড থাকত শুধু ব্রিটিশদের জন্য। এই সব জিনিসই কি ঐতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকক্ষর?'

'হ্যাঁ।'

সে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়। একবার মনে হয় তাকে নিয়েই কথা বলছে এই দু'জন। তারপর ভাবে বলুক গে যাক। না বুঝলে গালাগাল দিলেও সমস্যা নেই। হেলমেটগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে শুভম।

'এইগুলো জার্মান। নাৎসিরা ব্যবহার করত।'

'নাৎসিরা? দেখে তো বোঝা যায় না।'

'স্বস্তিকা আঁকা থাকত বোধহয় হেলমেটগুলোয়। স্বস্তিকার ব্যবহার এই দেশে, শুধু এই দেশে কেন, ইউরোপের অনেক জায়গায় নিষিদ্ধ।'

'আর কিছু নেই সেই সময়ের?'

মিশা অনুবাদ করে দেয় বৃদ্ধার জন্য। বৃদ্ধা কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ রাখেন শুভমের চোখে। মিষ্টি হাসেন। একটা বাক্স ঘাঁটতে থাকেন কয়েক মুহূর্ত। বাক্সের মধ্যে থেকে বের করে আনেন ছোট্ট একটা বাইনোকুলার। বাইনোকুলারটার গায়ে সাদা রং দিয়ে আঁকাবাঁকা হরফে কিছু একটা লেখা। শুভম পড়ার চেষ্টা করতে থাকে। মিশা মুখ বাড়ায়। পোলিশ ভাষায় লেখা।

শুভম পড়ে, 'পাওয়েল অ্যাডামিয়েক?'

'পাভেল অ্যাডামিয়েক।'

শুভম দুরবিনটা হাতে নেয়। দুটো নলের মাঝখানে একটা ছোট্ট চাকতি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোকাস করতে হয়। মাঝখানের হাতলের ওপর খুদে অক্ষরে খোদাই করা কোম্পানির নাম। নামটা দেখে মনে হয় ব্রিটিশ। চোখে লাগায়। ফোকাস করে দুরবিনটা। অনেক ওপরে একটা কালো পাখি উড়ে যাচ্ছে।

'এটা দেখে তো যুদ্ধের বলে মনে হচ্ছে না।'

'হয়তো, তবে ওই সময়েরই হবে। জিউইশ

১৯ ভদ্রলোক পালটা বলেন, 'হাইল হিটলার,' তারপর

তার মধ্যে সারি সারি দোকান। এই জায়গাটাকে পোলিশরা বলে ফ্লি মার্কেট। অনেকটা কলকাতার সবজি বাজারের মতো। একটা দোকানে দেখলাম অদ্ভুত সব জিনিস বিক্রি হচ্ছে।'

'কী?' দেখা যাচ্ছে সোহিনী টাইপ করে যাচ্ছে। কিন্তু লেখা আসছে না!

'আছিস?'

কোনও উত্তর নেই। শুভম একটু বিরক্ত হল। নিশ্চয়ই ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। এমন তো কত সময়েই হয় ফেসবুকে। কিন্তু জিনিসটা মজার। ডিসকানেক্টেড। আবার সবাই নিজের মতো। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। ফেসবুকের পেজটা বন্ধ করে দিল শুভম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় সে। ইনস্টিটিউটের মাঠটা বরফে ঢেকে গিয়েছে। দূরের গাছগুলোও সাদা। উজ্জ্বল চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে। বাইরেটা যেন আলো

'ষ্টেঞ্জ! ভেরি ষ্টেঞ্জ!'

শুভম ঘেঁটে দেখছিল জিনিসগুলো।

বইগুলোর ভাষা তার অজানা। কিন্তু যুদ্ধে ব্যবহৃত জিনিসগুলো যেন জীবন্ত। এই সামান্য কয়েক বছর আগের ঘটনা। শুভম যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সেই সময়ের ভারশাভা শহরটাকে। রাস্তা দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ। শহরের এদিকে-ওদিকে উঁচি পরা জার্মান সৈন্য। কারও কারও কাঁধের কাছে লেখা এস-এস। শহরের মধ্যে দিয়ে গড়াতে গড়াতে ছুটে যাচ্ছে একটা ট্রাম। কয়েকজন আড়ালে থেকে তাকায় সেদিকে। ওঠে না।

দোকানদার এক বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা। ঘন নীল, পোলকা ডট দেওয়া ফ্রক পরা। শুভমের অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে হাসেন। পোলিশ ভাষায় কিছু একটা বলেন মিশাকে। মিশা হেসে ওঠে। দু'জনের কথোপকথনের এক বিন্দুও বুঝতে পারে না শুভম।

কোনও হলোকাস্ট ভিকটিমেরও হতে পারে।'

দুরবিনটা নেয় শুভম। কয়েকটা জার্মান ফিল্ড ম্যাপ নেয়। ইতিহাস তার তেমন গভীরের বিষয় ছিল না স্কুললাইফে। তবু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডওয়ারের জিনিস। একটা অদ্ভুত ঘোর লেগে থাকে। পোলিশ টাকা মানে জার্ক-তে সামান্যই দাম।

ফ্লি-মার্কেট থেকে মিহালিনা শুকে নিয়ে গিয়েছিল পুরনো শহরে। অনেক বয়স বাড়িগুলোর। শরীরের রং ম্যাচমেটে। কিন্তু কোথাও ইট বের করা নয়। বরং এই পরিষ্কার শহরটার মতোই ছিমছাম সুন্দর। আবার আধুনিক স্থাপত্যের বাড়িও আছে। একটা শীর্ণ পাঁচিল দাঁড়িয়ে আছে শহরের এক প্রান্তে। প্রায় গা ঘেঁষে একটা নতুন বাড়ি। জিউইশ মিউজিয়াম এইখানেই কোথাও ছিল। মিশা বলে, 'এই পাঁচিলটা ঘেটোর।'

'ঘেটো?'

'হ্যাঁ। জিউদের এই ঘেটোর বাইরে যাওয়া বারণ ছিল। এর মধ্যেই থাকত ওরা। প্রায় কোনও সুযোগ-সুবিধা ছিল না। রেশন পেত খুব অল্প। তাতে খিদে মিটত না।'

'এইখান থেকেই আউসভিংস নিয়ে যেত?'

'হ্যাঁ। আউসভিংস ছিল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। আর টেবলিনকা ছিল এক্সটারমিনেশন ক্যাম্প। টেবলিনকায় গ্যাস চেম্বার ছিল। ওইখানেই মানুষগুলোকে মারত ওরা।'

'কী ভীভৎস!'

'ভীভৎস। ঠাকুরমার এক বন্ধু ছিল, জিউ। যার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

শুভম মুখ করে থাকে। অনেক সিনেমায় দেখেছে সে হলোকাস্টের ভিকটিমদের। স্পিলবার্গের 'শিন্ডলারস লিস্ট' দেখেছে। রোমান পোলানস্কির 'পিয়ানিস্ট' মানুষ, মানুষকে মারে কী সহজে। পিঁপড়ে মারার মতো। একবার এক সেমিনারে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বৃদ্ধ এক ম্যাথম্যাটিশিয়ানের। তিনি অল্প বয়সে আর্মিতে ছিলেন। স্লাইপার। দূর থেকে টেলিস্কোপিক রাইফেল দিয়ে সৈন্যদের মারা তাঁর কাজ ছিল। একটা অপারেশনে বিপক্ষের একজন সৈন্য মারা গিয়েছিলেন তাঁর হাতে। শুভমকে সেই কথা বলতে গিয়ে ভদলোকের মুখ কেঁপে উঠেছিল। 'দেখো, আমার সেকেন্ড আর্মি জয়েন করা মাত্তেউটা। দুরবিনে ভেতর দিয়েই আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম লোকটার বুকে গুলিটা লাগল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ভিজিয়ে দিচ্ছিল ওর ইউনিফর্ম। লোকটা পড়ে গেল। তারপর নিথর। আমি থেকে ছাড়া পেয়ে আমি ভেবেছিলাম, এমন কোনও কাজ নেব যাতে আমায় কারও অর্ডার শুনতে না স্বাধীনতার পক্ষে যিনি ছিলেন, তাঁর সরকার লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে না খাইয়ে মেরেছে। হয়তো তারা স্বাধীনতার দাবি করছিলেন বলেই।'

মিশা আর শুভম হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছিল একটা ছোট্ট গলিতে। কখনওতার গলির মতো সরু নয়। তবে ইউরোপের নিরিখে গলিই। গলিটা ধাক্কা খায় একটা পুরনো অ্যাপার্টমেন্টের বাড়িতে। পূর্ব ইউরোপে এমন বাড়ি দেখা যায়। বাড়িটার গায়ে অনেক সাদা-কালো ছবি লাগানো আছে। ফ্যামিলি অ্যালবামের ছবি যেন। একটা ছবিতে তিন প্রস্থ ঝালরিদার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আর-একটা ছবিতে বাবা-মায়ের হাত ধরে একটা বাচ্চা মেয়ে। মেয়েটার মুখ আশ্চর্য উজ্জ্বল। শুভম বুঝতে পারে এই ছবিগুলো কাদের।

'ভিকটিমস অফ হলোকাস্ট।'

'হ্যাঁ। এই বাড়ির জিউদের ঘেটোর অংশ। মৃত মানুষদের পরিজন, বন্ধুরা ছবি লাগিয়ে রেখেছে।'

শুভমের গায়ে কাঁটা দেয়।

'চলো।'

মিহালিনা তারপর ওকে নিয়ে গিয়েছিল ভিসভা নদীর ধারে এক রেস্তরাঁয়, লাঞ্চে। ইংরেজিতে এই নদীটাকে বলে ভিসটুলা। নদীর জলে বয়ে যাওয়া স্টিমার দেখতে দেখতে অনেক কথা হয়েছিল দু'জনের। ভারতবর্ষের। পোল্যান্ডের। লিনার বর, ছেলের গল্প। শুভমের পড়াশোনার গল্প। তারপর সব কথাই হারিয়ে গিয়েছিল অম্লেট আলোচনায়। কোয়ান্টাম গ্রুপস নিয়ে কাজ করে শুভম। পিয়ের ম্যাথস, পেপার, ফেলোশিপ এইসব কথায় হারিয়ে গিয়েছিল জিউইশ ঘেটো, হলোকাস্ট, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডওয়ার।

তবে কথাগুলো মনের ভেতর ছিল। এত মানুষের মৃত্যু। অকারণ। সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। কলকাতায় তার মানে রাত একটা। এখন আর বাড়িতেও ফোন করা যাবে না। শুভম ইউটিউবে শপিনা সাঁই দিল। ফ্রেডেরিক শপিন। এরা বলে শোপিন। অদ্ভুত সুরের মূর্ছনা। ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিকে তাল নেই ভারতীয় মার্গসংগীতের মতো। শুধু সুর। অথচ তাই দিয়ে প্রকৃতির বর্ণনা, মানুষের মনের বর্ণনা। জানালার বাইরে পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো বরফ, কমলা রং ধরেছে জ্যোৎস্নায়। আর তেতরে শপিন।

টেবিলের ওপর থেকে বাইনোকুলারটা তুলে নিল। মাঝের নদীটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল দূরে টেলিস্কোপের বড়-চুটি হওয়া। তারপর চোখে রেখে দেখল দূরের গাছটাকে। বরফ পড়লে রাতও আলো আলো হয়ে ওঠে। তারপর চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে বরফের সারায়। দূরের ওক গাছগুলো এখন স্পষ্ট। বরফ লেগে আছে ডালে। শুভম অন্যদিকে ঘোরাল দুরবিনটা। দূরে সাদা রাস্তা। একটা-দুটো ষ্ট্রিট লাইটের আলো। কে যেন একটা হেঁটে যাচ্ছে ওভারকোট পরে। রাস্তার ধারে কিছু দূরে দূরে অন্ডার গাছ। শুভম নবীন ঘোরাতে শুরু করল। একবার ঝাপসা হচ্ছে ডালগুলো। আবার পরিষ্কার। এই কাছে, এই দূরে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। স্লাসিকের একরকম দুরবিন নিয়ে খেলত শুভম। হাসি পেল। নেহাতই মজার ছলে শুভম দুরবিনটা উলটে নিল। গাছগুলো ছোট্ট হয়ে গিয়েছে। চাঁদের আলো, বরফ, দূরের রাস্তাটা, সব যেন খুব ছোট্ট। কুয়াশার মতো সাদা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব। সব কিছুই যেন দূরে, অনেক দূরে। শপিনের সুর যেন অনেক দূরে সরে যেতে যেতে হারিয়ে যায় হঠাৎ। নতুন একটা সুর বাজছে পিয়ানোয়। সুরটা খুব চেনা। অনেকবার শুনেছে শুভম। কোথায় যেন।

আলোটা এইবার স্পষ্ট হতে থাকে। হলুদ বাল্বরের আলো। ঘরের দেওয়ালে কাঠের প্যানেল। এক দিকে নাৎসি জার্মানির বড় একটা ফ্ল্যাগ। ঘরের ভেতর চার-পাঁচ জন। একটা বিরাট টেবিলের উলটোদিকে মোটা গদিআঁটা চেয়ারে বসে আছেন টাকমাথা এক ভদলোক। খয়েরি সামরিক ইউনিফর্ম পরা।

শুভম ডান হাত তোলে মাথার উপরে, 'হাইল হিটলার!'

ভদলোক পালটা বলেন, 'হাইল হিটলার!' তারপর একটা চুরুট ধরান। একরাশ ধোঁয়া ছাড়েন ঘরের মধ্যে। তারপর নিখুঁত জার্মান উচ্চারণে চিবিয়ে বলেন কথাগুলো।

'কুকুরের মধ্যে একটা-দুটো ভাল কুকুরও

একটা চুরুট ধরান। একরাশ ধোঁয়া ছাড়েন ঘরের মধ্যে।

হয়। কোনও মানুষের কোনওভাবে ক্ষতি না হয়। অনেক ভেবে আমি অঙ্ক বেছে নিয়েছিলাম। অঙ্ক শুধু নিজের মনে কথা বায়। কারও কোনও অর্ডার শোনা নেই। তোমার আবিষ্কার সরাসরি ব্যবহার হবে না মানুষ মারার কোনও কাজে।'

'অদ্ভুত একটা কথা মনে পড়ল, জানো?'

'কী?'

'তোমাদের এইখানে যখন হলোকাস্ট হচ্ছে, প্রায় সেই একই সময় আমাদের দেশে বহু মানুষ মারা যাচ্ছে অনাহারে। আমার ঠাকুরমা বলত মন্বন্তর। ফেমাইন। সেই সময় অর্ধ উলঙ্গ মানুষ একটু ভাতের ফ্যানের জন্য কলকাতার রাস্তায় চিৎকার করত। রাস্তার ওপরেই মরে পড়ে থাকত তারা। লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু না খেতে পেয়ে মরে গেল। অথচ সেই বছর ফসল ভালই হয়েছিল।'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কী? চার্চিল, পোল্যান্ডের

লোকটা সামনে রাখা একটা কাগজে সই করে। তারপর কাগজটা টেবিলে ঘষটে এগিয়ে দেয় শুভমের দিকে, 'বার্নহার্ড, তুমি পিতৃভূমির বিশ্বস্ত সৈনিক। আশা করি তুমি কাজটা ঠিকভাবেই পারবে।'

টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় শুভম। কাগজটা নেয় হাতে, চোখ বোলায় একবার। য়ানুশ কোরচাককে টেবলিনকায় পাঠানোর অর্ডার। তারিখ লেখা রয়েছে ৬ আগস্ট ১৯৪২।

'শোনো, তোমার আবার সাহিত্যপ্রীতি আছে শুনলাম। লোকটা লেখেটেখে, কিন্তু আমাদের কাছে ওকে টেবলিনকায় পাঠানোই সবচেয়ে বড় কাজ। আলোস ফুয়ার ডয়েশল্যান্ড। সব কিছু জার্মানির জন্য।'

'এস লেবা ডয়েশল্যান্ড। জার্মানি দীর্ঘজীবী হোক।'

'এস লেবা ডয়েশল্যান্ড।'

শুভম একটা সামরিক স্যালুট ঠোকে। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বাঁরে। বাইরের ঘরটায় এক ভদ্রমহিলা টাইপ করছেন। এক দিকে বড় করে জার্মান আর্মির স্লোগান— গট মিট উনস। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে।

ঘরটার বাইরে দীর্ঘ প্যাসেজ। উদিধারী সৈনিক সেলাম ঠোকে শুভমকে। শুভম আস্তে জিজ্ঞেস করে, 'য়ো ইস্ট ডি ফ্রয়েদ্রে?'

লোকটা একটু অবাক হয়। প্যাসেজের শেষ প্রান্তে একটা দরজা দেখিয়ে দেয়। শুভম দরজা ঠেলে ঢোকে। সুরটা যেন আবার শুনতে পায় পারে বার্নহার্ড। বিখ্যাত পোলিশ শিশুসাহিত্যিক, ডাক্তার। যিনি বাচ্চাদের অনাথ আশ্রম চালান। তাঁকেই ট্রেবলিনকায় পাঠাতে হবে বার্নহার্ডকে। একটা অস্বস্তি হয়। লোকটার কথা ভাবলে সম্মান করতে ইচ্ছে হয়।

ছেলেটা হাসতে হাসতে বার্নহার্ডের পিঠ চাপড়ে দেয়। ট্রেনটের দরজার দিকে যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে বার্নহার্ডের দিকে চোখ টেপে। ওপরওয়ালাদের সুনজরেই আছে। হা হা।

দরজাটা বন্ধ করে যায় আওয়াজ করে।

শুভমের মনের মধ্যে কে যেন বলে ওঠে, আমি বার্নহার্ড নই। আমি শুভম। শুভম সিনহা। কিন্তু শরীরটা কথা শুনছে না। সব কিছুই যেন অদৃশ্য কোনও কিছুর অঙ্গুলিহেলনে ঘটছে। বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার অভিনয় করছে যেন শুভম। শুধু সে জানে না, তাকে কী করতে হবে। কেউ যেন আপনাআপনি তার মুখে সংলাপ বসিয়ে দিচ্ছে।

শুভম বাইরে বেরিয়ে আসে। আকাশে এক ফোঁটাও মেঘ নেই। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। তারা বেরিয়ে যাচ্ছে। তার সামনে জনাপঁচেক সৈন্য এসে দাঁড়ায়, স্যালুট ঠোকে। শুভম শুধু বলে, 'দু'শো জন। দুটো ট্রাকে হবে না?'

এক জন বলে, 'হ্যাঁ।' জোরে চিৎকার করে, 'দুটো ট্রাক।'

শুভম আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিড়বিড় করে বলে, 'য়ানুশ কোরচাক, য়ানুশ কোরচাক।'

খোলো।'

ঘেটোর ভেতরের রাস্তাগুলো প্রায় অন্ধকার। এক্কি-দুক্কি জঞ্জাল পড়ে আছে। নোংরা। দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। জানালার শার্সির পিছনেও আলো নেই বেশির ভাগ বাড়িতে। কয়েকটা বাড়ি থেকে কান্নার চাপা আওয়াজ ভেসে আসে। কোনও কোনও বাড়ির সামনে কাশির আওয়াজ। গাড়ির ব্লিসকা নম্বর নয়-এ এসে পৌঁছয়। পরিচিত সুরটা এইবার স্পষ্ট হয়। রবীন্দ্রসংগীতই। ছোটবেলা থেকে শুনছে— ভেঙে মোর ঘরের চাবি, নিয়ে যাবি কে আমারে। পোলিশ অনুবাদে গানটা গাইছে একটা বাচ্চা। সঙ্গে পিয়ানো বাজছে।

এই সুর জিউইশ ঘেটোর মধ্যে! বার্নহার্ড অস্থির হয়ে ওঠে। পকেট থেকে একটা একস্টাইন সিগারেট বের করে ধরায়। কোরচাকের লেখা বইটা স্পষ্ট মনে পড়ে। বহুবার পড়েছে সে ছোটবেলায়, জার্মান অনুবাদে। তার খুব প্রিয় বই ছিল। এই লোকটাকে খুনই করবে সে। ট্রেবলিনকায় পাঠানো আর খুন করা তো একই।

গানটা থামে একসময়। বাচ্চাদের কণ্ঠে কিছু সংলাপ শোনা যায়। নাটক করছে বাচ্চাগুলো! নাটকের অভিনয় এই ঘেটোর মধ্যে! বার্নহার্ড অবাক হয়।

দরজায় জোরে শব্দ করে বার্নহার্ড। একজন মহিলা দরজা খোলে। নার্সের মতো পোশাক।

'হের কোরচাক? আমি এস-এস থেকে আসছি।'

মহিলার চোখে ভয়। দরজা থেকে সরে

১৯ আয়নার সামনে এসে অবাক হয়ে যায় শুভম। তার

সে। এইবার একটু স্পষ্ট। বহুবার শোনা। অথচ পিয়ানোয় বাজছে। বাংলা গানের মতো চেনা সুরটা।

আয়নার সামনে এসে অবাক হয়ে যায় শুভম। তার সোনালি চুল। আপাদমস্তক সামরিক ইউনিফর্ম। বুকের কাছে নেমপ্লেটে লেখা বার্নহার্ড শুলজ। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেয় সে। পাশের ইউনিনাল থেকে বেরিয়ে আসে আর-একজন। শুভমের মতোই সামরিক ইউনিফর্ম।

'লোকটা ভালই। প্রায় দুশোটা অনাথ বাচ্চাকে আশ্রয় দিয়েছে। তারপর লেখেও ভাল। আমি ওর একটা বই পড়েছিলাম। ওই যে ছেলেটা ম্যাজিক জানে। জিউদের যত গাঁজাখুরি গল্প। তবে পড়তে ভালই লাগে। আর কী! ট্রেবলিনকায় যাবে আর মরবে। বাচ্চাগুলো সমেত।'

'কার কথা বলছ?'

'হা হা হা। তুমি পারও। য়ানুশ কোরচাককে ট্রেবলিনকায় পাঠানোর অর্ডার পেয়েছ তুমি। আমি কেন অনেকেই জানে।'

'য়ানুশ কোরচাক!' এইবার নামটা চিনতে

ট্রাকগুলো এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে একটা জিপ। তাদের হেডলাইটের আলোর বিমে অনেক ধুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। শুভম ধীরে ধীরে সামনের জিপটায় উঠে বসে। জিউইশ ঘেটো। ব্লিসকা নয় নম্বর।

ছাউনির বাইরে আলোয় জেগে থাকা রাতের শহর। এইগুলো জার্মান কোয়ার্টার। ছিমছাম। সুন্দর পরিষ্কার। দু'-চারটে ঘোড়া থেকে রিয়ার্ড ওয়াগনারের সুর ভেসে আসে। হাসির আওয়াজ। নারী-পুরুষের। গরমকালের ভারাশাওা। জার্মানদের খুব পছন্দের সময়। শহরের অলিগলি ঘুরে গাড়ি এসে পৌঁছয় ঘেটোর পাচিলের পাশে। এইখানে রাস্তাঘাট শুনশান। দূরে দূরে দু'-একজন জার্মান সৈনা। চেনা সুরটা আবার শুনতে পায় শুভম। খুব চেনা। ঠিক যেন রবীন্দ্রসংগীত।

ঘেটোর গেটের বাইরের সেন্ট্রি এগিয়ে আসে শুভমের জিপ দেখে। স্যালুট করে। শুভম ওয়ারেন্টটা হাতে দেয়। সেন্ট্রি পড়ে একঝলক। তারপর ফেরত দেয়। দু'পা পিছিয়ে যায়। আবার স্যালুট করে। তারপর চিৎকার করে, 'গেট

দাঁড়ায়। বার্নহার্ড ভেতরে ঢোকে। এই ঘেটোর তুলনায় ঘরটা বেশ বড়। সামান্য আলোর কয়েকটা বাল্ব টিমটিম করে জ্বলছে। তার মধ্যেই গোল হয়ে বসে আছে বাচ্চাগুলো। একপাশে কয়েকটা বাচ্চা অভিনয় করছে।

'বেশ ভাই, আমরা রোজ এখানে খেলে যাব। ও ভাই, সেপাইগুলো এখানে সব সাজা— আমরা লড়াই-লড়াই খেলি। বন্দুক কোথায় পাই? ওই যে মস্ত শরকাঠি পড়ে আছে— ওইটাকে ভেঙে আমরা বন্দুক বানাই। কিন্তু ভাই তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ছ!'

মাঝের ছেলেটা, একটা পুরনো ফ্রকের লাল কোট পরা। ভীষণ রোগা। সে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, আমার ভারী ঘুম পেয়ে আসছে। জানি না কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি, আর বসে থাকতে পারছি নে— আমার পিঠ ব্যথা করছে।'

বাকি ছেলেমেয়েগুলো বলে ওঠে, 'এখন যে সবে প্রহর বেলা— এখনই তোমার ঘুম পায় কেন? ওই শোনো এই প্রহরের ঘন্টা বাজছে।'

লাল কোট পরা ছেলেটা বলে ওঠে, 'হাঁ ওই যে বাজছে ঢং ঢং ঢং— আমাকে ঘুমোতে যেতে ডাকছে।'

এই নাটকটা চেনে শুভম। বছরার অভিনয় করেছে স্কুলে। পোলিশ ভাষায়, নাটকটা করছে এই ঘেটোর কয়েকটা বাচ্চা!

'হের কোরচাক!' বেশ জোরে বলে ওঠে বার্নহার্ড।

বাচ্চাগুলো চমকে ওঠে। নাটক থেমে যায়। কয়েকজন নার্স তার দিকে ভয়ে তাকিয়ে থাকে।

একজন লোক আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে বার্নহার্ডের দিকে।

অফিসার! লোকটার মুখে দাড়ি। চোখে গোল ফ্রেমের চশমা। লোকটা বার্নহার্ডের সামনে এসে দাঁড়ায়।

'নোবেল লরিয়েট ইন্ডিয়ান লেখক রবীন্দ্রনাথ টেগোরের নাটক করাচ্ছি বাচ্চাদের দিয়ে। নাম পোডচা— ডাকঘর।'

'হের কোরচাক! আমার কাছে অর্ডার আছে আপনাদের ট্রেবলিনকায় পাঠানোর।'

একজন নার্স চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। লোকটার মুখ থেকে সমস্ত রং যেন হারিয়ে যায়। সামান্য কেঁপে ওঠে পা দুটো।

'অফিসার আমরা কি একটু বাইরে কথাটা বলে নিতে পারি?'

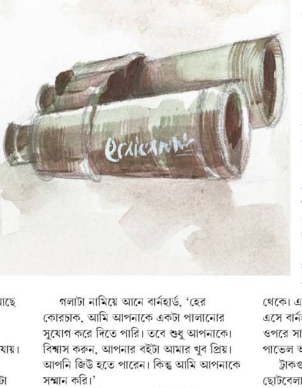

গলাটা নামিয়ে আনে বার্নহার্ড, 'হের কোরচাক, আমি আপনাকে একটা পালানোর সুযোগ করে দিতে পারি। তবে শুধু আপনাকে। বিশ্বাস করুন, আপনার বইটা আমার খুব প্রিয়। আপনি জিউ হতে পারেন। কিন্তু আমি আপনাকে সম্মান করি।'

লোকটা পিছন ফেরে, হেঁটে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। দরজায় হাত রেখে, একবার পিছনে তাকিয়ে বলে, 'একটাই অনুরোধ, অফিসার। যেটা বলতে চাইছিলাম। বাচ্চাগুলোকে কিছু বলবেন না।'

দরজা ঠেলে ঢুকে যান কোরচাক। বার্নহার্ড পিছন পিছন যায়।

বাচ্চাগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে। কয়েকজন নার্স ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কোরচাক বলেন, 'শোনো, তোমরা সবাই তৈরি হয়ে নাও। আমরা গ্রামে বেড়াতে যাচ্ছি। এই ইট-কাঠের শহর থেকে দূরে। পাখি, গাছ, ফুল, কত কিছু সেইখানে,' কোরচাক হেসে ওঠেন, 'তোমাদের সবচেয়ে ভাল জামাটা পরে এসো। আমরা ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন এই অফিসার। আমাদের খুশি হওয়া উচিত।'

'হের কোরচাক। আমি দশ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না।'

'আমাদের তৈরি হতে একটু সময় তো লাগবে, অফিসার।'

কোরচাক তৈরি হয়ে আসেন। মাথায় টুপি পরেননি তিনি। কোমরে কালো বেল্ট পালিশ করা। বাচ্চাগুলো সবাই সেজে এসেছে। খুব যত্ন করে সাজানো হয়েছে তাদের।

'চলুন অফিসার।'

'পাভেল, পাভেল,' কোরচাক ডাক দেন।

অমল সাজা ফারের লাল কোট পরা বাচ্চাটা এখন অন্য পোশাকে। এগিয়ে এসে কোরচাকের হাত ধরে। দু'জনে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বার্নহার্ডের দিকে মুখ ফেরায় বাচ্চাটা। হাত নাড়ে, 'ডোভেজেনিয়া। গুড বাই।'

বার্নহার্ড বেরিয়ে আসে। ট্রাকের পিছনের দরজাগুলো খুলে দিয়েছে সৈন্যরা। কোরচাক এগিয়ে যাচ্ছেন। পিছনে সারিবদ্ধ প্রায় দুশোটা বাচ্চা। ট্রাকের একজন পাইপ থেকে কালো ধোঁয়া তাদের ঢেকে দেয় যেন। কোরচাক উঠে গেলেন, সঙ্গে পাভেল। ওঁর সময় কী যেন পড়ে গেল পাভেলের পকেট থেকে। একজন সৈন্য সেটা কুড়িয়ে নিল। এগিয়ে এসে বার্নহার্ডের হাতে দিল। একটা বাইনোকুলার। ওপরে সাদা রং দিয়ে আঁকাবাঁকা হরফে লেখা পাভেল অ্যাডামিয়েক।

ট্রাকগুলো এগিয়ে যেতে থাকে। বার্নহার্ডের ছোটবেলায় পড়া কোরচাকের বইটা মনে পড়ে। অন্য দিকে তাকায়। বাইনোকুলারটা চোখে

সোনালি চুল! আপাদমস্তক সামরিক ইউনিফর্ম!

বার্নহার্ড একটু ভাবে, 'আসুন।'

দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায় দু'জনে। পকেট থেকে সিগারেটের টিন বের করে বার্নহার্ড, 'জিগারেটেন?'

কোরচাক হাত নাড়েন, 'না।'

'আমাদের ফিউরার হের হিটলারও সিগারেট পছন্দ করেন না। শুনছি যুদ্ধের পর নাকি সিগারেট ব্যান হয়ে যাবে।'

কোরচাক উত্তর দেন না। চুপ করে থাকেন।

'হের কোরচাক, আপনার লেখা আমি পড়েছি।'

লোকটা অবাক হয়। মুখ ফিরিয়ে তাকায় বার্নহার্ডের দিকে। বড় উজ্জ্বল চোখ দুটো। নিষ্পলক।

'কাফকের বলে ম্যাজিক জানা বাচ্চার গল্পটা। ভীষণ সুন্দর।'

লোকটা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, 'আমার গল্পটা আমি বাচ্চাদের মানুষ হতে শেখানোর জন্য লিখেছিলাম, অফিসার।'

'হের কোরচাক!'

'অফিসার! আমি তো আপনাকে বলেছি, আমার গল্পটা আমি বাচ্চাদের মানুষ হতে শেখানোর জন্য লিখেছিলাম।'

'হের কোরচাক! আমার কাছে অর্ডার আছে আপনাদের ট্রেবলিনকায় পাঠানোর।'

একজন নার্স চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। লোকটার মুখ থেকে সমস্ত রং যেন হারিয়ে যায়। সামান্য কেঁপে ওঠে পা দুটো।

'অফিসার আমরা কি একটু বাইরে কথাটা বলে নিতে পারি?'

বার্নহার্ড একটু ভাবে, 'আসুন।'

দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায় দু'জনে। পকেট থেকে সিগারেটের টিন বের করে বার্নহার্ড, 'জিগারেটেন?'

কোরচাক হাত নাড়েন, 'না।'

'আমাদের ফিউরার হের হিটলারও সিগারেট পছন্দ করেন না। শুনছি যুদ্ধের পর নাকি সিগারেট ব্যান হয়ে যাবে।'

কোরচাক উত্তর দেন না। চুপ করে থাকেন।

'হের কোরচাক, আপনার লেখা আমি পড়েছি।'

লোকটা অবাক হয়। মুখ ফিরিয়ে তাকায় বার্নহার্ডের দিকে। বড় উজ্জ্বল চোখ দুটো। নিষ্পলক।

'কাফকের বলে ম্যাজিক জানা বাচ্চার গল্পটা। ভীষণ সুন্দর।'

লোকটা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, 'আমার গল্পটা আমি বাচ্চাদের মানুষ হতে শেখানোর জন্য লিখেছিলাম, অফিসার।'

'হের কোরচাক!'

প্রকাশিত

ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের মুখোমুখি • চিন্ময় গুহ

বইয়ের দেশ

অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০১৫

বাদল বসু

(১৯৩৭-২০১৫)

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় • অনাথনাথ দাস
অনিল আচার্য • সুবোধ সরকার • সন্দীপ রায়
পৌলোমী সেনগুপ্ত • তিলোত্তমা মজুমদার

পুস্তক সমালোচনা • পুস্তক পরিচয় • বইয়ের তালিকা • কেতাবি খবর

আনন্দ পুস্তক বিপণিতে পাওয়া যাচ্ছে

পিওন থেকে প্রকাশক

বা দ ল ব সু

২২

উনপঞ্চাশ

জীবিতকালেই আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন জনপ্রিয় সাহিত্যিক। তখনই তাঁর প্রবল খ্যাতি। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীকে কোনওদিন সাহিত্যিকদের সভা-সমিতি, প্রকাশকদের অফিসে, পত্রিকা দপ্তরে দেখিনি। পয়লা বৈশাখে আনন্দ পাবলিশার্সের অনুষ্ঠানে অনেক প্রতিষ্ঠিত থেকে তরুণ সাহিত্যিক আসতেন। কিন্তু আমন্ত্রণ জানানোর পরও আশাপূর্ণা দেবী কোনওদিন আসতে পারেননি। তার কারণ, সংসারের নানা কাজ সামলে আশাপূর্ণা দেবীকে লেখালিখি করতে হত। ফলে এত দিক সামলে তিনি আর সময় বের করতে পারতেন না। সম্পাদক-প্রকাশকরা মুখ্যত তাঁর বাড়ি থেকেই লেখা সংগ্রহ করতেন। আমিও দু'-একবার গিয়েছি। কিন্তু প্রায় তাঁর সমবয়সি লীলা মজুমদারের সঙ্গে যেমন পারিবারিক সম্পর্ক হয়েছিল, আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে তা হয়নি। প্রকাশক-লেখকের গণ্ডিতেই সম্পর্ক থমকে দাঁড়িয়েছিল।

ফলে আশাপূর্ণা দেবী ৫.৮.১৯৭৭ তারিখ থেকে ৩০.৬.১৯৮৬ তারিখের মধ্যে যে-আটটি চিঠি আমাকে লিখেছিলেন, সবেতেই ছিল কেজো কথাবার্তা। এবং শেষ চিঠি ছাড়া বাকি সব চিঠিতেই সম্বোধন 'আপনি'। শুধু শেষ চিঠিতে সেটা 'তুমি' হয়েছে। বয়সে তাঁর চেয়ে ঢের ছোট হলেও, দিদি-ভাইয়ের সম্পর্ক থাকলেও 'আপনি' থেকে 'তুমি' হতে এক দশক লেগেছিল। কোনওদিনই কাজের বাইরে তিনি একটিও বাড়তি শব্দ লেখেননি চিঠিতে।

অলোকরঞ্জনের কিছু শব্দপ্রয়োগ যেমন অভিনব, তেমনই মজার। ব্লাড সুগারকে বলেন ‘শোণিত শর্করা’। টেলিফোন সারানো হলে জানান ‘দূরভাষের স্বরোদ্ধার হল।’ লম্বা বিমানযাত্রার হ্যাংওভার তাঁর ভাষায় ‘দোলনময়া’।

যেমন, ২৬.৮.১৯৭৯ তারিখে ১৭ কানুনগো পার্ক, গড়িয়া থেকে ছাপানো লেটারহেডে তিনি লিখেছিলেন:

সবিনয় নিবেদন

আপনার চিঠিতে জানলাম ‘গজ উকিল হত্যা রহস্য’ ছাপা হয়ে গেছে। জেনে একটু মুশকিলে পড়ে গেলাম। ওটি যে আপনারা ছাপছেন, তা তো আমার জানা ছিল না। আমি ওটি অন্য একজনকে দেবার জন্যে কথাবার্তা করে রেখেছি, ভাগ্যিস তাঁদের ছাপা আরম্ভ হয়ে যায়নি। তাঁদের তাড়াতাড়ি জানাতে হবে আমায়।

‘ভূতুড়ে কুকুর’ সম্পর্কে আপনি বলে রেখেছিলেন সেটা মনে আছে। ‘গজ উকিল’ সম্পর্কে কিছু বলেননি কিন্তু। বই ছাপতে দেবার আগে ‘মুক্তিপত্র’ বা ওইরকম কিছুর ব্যবস্থা কি আনন্দ পাবলিশার্সের নেই আজকাল? আগে যেসব বই ছাপা হয়েছে, আমাকে বোধহয় আগে জানানো হয়েছে। না জানালে অসুবিধে উভয় পক্ষেরই।

আপনি লিখেছেন ‘সাপের ছোবল’ প্রেসে রয়েছে। কিন্তু ‘সাপের ছোবল’ তো গত মার্চ মাসে (মার্চ-জুনআশি) ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেছে। প্রকাশ করেছেন ‘নবপত্র প্রকাশন’, ওঁরা— ‘দেশে’ বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। আপনি নেবেন, সেটা বলেননি তো।

যাই হোক, ওটি ছাপা বন্ধ করে দেবেন। না হলে খুবই মুশকিলের ব্যাপার হবে। ‘গজ উকিলের’ উৎসর্গ দিলাম।

আশাকরি সর্বাঙ্গীন কুশল। শুভেচ্ছা নেবেন। নমস্কার সহ—

আপনাদের
আশাপূর্ণা দেবী

চিঠিতে যে-বইগুলোর কথা লেখা সবই ছোটদের উপন্যাস, আনন্দমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই জানেন না বিপুল পরিমাণ গল্পের পাশাপাশি আশাপূর্ণা দেবী কিছু কবিতাও লিখেছেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথমদিকে কয়েকটি কবিতা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকীতে আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন কবিদের কবিতার সংকলন করার পরিকল্পনা করি। পরিকল্পনা অনুযায়ী ‘রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত’ নামের সংকলনটি সম্পাদনা করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সংকলনটি খুবই জনপ্রিয়। সম্পাদনা করার সময় সুনীল পুরনো পত্রপত্রিকা খুঁজতে-খুঁজতে আশাপূর্ণা দেবীর একটি রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত কবিতা পেয়ে যান। চিঠি দিয়ে আশাপূর্ণা দেবীকে অনুরোধ করা হয় কবিতাটি সংকলনে দেওয়ার জন্য। সেই চিঠির উত্তরে তিনি যে-চিঠি সুনীলকে পাঠিয়েছিলেন তা আজও আমার কাছে রয়েছে। তাতে আশাপূর্ণা দেবী লিখেছিলেন:

রবীন্দ্রনাথের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে কবিতা সংকলন প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে, আমি জানি না সেই মূল্যবান সংকলনে স্থান পাওয়ার যোগ্য আমার কোনও ‘কবিতা’ থাকা সম্ভব কিনা।

যদি এমন অভাবিত কিছু হয়ে থাকে তা হলে আমার সেই কবিতাটি উক্ত সংকলনে প্রকাশের জন্য আমার সানন্দ সম্মতি জানিয়ে কৃতার্থ হচ্ছি।

আশাপূর্ণা দেবী নব্বর শরীরে নেই, কিন্তু তাঁর গল্প-উপন্যাস এখনও জীবিত

নিজের ওই কবিতাটির কথা ভুলেই গিয়েছিলেন আশাপূর্ণা দেবী। কবিতাটির নাম, ‘চিরচেনা’। ‘রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত’-তে ছাপাও হয়। কবিতাটির কয়েকটি লাইন তুলে দিলাম:

“ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়।”
আমার জীবনে একথা সত্য নয়।
আর এও নয় সত্য,
“হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে—”
ঝলমলিয়েছে চিত্ত!

উৎসাহী পাঠক সংকলনটি থেকে সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়ে নিতে পারেন।

আশাপূর্ণা দেবীর ছেলে সুশান্তবাবু ছিলেন পাসপোর্ট অফিসার। বিল্লিতে থাকতেন চাকরিসূত্রে। আশাপূর্ণা দেবী এবং তাঁর স্বামীও মাঝে-মাঝে বিল্লি চলে যেতেন। শুনেছি, ছেলের কাছে থাকার সময়ও তিনি নিয়মিত লিখতেন। আশাপূর্ণা দেবীর শেষ চিঠি পাই ৩০.৬.১৯৮৬ তারিখে। ‘সবিনয় নিবেদন’ ছেড়ে সেই প্রথম তিনি আমায় লিখলেন ‘স্নেহভাজনেষু’। চিঠিটি আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছি:

স্নেহভাজনেষু,
আশাকরি কুশল। তোমার হয়তো বহু ব্যস্ততায় মনে নেই, তাই একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি, বেশ কিছুকাল আগে আমাকে জানানো

হয়েছিল— 'আনন্দ পাবলিশার্স' আমার একটি ছোটদের বই ছাপতে ইচ্ছুক— 'ফড়ংস্ত্রের নায়ক', 'লাল্লা মরিচ' ও পরে প্রকাশিত 'কলকাতার এত কাছে?' তিনটি বড় গল্প একত্রে। সব ক'টি গল্পই 'আনন্দমেলায়' প্রকাশিত।

অনেকদিন হয়ে গেছে, এ বিষয়ে কী হল সেটি জানবার জন্যে স্বপনকে দিয়ে কয়েকবার জিগ্যেস করেছি। কিন্তু সঠিক উত্তর পাইনি। মনে হচ্ছে 'আনন্দ পাবলিশার্সের' বহু মূল্যবান বইয়ের ভীড়ে ওটি আর বোধহয় এখন প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বিনীত প্রশ্ন— গল্প তিনটি কি অন্য কোনও আগ্রহী প্রকাশককে দিতে পারি?

উত্তরটি এক লাইন লিখে স্বপনের হাতে দিয়ে দিলে বড় ভাল হয়। স্বপন হয়তো বললে ভুলে যেতে পারে।

শুভেচ্ছা সহ
আশাপূর্ণা দেবী

এই চিঠির স্বপন হল আশাপূর্ণা দেবীর প্রতিবেশী। 'আনন্দলোক' পত্রিকায় চাকরি করত। ২০০৯ সালে আশাপূর্ণা দেবীর জন্মশতবর্ষ পালিত হল। এখন তো তিনি শতাব্দীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন বয়সে। আশাপূর্ণা দেবীর নশ্বর শরীরের মৃত্যু হলেও তাঁর গল্প-উপন্যাস এখনও জীবিত। বাঙালি পরিবারের মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-লাঞ্ছনার কথা জানতে হলে তাঁর লেখা যে পড়তেই হবে!

পঞ্চাশ

তিনি যে কবি সেটা আর আলাদা করে বলে দিতে হয় না। গল্প-পদ্য তো বটেই এমনকী তাঁর কথা, হাবভাব, চেহারাও কবিসুলভ। পাঁচের দশকের যে-কবিরা আজ জায়গা করে নিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, তিনি তাঁদের একজন। তিনি কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তবে কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি মুখ্য হলেও সম্পূর্ণ নয়। অলোকরঞ্জনের পড়াশোনার পরিধিও বিস্তৃত। এমন এক পণ্ডিত মানুষের সঙ্গে যে আমার এতদিনের সুদৃঢ় সম্পর্ক, সেটা ভাবলে ভারী ভাল লাগে।

অলোকরঞ্জনের দু'টি ঠিকানা। কিছুদিন তিনি থাকেন জার্মানির হিশবার্গে, কিছুদিন কলকাতার যাদবপুরে। তবে বিশ্বের যে-প্রান্তেই থাকুন, চিঠি, টেলিফোন, ফ্যাক্সের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। আমিই বরং প্রতিটি চিঠির জবাব দিতে পারি না বলে লজ্জায় কুঁকড়ে থাকি।

অলোকরঞ্জনের ভাষার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, এক স্বতন্ত্র গদ্যশৈলীর নির্মাতা তিনি। কাব্যশৈলী নিয়ে কথা বলতে চাই না। ওটা আমার জায়গা নয়। অলোকরঞ্জনের কিছু শব্দপ্রয়োগ যেমন অভিনব, তেমনই মজার। ব্লাড সুগারকে তিনি বলে থাকেন 'শোণিত শর্করা'। টেলিফোন সারানো হলে জানান, 'দূরভাষের স্বরোদ্ধার হল।' টেলিফোনের আনসারিং মেশিনকে তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন— 'স্বরমুকুল ধরে রাখতে পারে' যন্ত্র। লম্বা বিমানযাত্রার হ্যাংওভার তাঁর ভাষায় 'লোলনমায়া'। কিন্তু অলোকরঞ্জনের এই অনুবাদ শুনতে যতটা ভাল, বুঝতে ততটা নয়। অলোকরঞ্জন যখন ওই ভাষায় অনর্গল কথা বলতে থাকেন, অনেক বাঙালিকেই হাঁ হয়ে যেতে দেখেছি।

আসলে আমরা আড্ডাকাল 'কেবারা'র চেয়ে '-এ বেশি অভ্যস্ত। বাংলা অভিধানও ভরে উঠেছে প্রচুর বিদেশি শব্দে। তবে অলোকরঞ্জন যেমন সবই বাংলা ভাষা দিয়ে ধরতে চান তেমনটা করা গেলে ভাল হত। কিন্তু উপায় কী? এই ভাষায় যে সহজে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। আমারই সেই সমস্যা হয়েছে। অলোকরঞ্জনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করিনি বটে। তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা জয় গোস্বামী, যাঁকে হাতের কাছে পেয়েছি তাঁকেই ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করেছি, "যা বললেন তার মানে কী?"

শুধু নিয়ে খেলায় অলোকরঞ্জনের জুড়ি নেই। এক সন্ধেয় আমি আর জয় গিয়েছি অলোকরঞ্জনের যাদবপুরের বাড়ি। আড্ডা দিতে-দিতে রাত হল। এবার উঠতে হয়। জয়ের বাড়ি কিছুটা উত্তরে ছিল তখন, আমি তো থাকি একেবারে উত্তর কলকাতায়। অলোকরঞ্জন ওই 'উত্তর' শব্দটা লুফে নিলেন। বললেন, "ও তা হলে কিছুটা উত্তরে যাবে, আপনি তো দেখছি একেবারে উত্তরোত্তর..."

বুঝলাম, এই খেলায় অলোকরঞ্জনের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল। প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে কবিতা না লিখতে পেরে পড়ি তো প্রচুর। সেই বিদ্যে প্রয়োগ করলাম আত্মরক্ষার্থে। বিষ্ণু দে-র বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নামই বললাম, "উত্তরে থাকো মৌন।" অলোকরঞ্জন, জয় দু'জনেই হেসে ফেললেন।

কথায়-কথায় বাড়ি ফেরা পিছিয়ে গেল। আড্ডা ঘুরে গেল প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত-র কবিতা নিয়ে।

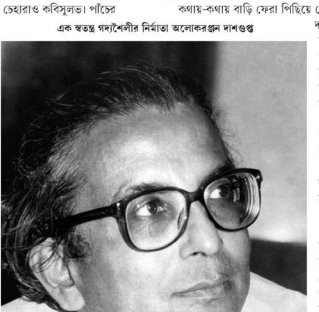
এক স্বতন্ত্র গদ্যশৈলীর নির্মাতা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অলোকরঞ্জন বলতে শুরু করলেন, "প্রণবেন্দু তো এখন নিজেরই চারপাশে কেবল নিজেকে বয়ন করে চলেছেন। নিজেকে ঘিরে এই যে সময়ের সুতোলি বয়ন..."

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, "এককথায় বললেই তো হয়, 'নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি।'"

এটাও প্রণবেন্দুর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম। ফলে এবারও হাসিতে ফেটে পড়লেন দু'জনে।

আনন্দ পাবলিশার্স থেকে অলোকরঞ্জনের প্রথম কবিতার বই 'হ্যে কাব্যিক মুখোশ' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। পরের বই ১৯৮৪ সালে 'এবার চলো বিপ্রতীপে'। এই বইটি করার সময় দেখেছিলাম অলোকরঞ্জন কখনও পাঠক ঠকাতে চান না। বইটি বেরোনোর তোড়জোড় যখন প্রায় শেষ, সুদূর জার্মানি থেকে অলোকরঞ্জন চিঠি পাঠালেন। সেই চিঠির বক্তব্য:

পাণ্ডুলিপি থেকে ৩০ ও ৫২ সংখ্যক দু'টি কবিতা ('লশী', পাণ্ডুলিপিতে পৃ ৩০/ ও 'অনার্য্য'

ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ৬ অগস্ট ১৯৫৭ সাল বাংলা প্রকাশনার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ওইদিন সূচনা হয়েছিল আনন্দ পাবলিশার্সের। যে-প্রকাশনাকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ।

পাণ্ডুলিপিতে পৃ ৫৩) দয়া করে বাদ দেবেন। ও দু'টি কবিতা ভুল ক'রে আমার আরেকটি বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এ ব্যাপারে সুনীলের সঙ্গে তাঁর যেমন মিল, শক্তির সঙ্গে তেমন অমিল। ১৯৮৮ সালে অলোকরঞ্জনের একটি প্রবন্ধের বই, যা তাঁর ভাষায় 'প্রবন্ধ পুথি', ছাপার কথা হল। বইটির নাম তিনি ঠিক করলেন 'জার্মানির চিঠি'। কিন্তু ওই ধরনের নামের বই তখন প্রচুর। সেই কবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'রাশিয়ার চিঠি'। এর পর বেরিয়েছে 'এশিয়ার চিঠি', 'আমেরিকার চিঠি', 'প্রবাসীর চিঠি'। আমি তখন তাঁকে অনুরোধ করলাম বইটার নাম পালটাতে। সেই অনুরোধে তিনি বইটির নাম পালটে করেছিলেন, 'জমণে নয়, ভুবনে'। এর পর অলোকরঞ্জনের আর-একটি প্রবন্ধের বই বের করি ১১৯৫ সালে, 'শরণার্থী ঋত্ত ও শিল্পভাবনা'। বইটির পাণ্ডুলিপি আমাদের দেওয়ার পর জার্মানিতে ফিরে গিয়ে অলোকরঞ্জন ফের লিখে পাঠালেন:

আপনার হাতে যে পাণ্ডুলিপিগুলি রেখে এসেছিলাম তার কয়েকটি রচনায় হাতের লেখা বা ফটোকপি বেশ অস্পষ্ট ছিল। সেই রচনাগুলির পাঠযোগ্য ভাষ্য পাঠালাম এই সঙ্গে। আগের ওই রচনাগুলি পাণ্ডুলিপি থেকে সরিয়ে নিয়ে সেই পরিসরে নতুন এই লেখাগুলি গুঁজে দেবেন। পরাংকসূত্র লেখাগুলোর ওপরে যথাযথ জুড়ে দিয়েছি। আর একটি অনুরোধ: 'মে-মাসের একটি কমেডি' (পৃঃ ২১) রচনার প্রথম লাইন 'বড়ো ক্রতবেগে দৃশ্যাবর্ত ঘুরে যাচ্ছে' বদলে 'বড়ো বেশি ক্রতবেগে দৃশ্যাবর্ত সরে যাচ্ছে' করিয়ে নেবেন।

বই বের করার সময় দেখেছি পাণ্ডুলিপি, প্রুফ নিয়ে অলোকরঞ্জন খুব খুঁতখুঁতে। ছোটখাটো অদলবদলের জন্য তিনি সুদূর জার্মানি থেকে চিঠি পাঠাতেন। আর কলকাতায় থাকলে লোক পাঠাতেন চিরকুট হাতে দিয়ে। তাঁর 'তুষারঝড়ে ত্রিশূলচিহ্ন' কাব্যগ্রন্থের কাজ চলার সময় জার্মানি থেকে পাঠানো অলোকরঞ্জনের ফ্যাক্স থুড়ি চিত্রলিপি পেলাম। তাতে লেখা, 'কবিতার পাণ্ডুলিপির একটি অংশ ইষৎ অদলবদল করলাম। পৃঃ ৫৫/ ১৪-১৭ লাইন। দয়া করে নতুন পাতাটি ওখানে বসিয়ে রাখবেন।' নিজের লেখার ব্যাপারে অলোকরঞ্জন এমনই সতর্ক এবং পরিশ্রমী।

অলোকরঞ্জনের কথা বলতে গেলে টুডবার্টা-র কথাও বলতেই হয়। টুডবার্টা অলোকরঞ্জনের স্ত্রী, জার্মান। তিনিও ছিলেন আমাদের কাছের মানুষ। অলোকরঞ্জনের লেখা অনেক চিঠির নিচে টুডবার্টার সইও থাকত। তিনি চমৎকার বাংলা বলতে পারতেন। আদর্শ বাঙালি স্ত্রী বলতে যা বোঝায় টুডবার্টা ছিলেন তাই। অলোকরঞ্জন কাজকর্ম, রান্না কিছুই করতে পারতেন না। স্ত্রীর উপর পুরোপুরি নির্ভর করতেন। একবার জার্মানিতে আমি উঠেছি অলোকরঞ্জনের বাড়িতে। টুডবার্টা ছিলেন না। অতএব আমাকে দেখাশোনার দায়িত্ব অলোকরঞ্জনের। অতিথিকে খাওয়ানোর জন্য অলোকরঞ্জন সসম্যানে ডিমসেদ্ধ বসিয়েছিলেন। আমার কেমন সন্দেহ হল। রান্নাঘরে উঁকি মারতেই দেখি সসপ্যানকে মাঝখানে শুধু একটা ডিম রেখে তিনি গ্যাস জ্বালিয়ে সেটা সেদ্ধ করতে যাচ্ছেন।

আমি আঁতকে উঠে বলেছিলাম, 'এ কী করছেন! জল দিন শিগগির।'

এই মানুষটি যে টুডবার্টার মৃত্যুর পর কতটা অসহায় হয়ে পড়েছেন আমি অনুভব করতে পারি। আগেই বলেছি, অলোকরঞ্জন প্রচুর চিঠি লিখতেন। কেন তিনি এত চিঠি লেখেন তাও একটা চিঠিতে অলোকরঞ্জন লিখেছিলেন তাঁর অনবদ্য গদ্যে: 'আসলে চিঠি আমার কাছে একটি স্বর্ণিল সেতুর মতো।'

সব চিঠিতে অলোকরঞ্জন 'বাদলবাবু' বলে আমাকে সম্বোধন করেছেন। শুধু ১৫.৮.১৯৯৪ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'ভাই বন্ধু বাদল বাউল'। আমি কস্মিনকালে বাউলমনস্ক নয়। এটা আসলে 'যৌবন বাউল'-এর রবীন্দ্র-সমর্পণ এবং বাদলপ্রীতির যুগলবন্দি বলে আমার ধারণা। চিঠি লেখার ব্যাপারে অলোকরঞ্জন অক্লান্ত। আমার সংগ্রহে তাঁর জার্মানি থেকে 'চিত্রলিপি' করে পাঠানো একটি চিঠি আছে। এতদিনের 'চিত্রলিপি' করা চিঠি আগাসা হয়ে গিয়েছে। তবু ওই আবছা হয়ে আসা শব্দ এবং বাক্যবন্ধে অলোকরঞ্জনের গদ্যের নিজস্বতা এবং আমার প্রতি ভালবাসা আজও জ্বলজ্বল করছে:

এখানে এখন মধ্যরাত— একটু আগে ফিরেই আপনার একতারার রণন শুনে মন ভারি প্রসন্ন হল। এত রাতে যদি আপনাকে ডাক পাঠাতাম, কাঁচা ঘুম ভেঙে শাপসম্পাত করতেন হয়তো, সেই আশঙ্কায় স্বরারোপ করলাম না।

শিগ্‌গিরই, সেপ্টেম্বরের শুরুতে আমরা দেশে আসছি। সুতরাং দেখা হবে এবং অনেক গল্প হবে। অনেক কথা জমে আছে। এর মধ্যে থেকে থেকেই জয়ের সঙ্গে অনুভাষিত হচ্ছে, আর ওর কাছ থেকে আপনাদের সুসমাচার পেয়েছি। দিনকয়েক আগেই ফ্রাংকফুর্টে ফরিদা পারভীনের অনুষ্ঠানে বাবুলের সঙ্গে দেখা হল। ওর সঙ্গে সেদিনই আপনার কথা হয়েছে, এই সংবাদে উৎফুল্ল হলাম। অপু-বাবুলের গ্রন্থাগার এখনও একটি আরশ প্রকল্প। দেখা হলে এই মর্মে কৌতুকী-বিষয় বিনিময় ঘটবে। ওরা সবাই ভাল আছে।

সমস্তই কুশলকল্যাণ তো? আপনার/আপনাদের জন্যে এই মিতালিবোধে টুডবার্টার, আমার প্রীতি ভালবাসা।

অলোকরঞ্জন।

এমন আরও একটি চিঠি তুলে দিতে পারি, যা পড়লে চেনা যায় অলোকরঞ্জনের ভালবাসা। ২৮.২.৯৬ তারিখে এই চিঠিও এসেছিল 'প্রতিলিপি' মারফত:

সুপ্রিয়বরেষু,

এখানে 'ফাল্গুনী' এবং শরতের প্রবল ঘৈ ঘৈ চলেছে এখনো। এরি মধ্যে, প্রকৃতির অন্তঃস্থ নিয়মেই বিস্ফুরিত হয়ে আসছে ফুলের পর ফুল! মানবপ্রকৃতি তবুও তো স্বস্তি মানে না— সে চায় শুভার্থীর সাড়াশব্দ। আগের ফ্যাক্স চিঠিখানি পেয়েছিলেন তো? বইমেলার খেলাধুলো তো এখন আপাতত শেষ। অতএব অনুরোধ করি, এই চিঠ পাবার পর, হয়তো-বা ষষ্ঠাংহ ভিতর থেকেই— জার্মান পার্শেলের মধ্যেও— আমাদের একটি শব্দসাড়া পাঠানোর সময় পেয়ে যাবেন।

এই সন্ধিক্ষণেই পূর্ব জার্মানির একটি দল আমাদের ডেরায় এসে হাজির। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি উৎসব করার অভিসন্ধিতেমায়। এদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখি আপনাদের জন্য আমাদের ভালবাসা।

অলোকরঞ্জন।

যতবার জার্মানি গিয়েছি ততবার এই ভাবনাসার ছেয়িয়ে অলোকরঞ্জন, টুডবার্টা, তাঁদের মা ভরিয়ে রেখেছে আমায়। সে কথা কি কখনও ভোলা যায়? শুধু অলোকরঞ্জনের জন্যই জার্মানি নিয়ে নানা বিচিত্র জায়গা ঘোরার সুযোগ আমার হয়েছে। সাহিত্যসভাতেও গিয়েছি। মায় বাঙালি ছাত্রদের হস্টেলেও। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে তিনি খুবই জনপ্রিয়। ২০০৬ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার থিম ভিত্তিয়বার হল ভারতের উপর। অনেক ভারতীয় সাহিত্যিকের মধ্যে আমন্ত্রিত ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, অমিতাভ ঘোষ। প্রকাশকদের মধ্যে যথারীতি আমি। ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে যে-অনুষ্ঠান, তাতে অলোকরঞ্জন বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন সঞ্চালক এবং পরিচালক।

জার্মানিতে অলোকরঞ্জনের জনপ্রিয়তা কোন উচ্চতায় পৌঁছেছিল তা আন্দাজ করার জন্য একটি নমুনাই যথেষ্ট। সেবার আমি জার্মানিতে আর অলোকরঞ্জন ভারতে। অথচ জার্মানিতে অলোকরঞ্জনের অনুরাগীরা তাঁর জন্মদিন পালনের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বাংলা প্রকাশনা জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে আনন্দ পাবলিশার্স

'রবিচক্র' নামে সেই পাঠচক্রের অনুষ্ঠানে আমিও ছিলাম। ওখানে বসে অনুষ্ঠান দেখতে-দেখতে এই ভেবে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, যে-মানুষটিকে নিয়ে এমন আয়োজন, সেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর সান্নিধ্য পেয়েছি আমি।

একান্ন

ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ৬ অগস্ট ১৯৫৭ সাল বাংলা প্রকাশনার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ওইদিন সূচনা হয়েছিল আনন্দ পাবলিশার্সের। যে-প্রকাশনাকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ।

আনন্দর পঁচিশ বছর পূর্ণ হল ১৯৮২ সালে। যেহেতু ঠিক তার আগের বছর মানে ১৯৮১ সালে আমি প্রকাশনাটির দায়িত্ব পেয়েছি, ফলে পঁচিশ বছর পূর্তি কীভাবে করা যায় তাই নিয়ে ভাবতে হয়েছিল। প্রকাশনার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা অনেক নতুন বই বের করেছিলাম। সেই সঙ্গে আমরা দেশ পত্রিকায় ষোলো পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিলাম 'প্রকাশনার পঁচিশ বছর' নামে। সেই ষোলোটি পৃষ্ঠা আজও আমার সম্পদ। যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছি। আজ আনন্দ পাবলিশার্স যখন অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এসেছে তখনও মনে হয় ওই ষোলোটি পাতা মূল্য হারায়নি। তার কারণ, ওই ষোলো পৃষ্ঠায় আনন্দর নানা দিক নিয়ে লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায়, সাগরময় ঘোষ, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এবং এঁরা কেউই নিছক স্তুতি করেননি। যা লিখেছেন তা যুক্তি দিয়ে লিখেছেন। বিজ্ঞাপনটি শুরু হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের ছবি এবং সই করা একটি লেখা দিয়ে। তাতে সত্যজিৎ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছিলেন, 'ঘর বলব বলা কোনও তারিদ কখনও অনুভব করিনি।' লেখক জীবনের গোড়া থেকে সত্যজিতের বই আনন্দ ছেপে এসেছে। আমরা আজ গর্ব করে বলতে পারি, সত্যজিৎ রায়ের সব বাংলা বইয়ের প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স।

সাগরময় ঘোষের লেখার নাম ছিল, 'উদার অভ্যুদয়'। লেখার শুরুতে সাগরদা মজার ছলে এক করুণ রসের গল্প শুনিয়েছিলেন, যাতে ফুটে উঠেছিল বাংলা প্রকাশনা জগতের এক মর্মান্তিক সত্য:

'এক প্রকাশকের বাড়িতে উৎসব। নামী নামী লেখকরা সব আমন্ত্রিত। মাছ-মাংস-পোলাও-কালিয়ার বিপুল ব্যবস্থা। হঠাৎ দেখা গেল, খেতে বসে এক ভোজনরসিক সাহিত্যিক কিছুতেই মাংস নিচ্ছেন না। প্রকাশক নিজে গেলেন এগিয়ে। শুধোলেন, "কী হে, মাংস নিচ্ছ না কেন?" সাহিত্যিক জবাব দিলেন "ভয়ে।" হো হো করে হেসে উঠলেন প্রকাশক, "ভয়! কীসের ভয়?" জবাব তৈরীই ছিল। প্রকাশককে ডেকে মজার মুখ করে কানে কানে ফিসফিসিয়ে বললেন কৌতুকপ্রিয় লেখক, "মাংসটা কোন লেখকের?"'

বাংলা প্রকাশনা জগৎ যে কী ছিল, সাগরদার লেখাতেই পষ্ট চেনা যায়। দু'-চারটে ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ প্রকাশকই সাহিত্যিকদের প্রতি সুবিধার করতেন না। এই অব্যবস্থা দূর করার সংকল্প নিয়ে 'আনন্দ পাবলিশার্স' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অশোককুমার সরকার। ভাল বই প্রকাশের পাশাপাশি আনন্দ বরাবরই সাহিত্যিকদের যোগ্য সম্মান এবং প্রাপ্য রয়্যালটি দিয়ে এসেছে। শুধু নামী সাহিত্যিক নয়, সম্ভাবনাময় নতুন লেখকের বইও বেরিয়েছে আনন্দ থেকে। সেই সঙ্গে বাংলা বইয়ের মুদ্রণের মান যাতে বিশ্বমানের হয় সেদিকেও আনন্দর প্রখর দৃষ্টি। এত বছর ধরে আনন্দ সেই আদর্শকে বজায় রেখে চলেছে।

আজকের 'মহীরুহ' আনন্দকে দেখে প্রথমের দিনগুলো বিচার করলে ভুল হবে। প্রথম দিকে কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। সেই সময় নামী লেখকেরা বড়-বড় প্রকাশনার কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে রাখতেন। ফলে আমাদের বরাতে বই জুটত না। আর জুটলেও জুটত পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণ। অবশ্য সবাই যে তেমন করতেন এটা বললে ভুল হবে।

আমার আগে প্রকাশনার দায়িত্বে থাকা ঋণিভূষণ দেব সেই বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্রে লিখেছিলেন, 'কোনও কোনও সাহিত্যিক বন্ধু এত সহানুভূতিশীল ছিলেন যে আমাদের বই দেবার জন্য আনন্দ পাবলিশার্সের সঙ্গে ছল-চাতুরিও করতেন। একবার এক সাহিত্যিক বন্ধু ভোরবেলা ফোনে ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, আমুকদা যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে আমুক বইটা কি তুমি ছাপছ? তাহলে বলো, হ্যাঁ। বলাবাহুল্য ওই বইটার নাম তার আগে

পার্থ ছিল ব্রাহ্মসমাজের মানুষ। সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে সে অবাধে বিচরণ করত। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও যেমন সে তিনটি বই লিখেছে, তেমনই তিনটি উপন্যাসও লিখেছে। তার প্রবন্ধের বই, উপন্যাস আমরা আনন্দ থেকে প্রকাশ করেছি।

আমি শুনিনি।'

প্রথম দিকের এই প্রতিবদ্ধকতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। পঁচিশ বছর পূর্তির সময় তো আনন্দ পাবলিশার্স ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত। ক্রোড়পত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'আমি আনন্দবাজার সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, আনন্দ পাবলিশার্স আমার অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, সুতরাং আমি আনন্দ পাবলিশার্স-এর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশংসা করবো, এরকম অনেকেই ধরে নিতে পারেন। কিন্তু প্রশংসার অনেক ন্যায্য কারণ আছে। বিশ্বভারতী ও সিগনেট প্রেস বাংলা বই ছাপায় যে উচ্চমান তৈরি করেছিল, আনন্দ পাবলিশার্স সে আদর্শেই চলেছেন।'

সমরেশ বসুর অভিমত এবং আনন্দর সঙ্গে সম্পর্কের কথা তো সমরেশবাবু প্রসঙ্গেই লিখেছি। আসলে আনন্দ পাবলিশার্সে আমরা সবাই ছিলাম এক পরিবারের মতো। পঁচিশ বছরের ক্রোড়পত্রে আনন্দর সব কর্মীর ছবি ছাপা হয়েছিল। সেই ছবি ছাড়া হাজার সুখ-দুঃখের ছবি আমার মনে সাজানো আছে। জানকীনাথ বসু ছিলেন সেই সময় 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'-এর সভাপতি। বইপাড়ায় সবাই একডাকে তাঁকে চিনতেন। তিনি নিজেও একটি প্রকাশনা সংস্থা চালাতেন, 'বুক ল্যান্ড'। জানকীবাবু মুদ্রণ, বইয়ের ইতিহাসের সঙ্গে আনন্দ পাবলিশার্সকে মিশিয়ে একটি চমৎকার লেখা লিখেছিলেন ক্রোড়পত্রে।

পঁচিশ বছরের ওই ক্রোড়পত্রে আমাদের একটি বড় প্রাপ্তি ছিল আনন্দদত্ত অভিনন্দন জানিয়ে সেই সময়কার অনেক প্রকাশক ওই পাতায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। প্রথমেই ছিল বিশ্বভারতী। এর পর এ-কে-এম সাহিত্য সংসদ, পত্রপুট, ওরিয়েন্ট, মৌসুমী, ফার্মা কেএলএম, দে'জ, জ্ঞান সঞ্চয়ন, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, মৈত্রী, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানির শুভেচ্ছা এত বছর বাদেও জ্বলজ্বল করছে। প্রকাশনা ও মুদ্রণের সঙ্গে যুক্ত অন্য সংস্থার বিজ্ঞাপনও পেয়েছিলাম আমরা। যেমন, নিউ ক্যালকাটা বাইন্ডার্স, স্ট্যান্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং, বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস, অশোকা বাইন্ডিং, দা বেঙ্গল পেপার মিল, প্রভাবতী বাইন্ডিং ওয়ার্কস, ইন্ডিয়ান বুক বাইন্ডিং, বিবেকানন্দ বাইন্ডিং, কৃষ্ণা বাইন্ডিং, পেপার অ্যান্ড অ্যালায়েড এজেন্সি, তুলসী বাইন্ডিং। শিবকালী ভট্টাচার্য আয়ুর্বেদাচার্যের 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' আমরা খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশ করেছি। তিনি পাঠিয়েছিলেন এক অভিনব শুভেচ্ছাবার্তা— 'বনৌষধি ছাড়াই যে-প্রকাশন সংস্থা চিরঞ্জীব হবার পথে তাকে অভিনন্দন।'

এমন বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্র বাংলা প্রকাশনা জগতে খুব কমই হয়েছে।

বাহান্ন

আনন্দবাজার পত্রিকার যে বই-সমালোচনার পাতা, তাতে কয়েক বছর আগেও ছিল প.ব.-র টুকরো খবরের কলাম। মানতেই হবে কলামটি ছিল বেশ জনপ্রিয়। লিটল ম্যাগাজিনের হালহদিশ, কবিতা পাঠ, আলোচনা, কখনও-বা সংস্কৃতি জগতের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরস সংবাদে ওই টুকরো খবর হয়ে উঠত টেলিল পাগড়ানো তর্কের বিষয়। কলামটির একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল প.ব.-র গদ্যশৈলী। যাতে 'অপিচ', 'কদাপি'র মতো শব্দ চমৎকার খেলানো থাকত চলিত গদ্যের ভিতর। ওই ভাষার মুনশিয়ানাতেও কলমটি জনপ্রিয় হয়েছিল।

কিন্তু আমপাঠকের মনে কৌতূহল ছিল, প.ব.-টি কে? ছোট-ছোট পত্রিকার সম্পাদকেরা অবশ্য বিলক্ষণ জানতেন প.ব. হলেন পার্থ বসু। তাই কোনও পত্রিকা বেরোলে কিংবা সাহিত্যানুষ্ঠান হলে তাঁরা আগে খবর দিতেন পার্থদাকে।

টুকরো খবর ছাড়াও পার্থ দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছিল আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়র 'আনন্দমেলা' বিভাগটির। বড় সম্পাদকদের মতো পার্থও ওই পাতায় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের লেখা ছাপার পাশাপাশি নতুনদেরও সুযোগ দিয়েছিল। সেই নতুনদের অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। পার্থর সম্পাদনায় 'আনন্দমেলা'র পাতাটিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। পাঠকদের প্রতিক্রিয়া দেখে আমরা তা বুঝতে পারতাম।

পার্থ ছিল ব্রাহ্মসমাজের মানুষ। সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে সে অবাধে বিচরণ করত। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও যেমন সে তিনটি বই লিখেছে, তেমনই তিনটি উপন্যাসও লিখেছে। তার প্রবন্ধের বই, উপন্যাস আমরা আনন্দ থেকে প্রকাশ করেছি। সব ধরনের লেখাই পার্থ লিখতে পারত। এটা ছিল তার বড় গুণ। সত্যজিৎ রায়-বিজয়া রায়েরও খুব কাছের মানুষ ছিল পার্থ। আমি যখন সত্যজিৎবাবুকে 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' করার প্রস্তাব দিই, তিনি বলেছিলেন যুগ্ম সম্পাদনায় পার্থ থাকলে রাজি আছেন। সেই কাজে পার্থ প্রচুর পরিশ্রম করেছিল। সত্যজিৎবাবুকে সব দেখিয়ে, তাঁকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে, তৈরি করে দিয়েছিল পাণ্ডুলিপি। অনেকেই জানেন না, বিভূষা রায়ের স্মৃতিকথা 'আমাদের কথা' যা 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হয় এবং পরে আনন্দ পাবলিশার্স বই করে, তার সম্পাদনার কাজটি পার্থ তৈরি করেছিল প্রচুর পরিশ্রম ও নিষ্ঠায়।

আনন্দবাজারে যোগ দেওয়ার আগে পার্থ ছিল শান্তিনিকেতনের 'পাঠভবন' স্কুলের অস্থায়ী শিক্ষক। সেই সময় 'সোহিনী' নামের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকত সে। শান্তিনিকেতনের সেই ভাড়াবাড়ি থেকে লেখা তার চিঠি আছে আমার কাছে:

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

এখানে এসেছি পুজোর শেষ দিকে, আপাতত অনিবার্য কারণে আটকা পড়ে আছি।

ভাগ্যক্রমে গ্রন্থস্তুলো নিয়ে এসেছিলাম। সেগুলো ধীরেসুস্থে দেখে ফেরত পাঠাচ্ছি। দুটো ফর্মার হেডিঙগুলো বসেনি (৩২ ও ৩৩) আর ৩৩ নং ফর্মার পৃষ্ঠা সংখ্যাও দেওয়া নেই। আপনি একটু দেখে দেবেন।...

আপনাকে ও অন্যান্য সকলকে বিজয়ার প্রীতি নমস্কার। সমরকে শুভেচ্ছা। এখানে বেশ ঠান্ডা পড়েছে, আবহাওয়া পরিচ্ছন্ন ও শান্তিপূর্ণ। নমস্কারান্তে

পার্থ

৪/১১

পার্থর চিঠিতে সালের উল্লেখ থাকত না। ফলে সালটা এত বছর বাদে লেখা মুশকিল। তবে এই লেখায় পার্থর দু'টো চিঠি তুলে দিলাম। একটি সে লিখেছিল আমাকে, অন্যটি অভীককুমার সরকারকে। এই চিঠি দু'টোর একটায় সাল লেখা নেই, তবু এতে বোঝা যাবে পার্থর মানসিকতাকে। যে-মানসিকতার কথা আমি নিজের ভাষায় অত নির্মুক্তভাবে ফোটাতে পারব না। এই দু'টো চিঠিও শান্তিনিকেতন থেকেই লেখা। শান্তিনিকেতন ছাড়া পার্থর ভালবাসার জায়গা। ওখানে কাজ ছাড়াও সে থাকতে পছন্দ করত। বোধহয় ওই পরিবেশ পার্থকে তৃপ্তি দিত। চিঠি দু'টি এরকম:

'সোহিনী'
শান্তিনিকেতন
734235
শ্রীচরণেষু বাবলা,

মাঝখানে কলকাতায় ফিরে আপনাদের শোক সংবাদ শুনলাম। পারলৌকিক কৃত্যের একটি চিঠিও পেয়েছিলাম। একজন সমবাথীর সমবেদনা জানাই। রমেনকেও জানাবেন। আমার খুব অল্পবয়সে যে পিতৃবিয়োগ হয়েছিল সেই কথা মনে পড়ে এসব সময়ে।

গত 16/1 তারিখে এখানে এসেছি। সেই 'গায়ক রবীন্দ্রনাথ' বইটি শেষ করার মানসে। বহুত উপকরণ পেয়েছি। অনেক বেশি ঘটনা। আপনি যে প্রেস-কপি তৈরি করে দিয়েছিলেন, তারপরে পৃষ্ঠা যোগ করে নতুন তথ্যগুলি প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার সঙ্গে সংযোজন করে দিচ্ছি। এই সপ্তাহে এখানে পাঁচদিনব্যাপী ছুটিতে 'রবীন্দ্রভবন' বন্ধ থাকায় কিছু অসুবিধে হলা প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিত লেখা চলেছিলা।

সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে অবাধে বিচরণ করতেন পার্থ বসু

ছুটিও ফুরিয়ে এসেছে। এবং টাকাপয়সাও। এ মাসে তো কলকাতা এবং এখানে, দু'জায়গায় সংসার চালাতে হয়েছে। এতসব কষ্ট স্বীকার করে এখন লেখাটিকে ভদ্রস্থ এবং কৌতূহলোদ্দীপক করে সম্পূর্ণ করতে পারলেই মুক্তি। আশা করছি, আগামী 1/2 তারিখের মধ্যে পারব। ব্রৈনিই আমার ফেরার কথা। অফিসের ছুটি ওই তারিখ তক্ নেওয়া আছে। গানের আসর, ক্রিকেট খবর সবই বাদ পড়েছে। কলকাতায় ফিরেও কিছু কাজ বাকী থাকবে। পরে, হয়তো দিন সাতেকের মত আবার এখানে আসতে হতে পারে। আপনি একটু ভেবে রাখবেন (1) মে মাসে ১২৫তম জন্মোৎসবে যদি প্রকাশ করতে হয় তবে কবে নাগাদ বইটা শেষ করে দিয়ে দিতে হবেঃ (2) হস্তাক্ষানেকের জন্য যদি আবার আসতে হয় তাহলে প্রকাশকের তরফে কোনও আর্থিক সাহায্য পাওয়া সম্ভব কিনা? এ চিঠি পাবার সময় বইমেলা নিয়ে আপনি ভীষণ ব্যস্ত। তবু আপনাকে সব খবর জানিয়ে চিঠি লিখলাম। আমার মেলার প্রবেশের কার্ড থাকবে তো? আশাকরি, এখন কুশল।

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে। 25/1।— পার্থ

এরপর সে লিখল:

'পূর্বশ্রী'
শান্তিনিকেতন

অভীকবাবু,

আপনাদের পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে সার্থক। আমি দূরে বসে যে ধরনের খবর পাচ্ছি তাতে সম্পূর্ণ সাধুবাদ আপনাদের প্রাপ্য। আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে, অরূপবাবুকে জানাই। এই সঙ্গে বাদলবাবুর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

এখানে বহুজন চিনেছেন। যাঁদের একজন বই কেনার অভ্যাস নেই, তাঁরাও সংগ্রহ করছেন। এটাই তো প্রমাণিত হল যে কিছু শক্তায় পেলে পাঠকের অভাব হয় না এখনও এদেশে। সুকুমার রায়ের ছন্দ রুচি বাঙ্ক আপনাদের সৌজন্যে কত দূরবর্তী প্রদেশে পৌঁছল এ ভেবেই বিস্ময় লাগে।

আমি এখানে মাস তিনেকের জন্য এসেছিলাম— মাস চারেক টেনেছে। তারপর আর দরখাস্ত করিনি। সুতরাং গ্রীষ্মাবকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমারও এখানকার মেয়াদ ঘুচল। এখানেও 'আনন্দবাজার' পড়েছি; কী অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আপনারা চলেছেন খবর পড়ে কেউ বুঝবেন না। চিরকালই আপনাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সংঘাত বেধেছে— এখনও সেই দুঃখজনক ইতিহ্য বহন করে চলেছেন। 'SUNDAY' এখানে দুর্লভ, তবে স্টেশনে গিয়ে একসঙ্গে দু-তিন সপ্তাহেরটা কিনে এনেছি। বড় ভাল পত্রিকা!

আবার কলকাতায় সত্তবত 'পুনর্মুষিকো ভব'। তখন হয়তো আবার আপনাদের শরণাপন্ন হতে হবে। আমার কথা একটু ভাববেন তো?

আমি কলকাতায় যাচ্ছি। তারপর কিছু লেখাপড়ার কাজে কিছুদিনের জন্য এখানে ফিরব ১০/১১ তারিখে। ইতিমধ্যে আপনাদের সঙ্গে কথা বললে ভাল লাগত। নমস্কারান্তে।

25/5/76
—পার্থ বসু

রায় পরিবারের সঙ্গে পার্থর সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি। সত্যজিৎ রায়-বিজয়া রায় খুব ভরসা করতেন পার্থর উপর। পাঠভবনে পড়ার সময় সন্দীপ রায় ছিলেন পার্থর ছাত্র। আনন্দবাজারে যোগ দেওয়ার পরও পার্থ নিয়মিত সন্দীপকে পড়াতে যেত। এমনকী, সন্দীপের ছেলে সৌরদীপও ছিল পার্থর ছাত্র। আর এভাবেই গৃহশিক্ষকতার মাধ্যমে সাংবাদিক হয়েও পার্থ নিজের মাস্টারমশাই সত্তাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। পার্থ বিয়ে করেনি। ভাইয়ের সংসারে থাকত। সেই ভাইয়ের বউও অল্প বয়সে ক্যান্সারে মারা যায়। ঠোঁটের হাসি ছিল পার্থর ট্রেডমার্ক। নিচু গলায় রসিকতা করত। সেই রসিকতা দিয়ে চেনা যেত পার্থর বৈদগ্ধ, রুচিবোধ। কারও মনে আঘাত দিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে তাকে কখনও দেখিনি। এই কয়েক বছর আগে আমি আর পার্থ একসঙ্গে বসে সন্দীপের 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' দেখলাম। তখনও দেখলাম পার্থ সুস্থ। দিব্যি হাসিমুখি। হঠাৎ খবর পেলাম পার্থ অমন হাসতে-হাসতেই মারা গিয়েছে। কোনও চিকিৎসার সুযোগ সে কাউকে দেয়নি। *(ক্রমশ)*

প্রকাশিত

স্বীকারোক্তি

প্রচ্ছদকাহিনি

রাগ, দুঃখ, আক্ষেপ, কষ্ট বা আনন্দ— মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা অব্যক্ত অনুভূতি শেয়ার করলেন সানন্দার পাঠকরা।

রান্না
বাচ্চাদের মেনু

সৌন্দর্য
পায়ের যত্ন

পার্শ্বরচনা
স্ট্রেস ও ট্রমা ম্যানেজমেন্ট

অন্দরসাজ
অভিজাত অন্দরমহল

স্বাস্থ্য
ফাইব্রয়েডের নতুন চিকিৎসা

ফ্যাশন
হাতে বোনা মোটা সুতির শাড়িতে ইন্ডিগো রঙের ছোঁয়া। অন্য স্বাদের বিশেষ ফ্যাশন ফিচার।

১৫ নভেম্বর ২০১৫

সানন্দা

www.sananda.in

আনন্দ পুস্তক বিপণিতে পাওয়া যায়।

ফেসবুকে আমাদের ফলো করতে ক্লিক করুন /pages/sananda

পূর্বানুবৃত্তি: দীপেনের বক্তব্য, গলার গায়ে সিন্থেটিক অ্যাডহেসিভের ফোঁটা দেখে সে বুঝেছিল, সম্প্রতি ওটা খুলে আবার লাগানো হয়েছে। প্রমাণ লোপের জন্য রাজা বৈরাগীর নির্দেশে বৃন্দা সেনকে খুন করে রাজার লোকজন। সিদ্ধেশ্বরের নিয়ে আসা প্যাকেটে ছিল একটা সিডি, যাতে ছিল দেশের গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাবিষয়ক গোপন নথি। এই সিডি নিয়ে ঝামেলার জেরে রাজার লোকের হাতে খুন হল সিদ্ধেশ্বর। কবিয়ার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী সে সন্তানসম্ভবা ছিল। বৃন্দার মাসি আর মেসো সেজেছিলেন হৃষীকেশ ও রত্নমঞ্জী। আর ছাগলদাড়ি, চোয়াড়ে গুন্ডা সেজেছিল দীপেন। বৃন্দার মাসি-মেসোকে লেখা কমলা নস্করের নকল চিঠিটা টাইপ করিয়েছিল দীপেনই।

শে খ র মু খো পা ধ্যা য়

২৮

দীপেন বলে যেতে লাগল, "ইন্সপেক্টর পাত্র টাইপরাইটার খুঁজে পেলেন না ঠিকই, কিন্তু ওঁর মাধ্যমে মল্লিকবাড়িতে খবর চলে গেল যে, বৃন্দা সেনের মাসি-মেসো শহরে এসেছেন! সেদিনই শেষ বিকেলে, হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তায় গোপাল মল্লিকের গাড়ি এসে দাঁড়াতে দেখেন হৃষীদা। গাড়িটা মিনিট দুই সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই চলে যায়। দূর থেকে হলেও, বন্ধুর গাড়ির নম্বর পড়তে অসুবিধে হয়নি হৃষীদার। গোপাল মল্লিক আমাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেন! হৃষীদাকে বলাই ছিল, ওঁর পরিচিত কোনও মানুষকে যদি উনি হোটেলের ভিতরে-বাইরে কোথাও দেখেন, সঙ্গে-সঙ্গে যেন আমায় ফোন করেন। বৃন্দা সেনের মাসি-মেসোকে গোপাল মল্লিক যে বেঁচে থাকতে দিতেন না, সেটা আশা করি বলে দেওয়ার দরকার নেই! এরপর সিনেমা হলের বাইরে থেকে আমার কেটে পড়া এবং সিনেমা হলের টয়লেটে বেশ বদলে হৃষীদা ও দময়ন্তীদির একে-একে হল থেকে বেরিয়ে যাওয়া তো অতি সহজ ব্যাপার ছিল! শো ভাঙার কিছুক্ষণ আগেই, আলাদা-আলাদা দুই অপরিচিত নারী ও পুরুষকে হাতে বা বগলে ছোট প্যাকেট চেপে আর পাঁচজনের মতো বিরক্ত মুখে হল থেকে বেরোতে দেখে পুলিশের

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল! তার প্রতাপে প্রকৃতি যেন বেবাক স্তব্ধ হয়ে গেল! বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে আমি জানতে চাইলাম, "কে খুন করল তবে ওকে? নাকি এটা খুনই নয়, আত্মহত্যা?"

কনস্টেবলের কোনও সন্দেহ হয়নি!

"ঘটনাগুলোর সঙ্গে গোপাল মল্লিকের কোনও যোগ আছে, এটা প্রমাণ হল। আমার থিওরি যে বেশির ভাগটাই বাস্তবের কাছাকাছি, সেটা বুঝলাম। কিন্তু গোপাল মল্লিকের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ তখনও পাইনি। সেটা পাওয়ার জন্য শ্মশানে বৃন্দা সেনের মৃতদেহ এবং তার হাতের মুঠোয় ইউনিকর্নের নোটপ্যাডের ছেঁড়া কাগজটা আবিষ্কার করা অবধি অপেক্ষা করতে হল।

"ডিফেন্সের সিডি সম্পর্কে আমি একটা থিওরি মনে-মনে গড়ে তুলেছিলাম। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, গোপাল মল্লিকই কবিয়ার সেই প্রেমিক, যার সন্তান রুবিয়ার গর্ভে বেড়ে উঠতে শুরু করেছিল, তবে পরপর ঘটনাগুলো অনুমান করতে এবং যুক্তিগুলো সাজাতে অসুবিধে হয় না। সিঙ্কেশ্বর দিব্যি বেঁচে দিব্যি কথায়-কথায় গোপালকে জানায় যে, তার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছিল। খুব খুশির কথা যে, সেই বন্ধুও অপরাধের দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্র জীবনযাপন করছে। বন্ধু তাকে একটা প্যাকেট দিয়েছিল, পাঁচ একজনকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু অবাক কাণ্ড! সেই প্যাকেট নিতে নির্দিষ্ট স্থানে কেউ আসেনি। গোপাল ওকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, সেই বন্ধু সিঙ্কেশ্বরের কলকাতার ঠিকানা যখন জানে, তখন তার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। বাইরে গোপাল সৎ পরামর্শই দিলেন। কিন্তু মনে-মনে কৌতূহলী হয়ে পড়লেন প্যাকেটটা সম্পর্কে। সন্ধে কি সিঙ্কেশ্বরকে কোনও অজুহাতে কয়েক ঘণ্টার জন্য বাইরে কাজে পাঠিয়ে দিলে, গোপাল গেলেন তাঁরই বাড়িতে, রুবিয়ার কাছে। প্যাকেটটা সামনেই টেবিলের উপর রাখা ছিল। গোপাল সাবধানে প্যাকেটটা খুললেন। একলাফে সেখানে হঠ্ঠাদ্ভরের ছাপমারা সিডিটার গুরুত্ব বুঝলেন। রুবিয়া সানন্দে পাঁচশো টাকার নোটটা আত্মসাৎ করল আর তার অলক্ষ্যে গোপাল পকেটস্থ করলেন সিডি-টা। বিবেক ও�thার ধমকে-চমকে সিঙ্কেশ্বরের কাছ থেকে সিডি-টা আদায় করতে না পেরে যোগাযোগ করল কলকাতায় রাজা বৈরাগীর দলের সঙ্গে। দলের নেটওয়ার্ক মারফত সেই খবর এসে পৌঁছল রাজার কাছে। রাজা কাজটা নিল। নেটওয়ার্কে ফিরতি খবর পাঠিয়ে দিল যে, সিডি যদি না পাওয়া যায় তো, সিঙ্কেশ্বরও যেন বেঁচে না থাকে! গোপাল অনুমত ভৃত্য সিঙ্কেশ্বর বায়েনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে দিলেন। সিঙ্কেশ্বর যথারীতি সিডিটা ফেরত দিতে না পেরে খুন হয়ে গেল!

সিডিটা হাতে আসার পর, গোপালের কাছে সবচেয়ে জরুরি কাজ ছিল সেটা কিছুদিন লুকিয়ে রাখা। তিনি সিডিটা লুকোনোর একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করে ফেললেন। সঙ্জীব কখনও ঘর তালাবন্ধ করে বেরোয় না। গোপাল তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিলেন। সঙ্জীবের স্টুডিয়োর একলাফে পড়ে ছিল বাতিল অকেজো একটা কম্পিউটার। অচল কম্পিউটারের সিডি ড্রাইভ থেকে ট্রে খুলে, চোরাই সিডি সমেত ট্রে-টা আবার যথাস্থানে লুকিয়ে দিলেন। পরদিন কমলা নিখোঁজ হয়ে গেল এবং তার ফলশ্রুতিতে জগত্তারিণীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করল। খবর পেয়ে বলরাম ছুটে এলেন দিল্লি থেকে। বাড়ি বইতে পুলিশি পাহারা চতুর্গুণ হল। কোনও গ্যাং-ই আর মল্লিকবাড়ির ধারে-কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না। কয়েক দিন পরে অরুণিমা বাড়িতে জানাল যে, কমলার খোঁজ করার জন্য সে একজন বেসরকারি গোয়েন্দা নিয়োগ করতে চায়। গোপাল ভাবতে চেষ্টা করলেন, নতুন টিকটিকিটার জন্য কৌশল কিছু পরিবর্তন করা দরকার কি না। ওঁর মাথায় একটা মতলব এল, জব্বর মতলব! সঙ্জীবের ঘরের অচল কম্পিউটারের মধ্যে থেকে সিডি-টা সরিয়ে নিলেন গোপাল। সযত্নে বুঝে নিজের অফিস ঘরেই সিডি-টা রাখি করলেন। কপিটা নিজের কাছে রেখে, অরিজিনালটা রেখে এলেন রুবিয়ার ঘরে। যেদিন বেসরকারি গোয়েন্দা এল, সেদিনই রাতে খুন হল সিঙ্কেশ্বর। পরদিন সকালে রুবিয়া, সিডি উদ্ধার হল ওদের ঘর থেকে। সকলে জানল, ডিফেন্সের সিডি ফিরে গেল ডিফেন্সে। গোপাল খুশি হলেন এই ভেবে যে, কপি করা সিডি-টা সময়-সুযোগমতো বেচে যা পাওয়া যাবে, তার ভাগ কাউকে দিতে হবে না। নিজেকে শুধু একবার কোনও গতিকে সামনে আসতে হবে। হাজার হোক, কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার! ঝুঁকি তো নিতেই হবে!" দীপেন কয়েক মুহূর্তের বিরাম নিল।

এই সুযোগে জ্বষীদা একটা ব্যাপার একটু পরিষ্কার করে জেনে নিতে চাইলেন, "আচ্ছা, গোপাল রুবিয়াকে খুন করল কেন? রুবিয়া যদি পুলিশকে এই ব্যাপারে কিছু বলে ফেলে এই ভয়ে?"

"না। রুবিয়া কিছুই বলতে পারত না। গোপালকে সিডিটা নিতে বা ফেরত দিতে সে দেখেনি। সেই কাজটা গোপাল কৌশলে তার অগোচরেই করেছিলেন। আসলে গোপাল মল্লিক তো খুন করেননি রুবিয়াকে!"

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল! তার প্রতাপে প্রকৃতি যেন বেবাক স্তব্ধ হয়ে গেল! বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে আমি জানতে চাইলাম, "কে খুন করল তবে ওকে? নাকি এটা খুনই নয়, আত্মহত্যা?"

"খুন, ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত খুন! খুনি, বৃন্দা সেন। মল্লিকবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগেই ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন। ওঁর প্রত্যাশামতোই রুবিয়া শেষপর্যন্ত সেই ফাঁদে পা দিল। রুবিয়ার উপর বৃন্দার রাগ কী কারণে, তা পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না। রুবিয়া একবার বেরাড়া রকমের অ্যাসিডিটি আক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পর বৃন্দার মনে মতলবটা এল। বৃন্দা সঙ্জীবের ঘর থেকে অ্যাসিসেড একটা শিশি হাতালেন। প্রায় ভর্তি শিশিটার অ্যাসিডের কিছুটা ঢেলে রাখলেন অন্য একটা খালি শিশিতে। দ্বিতীয় শিশিটা প্রথমে কমলাবেশী বৃন্দার শাড়ির আঁচলের আড়ালে চলে গেল ওর ঘরে। সেখানে বিষ ঢেলিই দিল। প্রয়োজনের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশিই ঢেলে দিলেন শিশিতে। নিজে মল্লিকবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে রুবিয়ার বাড়ি গিয়ে তাকে দিয়ে এলেন অ্যাসিডও। বন্ধুর মতো বললেন, প্রয়োজনমতো যেন সে ওটা ব্যবহার করে। বিষের আবেশে জ্ঞান হারাতে বসে, মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে যাওয়ার আগে, রুবিয়ার মনে পড়ল এই ওষুধ এনে দিয়েছিল কমলা। তাই মৃত্যুর আগে কমলার নামটাই বেরিয়ে এল তার মুখে!"

"তারপর কী হল দীপেন্দ্র? অরিজিনাল সিডিটা তো যথাস্থানে ডিফেন্সের ঘরে ফিরে গেল। কপিটা নিয়ে গোপাল কী করল?" ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে জ্বষীদা জিজ্ঞেস করলেন।

"উনি ওটা লুকিয়ে রাখলেন বন্ধুর সিগারেট কেসে!"

"বন্ধুর সিগারেট কেসে?" জ্বষীদা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

বিস্মিত আমরা সকলেই! আমার মনে পড়ে গেল, জ্বষীদার সিগারেট কেসের প্রতি দীপেনের অস্বাভাবিক দুর্বলতার কথা।

"আপনার সিগারেট কেস, স্যর, যাধিবা। আপনি স্মোক করেন না। মল্লিকবাড়ি কেউ স্মোক করে না। ওই সিগারেট কেসটার ব্যবহার অতি নগণ্য। সবসময় নাড়াচাড়া হওয়ার আশঙ্কা নেই! বাড়িতে ঘুমপাই অতিথি এলেই শুধুমাত্র আপনি ওটা থেকে সিগারেট অফার করেন। চোখের সামনে

অথচ চোখের আড়ালে! পাতলা সিডি-টা লুকোনোর এমন জায়গা ক'টা পাবেন?"

"আমার সিগারেট কেস!" হৃষীদা অস্ফুটে বললেন।

আমার মতোই দীপেনও দুঃখিত চোখে হৃষীদাকে দেখছিল। লোকটাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

"প্রথম যেদিন আপনার ঘরে যাই, সেদিনই ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েছিল। সিগারেট কেসটার ঢাকনার ভিতরের দিকে নরম চামড়ার একটা প্যাডিং চারপাশে সরু চামড়ার ফিতে দিয়ে ব্র্যান্ডেড স্টিচ স্টাইলে সেলাই করে আটকানো ছিল। সিগারেট বের করতে গিয়ে, একদিকের সেলাই দেখে আমার খটকা লাগল। জল, ঘাম ইত্যাদি না লাগলে, যত্নে থাকলে, সাধারণভাবে ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গে চামড়ার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। ঢাকনার ভিতরের বাকি অংশের মতোই চকচকে তিন দিকের ফিতে এই তত্ত্বই প্রমাণ করে। কিন্তু অন্য একদিকের ফিতে তুলনায় অনুজ্জ্বল এবং কর্কশ! সুতরাং সেদিকে চোখ গেল। তখন আরও দেখলাম, ফিতের শেষে, কোণের দিকে পিঁট শক্ত করে বাঁধা হলেও, বাকি তিন কোণের তিনটে পিঁটের মতো সুচারু নয়, কেমন যেন এলোমেলো করে বাঁধা। নিঃসন্দেহে সেদিকের ফিতে খুলে আবার লাগানো হয়েছে। কিন্তু উলটো করে, অনক্ষ, অপটু হাতে অন্য কেউ এটা করেছে! সঙ্গে-সঙ্গে মনে প্রশ্ন জেগে উঠল, কেন?

"সিগারেট কেসটার ঢাকনার ভিতরের নরম চামড়ার প্যাডিংটা আঙুল দিয়ে বারকয়েক চাপ দিতে আঙুলে শক্ত কিছু একটা অনুভব করলাম। অর্থাৎ প্যাডিংয়ের নিচে শক্ত কিছু একটা বস্তু আছে। যেহেতু গোয়েন্দা, তাই সবেতেই নাক গলানোর অভ্যেস! বস্তুটা দেখার উদ্দেশ্যে একটা মতলব ভাজলাম। দ্বিতীয় এক কাপ চা পানের আগ্রহ প্রকাশ করলাম। হৃষীদা চা বানাতে গেলেন। অনিচ্ছুক বিড়ুকে আমি দরজার বাইরে পাহারায় পাঠালাম। মিনিটদশেক পরে হৃষীদা চা নিয়ে ফিরে এলেন। তার মধ্যে আমার যা দেখার, দেখে নিয়েছি। সন্দেহজনক ফিতেটা খুলতেই চোখে পড়ল একটা সিডি! তখনও সিদ্ধেশ্বরের ঘর থেকে সিডি উদ্ধার হয়নি। রক্ষা দপ্তরের নথিটা যে আসলে গোপন তথ্যসংবলিত একটা সিডি, সেটাও খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। ফলে আমার মতো বাইরের লোকের পক্ষে সিগারেট কেসের ডালায় প্যাডিংয়ের নিচে লুকোনো সিডির গুরুত্ব বুঝতে পারা সম্ভব ছিল না। আমি তখন ভেবেছিলাম অন্য কথা, সিগারেট কেসের মধ্যে সিডি কেন? জানা দরকার যে, সিডি-তাতে কী আছে! কমলা রহস্যের কোনও সূত্র কি ওতে থাকতে পারে? আমি সিডি-টা বের করে নিলাম। ঘরে ক্যাসেট-সিডি যেখানে রাখা থাকে, সেই ক্যাবিনেটের একেবারে ভিতরের দিক থেকে একই ব্র্যান্ডের একই রকম দেখতে একটা সিডি এনে সেটা ঢালান করে দিলাম সিগারেট কেসের ঢাকনার ভিতরের প্যাডিংয়ের নিচে। হৃষীদা চা নিয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন আসল সিডি আমার পকেটে আর অন্য সিডিসহ সিগারেট কেস যথাপূর্বং টেবিলের উপর! আমার ইচ্ছে ছিল, পরদিন সকালে ইউনিকর্নের অফিসে একবার গিয়ে সেখানকার কম্পিউটারে সিডিটা চালিয়ে দেখে নেব। তার সুযোগ পেলাম না। তোর বেলায় মিস্টার পারের ফোন এল, সিদ্ধেশ্বর বায়েন খুন হয়েছে! সিডিটা পকেটে নিয়েই বেরোলাম। রুবিয়ার মৃত্যুর পর ওর ঘর থেকে ডিফেন্সের সিডি-টা পেয়ে আমার ঠিক নজুল! বুঝলাম, বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে আমার পকেটের সিডিটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এসব যখন ভাবছি, তখনই আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বরলাম মল্লিক ওঁর অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। অফিসে আছে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার। এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়! এ বাড়ি ছাড়ার আগে আমার পকেটের সিডিটা কিসের, ডিফেন্সের সিডিটার কপি কি না, এসব দেখে-শুনে নিয়ে যথাস্থানে ফেরত দেওয়া কর্তব্য।"

"বরলাম মল্লিকের কম্পিউটারে সিডি-টা চালিয়ে কী দেখলেন?" ইন্সপেক্টর পাত্র কড়া গলায় জানতে চাইলেন।

"যা দেখলাম, তাতে বুঝলাম যে, ওটা ডিফেন্সের সিডিটার কপি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।"

"দেখে নিয়ে সেটা আপনি আবার হাতছাড়া করলেন?" ইন্সপেক্টর পাত্রের কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ও বিস্ময়ের মিশ্রণ সমান-সমান!

"করলাম বই কী! ডিফেন্সের নথি ফিরিয়ে দেওয়ার চমৎকার একটা চান্সে যে সেটা দ্বিতীয় বার চুরি করল, সেই গুপ্ত অপরাধীটিকে পাকড়াও করতে হবে তো? কাণ্ডটা আমি যে বুঝে ফেলেছি, সেটা তো তাকে বুঝতে দেওয়া চলবে না! তাকে ধরতে হবে হাতেনাতে! তবে হ্যাঁ... সিডি-টা সিগারেট কেসে আবার চালান করে দেওয়ার আগে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। ওটা প্রথমে কম্পিউটারে কপি করলাম। তারপর জায়গায়-জায়গায় ডকুমেন্টটা বদলে দিলাম। কিছু-কিছু অংশ বেছে উড়িয়ে দিলাম।

দীপেনের নির্দেশে আমাদের ইন্সপেক্টর পাত্র, মধ্যযুগীয় সেনাপতি হরি বর্মার চালে অপরাধীর দিকে এগিয়ে গেলেন! হৃষীকেশ চৌধুরী জমিদারি মেজাজে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন, বাধা দেওয়ার চেষ্টাই করলেন না।

মাঝে-মাঝে বেশ কয়েক লাইন ডিলিট করে, যা মনে এল তা-ই টাইপ করলাম। দেখে মনে হতে পারে, কোনও সাঙ্কেতিক সূত্র-টুত্র হবে! বার ডায়াগ্রামের বার কমিয়ে-বাড়িয়ে, পাই চার্টে পাই-পয়সার হিসেব বদলে, কার্ডের কার্ডিনাল দৃষ্টিনন্দন করে ছবিগুলোর চেহারাই বদলে দিয়েছি! শেষের দিকে অবশ্য সময়ের অভাবে কাজে একটু অযত্ন হয়েছিল। বলরামবাবুর অফিসের দরজার বাইরে নয়ন অৈর্য হয়ে উঠছিল। তার ডাকে সেখানে এসে জড়ো হয়েছিলেন অরুণিমা এবং গোপাল মল্লিক।

শেষমেশ যখন বলরাম মল্লিক ফিরে এসে নিজে দরজা ধাক্কাতে শুরু করলেন, তখন বাকি অংশটা শ্রেফ কেটে উড়িয়ে দিলাম! নতুন ফাইলটা জলবি কপি করলাম একই ব্র্যান্ডের একটি ব্ল্যাঙ্ক সিডিতে। সেটা কম্পিউটার থেকে বের করে ঢোকালাম প্যান্টের ডান পকেটে। আর মূল সিডি-টা ভেঙে দু' টুকরো করে ঢুকিয়ে রাখলাম প্যান্টের বাঁ-পকেটে। তারপর কম্পিউটার থেকে ফাইলটা ডিলিট করে বেরিয়ে এলাম!"

আমরা অবাক হয়ে শুনলাম। মিস্টার পাত্র ফেটে পড়লেন তাঁর পেটেন্ট হাসিতে। শুধু হৃষীকা ধমথমে মুখে বললেন, "গোপাল যত বড় অপরাধীই হোক, আমার ক্ষেত্রে এ ধরনের আচরণ আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না! স্কুল থেকে আমরা দু'জন ছিলাম হরিহরাত্মা বন্ধু! সে আমার সিগারেট কেসে চোরাই সিডি লুকোতে গেল! একবার ভেবে দেখল না যে, এতে বন্ধুর কত ক্ষতি হতে পারে!"

ইন্সপেক্টর পাত্র তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "যাকগে, মিস্টার ঠাকুর, আপনার তন্ত্র এখনও শেষ হয়নি! এদিকে বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধেও শেষ হতে চলল! তাড়াতাড়ি করুন!"

"বলরাম মল্লিকের কম্পিউটার থেকে তড়িঘড়ি আমার ডক্টরাল থিসিসখানা ডিলিট করতেই, অফিস ঘরে প্রবেশ করলেন বেশ কয়েকজন উর্দিহীন মানুষ। বলরামবাবু তো রেগে আগুন। ঘাড় ধরে আমাকে গঙ্গপতি নিবাসের বাইরে ছুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন! গোপাল মল্লিক বলে নিলেন, গোয়েন্দা ছোঁড়াটা বাবার কম্পিউটারে কোনও স্ক্যান্ডাল বা, স্ক্যাম গোছের কিছুর হদিস পেয়েছে। তাই দাবাকে বেইজ্জত করার সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না! গম্ভীরভাবে জানালেন যে, উনি চান তন্ত্র চলুক। উনি ভালবেই পাচ্ছেন্নি, আমি আসলে কিসের হদিস পেয়েছি! অরুণিমা এদিকে ওয়াকিং বিভাক্ত! এবং, কমলা-অন্তর্ধান বিষয়ে কোনও একটা ষড়যন্ত্রের আঁচ আমি পেয়েছি এবং বলরাম মল্লিকের অফিসঘরে ভিতর থেকে ছড়কো এঁটে তারই তত্ত্বতালাশ করছিলাম!" দীপেন বলে চলল, "সিডি আমার পকেটে থেকে গেল চলে গেল সিগারেট কেসের গুপ্ত এবং আপাতবিশ্বস্ত ঘোগপিতা। এরপর শ্মশানে বৃদ্ধা সেনের লাশ, শ্মশানবন্ধু এক গোয়েন্দার ত্বরাগমন গঙ্গপতি নিবাসে ন্য সেপ্টার-এর ঘোঁজে। অতঃপর শিল্পী সঙ্জীব ও হৃষীকেশ চৌধুরীর সমভিব্যাহারে মন্দিরে গমন। রাজগঞ্জ টেনে বের করলাম দাদার পেট থেকে। সঙ্জীব ও আর সকলে যা দেখার দেখলেন। আমি ফাঁপা গদার একেবারে তলদেশ থেকে খুঁজে পেলাম ভজি করা ম্যারেজ সার্টিফিকেট। জিনিসটা কী, তা আর কেউ না বুঝলেও, গোপাল বুঝেছিলেন। তিনি বুঝলেন যে, এবার খেল খতম! বলশালী লোকটাকে আহত দেখে, আর-একটা মোক্ষম আঘাত করলাম। জানিয়ে দিলাম যে, মৃত্যুর সময়ে কবিয়া গর্ভবতী ছিল! মিস্টার পাত্র যে এই সংবাদের সত্যতা প্রতিপাদন করতে প্রস্তুত, সেটাও জানাতে কসুর করলাম না!

"গোপাল নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন! উনি জীবনে কখনও ডাক্তার দেখাননি। সেদিন আমার মাথামে পেলেন কবিয়ার দেওয়া সার্টিফিকেট। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে কবিয়া নিজেও ওঁকে এ-কথা জানিয়েছিল, উনি তখন বিশ্বাস করেননি। এরপর গোপালের সঙ্গে ওঁর অফিসে যখন দেখা করলাম, তখন উনি প্রায় প্রস্তুত! শুধু একবার দেখতে চাইলেন কবিয়ার পোস্টমর্টেম রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু! মিস্টার পাত্রের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া কপি একটা আমার পকেটেই ছিল! সেটাই দেখালাম। উনি জানতে চাইলেন, সঙ্জীবের বাবার পরিচয় সম্পর্কে আমি কোনও গোয়েন্দাগিরি করেছি কি না। জানালাম, করেছি। এ-ও জানালাম যে, সেই বাপের নাম বলরাম মল্লিক নয়, সজল মিত্র! আর কোনও গুলি-বারুদের প্রয়োজন ছিল না! গোপাল মল্লিক আমার দিকে সোজা তাকিয়ে জানতে চাইলেন, নিজের শক্তি বেচে দেওয়ার অধিকার ওঁর আছে কি না। আমি একবালক ওঁর চোখের দিকে তাকিয়েই উত্তর দিয়েছিলাম, আছে! আমি শুধু আবেদন জানিয়েছিলাম আমার প্রশ্নের উত্তর ওঁকে দিতে হবে। জবাব এসেছিল, সব উত্তর যদি আগামীকাল বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই? জবাব দিয়েছিলাম, চলবে। তারপর আর বনমালী ট্রেডিংয়ের অফিসে বসিনি। আত্মবিশ্বাস দিয়ে পাওয়া ও একই সঙ্গে অনুত্তাপে ভেঙে পড়া লোকটাকে একা থাকতে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

"গোপাল সারা দুপুর আর বিকেল ধরে আমার সব প্রশ্নের উত্তর জড়ো করে সন্ধেয় সেগুলো কুরিয়ারে দিলেন। রাতে রাজা বৈরাগী দীর্ঘদিন পরে দলকে সরাসরি নির্দেশ দিল! তার শেষ নির্দেশ। দলের উপরের কিছু কয়েক জন পুরনো সঙ্গীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে, নিজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে আদেশ জারি করল, গঙ্গপতি নিবাসের গোপাল মল্লিক পরদিন সকাল ছ'টার কিছু পরে গেটের বাইরে বেরোবেন। তাঁর চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দেওয়া হল নিখুঁত! লোকটার বাঁচলে চলবে না। পরদিন সকালে, ছ'টা বাজার ঠিক আধ ঘণ্টা পরে গঙ্গপতি নিবাসের সামনে ২২টা গুলিতে ঝাঁজরা হলেন গোপাল মল্লিক!

"দুপুরে কুরিয়ারের লোক গোয়েন্দার হাতে তুলে দিল হলুদ প্যাকেট। গোয়েন্দা জানত না যে, রাজা বৈরাগী ডায়েরি লিখত! নিজের ডায়েরির নির্বাচিত ছিন্নপত্রাবলি এবং আর কিছু দরকারি কাগজ হলুদ প্যাকেটে ভর্তি করে রাজা তাকে পাঠিয়েছিল। গোয়েন্দার সব প্রশ্নের উত্তর সহিহি ওই ডায়েরির পাতাগুলোতে ছিল! ওতেই ছিল পারিবারিক কুসঙ্কারের উল্লেখ, নিজেকে বীরাঙ্গনা মনে করার কারণ এবং সঙ্জীবকে দত্তক নেন নিলেন, তার ব্যাখ্যা! আরও অনেক কিছু। সব কিছু আমাদের সকলের জানার প্রয়োজন নেই! তাই ডায়েরির পাতার প্রাসঙ্গিক অংশগুলো কেটে কিছু তথ্য কপি করা হল অন্য কাগজে। সেগুলো আর বাকি কাগজপত্র নতুন একটা প্যাকেটে ঢুকিয়ে, বেসরবারি গোয়েন্দা ফোন করল পুলিশের ইন্সপেক্টর উত্তম পাত্রকে। রাজার লেখা ডায়েরির পাতাগুলো রয়ে গেল গোয়েন্দার বাক্তিগত সংগ্রহে! এর পরের ইতিহাসটুকু বর্ণনা করার পরিশ্রম সম্পূর্ণ অনাবশ্যক!"

উপসংহার: মেঘের আড়ালে মেঘনাদ

আমরা কতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম তা জানার জন্য ঘড়ি দেখিনি! কাজেই বলতে পারি না যে, মাঝখানে কি কতটা সময় নিঃশব্দে কেটে গিয়েছিল! ইন্সপেক্টর পাত্র প্রথম নিঃশব্দ ভঙ্গ করে বলেছিলেন, "অবিশ্বাস্য!" আশ্চর্যের বিষয়, ইন্সপেক্টরের বাচনভঙ্গিতে অবিশ্বাস প্রকাশ পেল না!

"হুম," ইন্সপেক্টর পাত্র হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালেন, "এবার উঠতে হবে। মিস্টার চৌধুরী, আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন? কিছুটা রাস্তা একসঙ্গে যাওয়া যেতে পারে।"

"যাব, একটু দাঁড়ান। দুটো খবর এদের দিয়ে যাই।"

হাবীদার কথা শুনে মনে হচ্ছিল কত উতলা, "সে কী ঘটিলা! আপনি এখনই লেন উঠছেন? আপনার তো আর মিস্টার পাত্রের মতো ধানাদারির দায়িত্ব নেই। আমাদের সঙ্গে আর-একটু আড্ডা দিয়ে যান।"

"না, বিজিত। দীপেন্দ্র আজ যা শোনাল, এমন সব ঘটনা আমি যে-বাড়িতে আজ ত্রিশ বছর আছি, তার ছাদের নিচেই ঘটে গেছে, এটা বিশ্বাস করতে এখনও অসুবিধে হচ্ছে। ওর মুখ থেকে কাহিনির সবটা জানার পর বড় বিশ্রি বোধ করছি। মনের মধ্যে কেমন আগাগোড়া এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছি। গজপতি নিবাসে ফিরে, সে বাড়ির অন্ধকারে একটু একা চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে। আজ আর খোশগল্প জমবে না ভাই।"

"খবর দুটো কী?" দীপেন কৌতূহল প্রকাশ করল।

"সামনের রবিবার দময়ন্তীর বাড়িতে আমাদের নতুন নাটকের প্রথম রিহার্সাল। তোমরা এসো। দময়ন্তী নেমন্তন্ন গাটিয়েছে।"

আমি জানতে চাইলাম, "দ্বিতীয় খবরটা কী?"

"অরুণ কাঁনি আগে আমাকে মেল করেছে। একেবারে শেষে এক লাইন লিখেছে, ড. রায় বা কেউ যদি চান তো, ওর মেল আই ডি-টা যেন দিয়ে দেওয়া হয়। ভেবে দেখলাম, 'বা কেউ'দের কাউকে আমি চিনি না। এক থাকে ড. রায়। মনে হল, সেটা বোধ হয় তুহিনের হবে। ই-মেল আই ডি-টা কি তুমি নেবে বিজিত?"

আমার আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও অবাধ্য মুখে বাক্যস্ফূর্তি হল না। যেন সে-মুখের মালিক আমি নই। আমার হাতটাও যেন হাত নয়, যেন একটা যন্ত্রচালিত লম্বা হাতল। সেটা স্রো মোশনে এগিয়ে গিয়ে হাবীদার হাত থেকে নিয়ে এল ই-মেল আই-ডি লেখা কাগজটা।

"চলি," হাবীদা চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগোলেন।

ইন্সপেক্টর পাত্র আগেই উঠে গিয়ে সেখানে ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমার মন আবার একটু খারাপ হয়ে গেল। আজ আড্ডা বেশ জমবে ভেবেছিলাম। আড্ডাটা আরও জমিয়ে দিতাম। হাতে ধরা এই ডট কম-টার প্রেরণায়।

"হাবীদা, ওটা এখানেই রেখে যান।"

দীপেনের বরফশীতল কণ্ঠে আদেশের সুর শুনে চমকে উঠলাম! হাবীদা থমকে দাঁড়িয়েছেন দরজার সামনে। চোখমুখ লাল করে খাঁচায় বন্দি চিতার মতো প্রথমে একবার দেখে নিলেন দরজা আগলে দাঁড়ানো ইন্সপেক্টর পাত্রকে, তারপর তাকালেন দীপেনের দিকে।

"লাভ নেই হাবীদা, আমরা জানি, ওটা আপনার সঙ্গেই আছে। দিয়ে দিন।"

এই 'আমরা'টা, বলাই বাহুল্য, আমাকে বাদ দিয়ে! কারণ, খবিদার সঙ্গে কী ছিল, তার বিন্দুবিসর্গও আমি জানতাম না!

"মিস্টার পাত্র, ওঁর ঝোলায় ছন্নবেশীর কিছু সরঞ্জাম পাবেন, হয়তো একটা বন্দুকও।"

দীপেনের নির্দেশে আমাদের ইন্সপেক্টর পাত্র, মধ্যযুগীয় সেনাপতি হরি বর্মার চালে অপরাধীর দিকে এগিয়ে গেলেন। হাবীদের চৌধুরী জমিদারি মেজাজে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন, বাধা দেওয়ার চেষ্টাই করলেন না।

চোখ কপালে তুলে দেখলাম, ঝোলা থেকে একে-একে বেরোল নকল দাড়ি-গোঁফ, নকল আঁচিল ইত্যাদির সঙ্গে একটা ছোট বন্দুক! আমার ভ্রূ জোড়া মাথার চুলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, যখন দেখলাম, ঝোলা থেকে সবশেষে বেরল, একটা কমপ্যাক্ট ডিস্ক!

"আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে দীপেন্দ্র? আমাকে কাঠগড়ায় তুললে অনেক কথা উঠবে!" হাবীদা তিক্তকণ্ঠে মন্তব্য করলেন।

"উঠবে না হাবীদা। আপনিই বসে কথা তুলবেন না! রাজার গল্পটা আপনি নিজের মুখে আগাগোড়া বিচারকে শোনালে, আপনার অপরাধের

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ প্রথম সংখ্যা

রণজিৎ গুহ, শঙ্খ ঘোষ, অরিন্দম চক্রবর্তী, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, মৈত্রীশ ঘটক, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পরমেশ আচার্য, শুক্লা সান্যাল, পলাশ বরন পাল, অজিত চৌধুরী, অশ্রুকুমার সিকদার, প্রসাদ রঞ্জন রায়, কল্যাণ সরকার, ভবেশ দাস, জগীরঞ্জ মিশ্র, দীপক গোস্বামী, শান্তী ঘোষ, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সেন, মোহিত রায়, সুকুমার সিকদার, শ্রীপর্ণা দত্ত ও অন্যান্য।

ক্রোড়পত্র : (১) লোক ঐতিহ্য ও গোপাল ভাঁড়। (২) রবীন্দ্রনাথ (৩) ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা। ৪০০ সডাক ৫০০

সীমিত সংখ্যক কপি এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

অনুষ্টুপ

বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা

পুঁথিবিষয়ক যুগান্তকারী সংখ্যা

দাম : ৪০০ সডাক ৫০০

সম্পাদক : অনিল আচার্য

অতিথি সম্পাদক

অণিমা মুখোপাধ্যায়

কার্যালয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকাশের পথে

অনুষ্টুপ

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

বিশেষ প্রবন্ধ সংকলন

বিষয় : বাঙালির ইওরোপ চর্চা

অতিথি সম্পাদক

অরিন্দম চক্রবর্তী

সম্পাদক : অনিল আচার্য

দাম : ৫০০ সডাক : ৬০০

অগ্রিম গ্রাহক হলে ৩০০

সডাক ৪০০

কার্যালয়ে গ্রাহক করা হচ্ছে।

পাঠকের অনুরোধে পুনর্মুদ্রিত হল

অনুষ্টুপ

বিশেষ সংগীত সংখ্যা

রাগরাগিণীর শ্রেণিবিভাজন, কবিওয়ালাদের গান, উচ্চাঙ্গসংগীত তখন, এখন ও উত্তর আধুনিক, রাগরাগিণীর ভাব ও রবীন্দ্র গান, তৎসহ বাংলা গানের সামগ্রিক ইতিহাস। প্রবন্ধ: অরিন্দম চক্রবর্তী সহ ও অন্যান্য। সাক্ষাৎকার সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কবীর সুমন। কার্যালয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

৩৫০ সডাক ৪০০

মননশীল পাঠকের পত্রিকা ও প্রকাশন

অনুষ্টুপ

আর শতকে অনুষ্টুপ

উল্লেখযোগ্য কিছু বই

অনুষ্টুপের রবীন্দ্রনাথ (২ খণ্ডে) ১৪৫০ ব্যক্ত অব্যক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ৭৫০ অনন্য অন্য লীলা মজুমদার ৫৫০ নিরাশঙ্কের শিখা : শঙ্খ ঘোষ ৫০০ দীপেন্দ্র চক্রবর্তী সংস্কৃতির ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য ৫০০ সত্তর দশক (৩ খণ্ডে একত্রে) ৮০০ দর্শন চৌধুরী গণনাট্য আন্দোলন ৩৫০ বীরেন্দ্র সমগ্র (৩ খণ্ড একত্রে) ৫৫০ বাঙালির নটতলা ৭০০ জেমস লঙ ৫০০ সমর সেনের পাঁচটি কবিতার বই (একত্রে) ৫৭৫ সংকলিত সমর সেন ২০০ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে ২৫০ অরিন্দম চক্রবর্তী ভাতকাপড়ের ভাবনা ৪০০ দেহ গেহ বন্ধুত্ব ২৫০

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান ৫৫০ অনিল আচার্য পরস্মৈপদী : নির্বাচিত লেখালিখি ৩০০ পুণ্যব্রত গুণ ও শংকর সান্যাল সম্পাদিত সংঘর্ষ ও নির্মাণ শংকর গুহ নিয়োগী ও ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অন্য ধারা ৩০০ পরমেশ আচার্য বাঙালি প্রবুদ্ধ সমাজের সীমা ও বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য ২০০ বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা ২০০ অনিল আচার্য সম্পাদিত এক্ষণ ও নির্মাল্য আচার্য ২০০ স্বপ্নময় চক্রবর্তী অষ্টচরণ ষোল হাঁট্ট ১৫০ স্বনির্বাচিত স্বপ্নময় ৪০০ অমিত রঞ্জন বসু ভুঁইফোঁড়ের মনোবিদ্যাচর্চা ৩০০

গ্রাহক করা হচ্ছে।

বার্ষিক গ্রাহক : ৭০০

সডাক ৯০০ শিক্ষায়তন : ১২০০ (বছরের যে-কোনো সংখ্যায় গ্রাহক হওয়া যায় ড্রাফ্ট বা টাকা পাঠালে) কার্যালয়ে ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডের সুবিধা আছে।

অনুষ্টুপ

২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা - ৯

ফোন ২২১৯-১৯৩৭

email : anustuppotrika@gmail.com

Website : www.anustupkolkata.com

amazon.in-এ অনুষ্টুপ-এর সব বই পাওয়া যায়।

হৃষীকেশ চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন দীপেনের কথা! ওঁর জাড্য ঘুচল তখন, যখন এসআই অর্কপ্রভ ঘোষ কয়েক জন কনস্টেবল সঙ্গে করে উদ্ধত ভঙ্গিতে আমাদের ঘরে ঢুকে ওঁকে সজোরে ঠেলা মারলেন!

যে সীমা নেই, তা বৃথতে কারও অসুবিধে হবে না। সেক্ষেত্রে শান্তির পরিমাণ কতটা হতে পারে সে কি আর আপনি বোঝেন না? সবই বোঝেন। দিবা জানেন যে, শুধুমাত্র চোরাই সিটি বেচার চেষ্টা হিসেবে অপরাধের শাস্তি সেই তুলনায় অনেকটাই কম হবে! কী করব বলুন! আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি সব প্রমাণ করতে পারতাম, তবে অনেক আগেই গুরুত্ব দিতাম আপনার উপযুক্ত শাস্তিবিধানের বিষয়টাকে। তা আর হওয়ার নয়। আপনাকে রাজার দলে কেউ চেনে না। চিনতেন এক গোপাল মল্লিক। তাঁর ডায়েরির বাকি অংশটা, যেখানে আপনার উল্লেখ ছিল, সেটা আপনিই নিজের হাতে সযত্নে পুড়িয়েছেন, তাই না? আর তা কোনও প্রমাণ নেই, কোনও সাক্ষী নেই আপনার গত এক দশকের অপরাধের! আমি আর মিস্টার পাত্র গীতা মুখে করে আদালতে চিৎকার করলেও, প্রমাণ ছাড়া সেসব অভিযোগ আইনের চোখে গ্রাহ্য হবে না। আপনি খুব বেঁচে গেলেন হৃষীদা। তবে বছরকয়েকের জেল আপনার কেউ আটকাতে পারবে না! আপনাকে আজ আমরা বামাল ধরেছি আর আপনি ধন্দেরকে ধরে গতকালই মিস্টার পাত্র গারে চালান দিয়েছেন!"

হৃষীকেশ চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন দীপেনের কথা! ওঁর জাড্য ঘুচল তখন, যখন এসআই অর্কপ্রভ ঘোষ কয়েক জন কনস্টেবল সঙ্গে করে উদ্ধত ভঙ্গিতে আমাদের ঘরে ঢুকে ওঁকে সজোরে ঠেলা মারলেন! জড়পুত্তলিবৎ আমি বসে ছিলাম নিজের চেয়ারটিতে। উপসাই পুলিশ অফিসার অর্কপ্রভ ঘোষ আপাদমস্তক আভিজাত্যে মোড়া সৌম্যদর্শন মানুষটিকে ঘাড়ধাক্কা দিতে-দিতে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় হৃষীদা একবারও আমাদের দিকে ঘুরে তাকানি। পরিচয়ের রেশ, বন্ধুত্বের টান, অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার স্মৃতি, এই ক'টা মাসে গড়ে ওঠা পারস্পরিক রাগ-অভিমানের অভাস, কোনও কিছুই কি আর বাকি নেই! ধরা পড়ার প্রাথমিক বিস্ময়ের ভাব কেটে যাওয়ার পর গুঁর চেহারায় যে-ভাবলেশহীন আক্তরণ বণ করে নেমে এসেছিল, বিনয়ের কালে তা আর ঘুচল না! মুখোশধারী মানুষটাকে দীপেনও কি চিনেছে?

ইন্সপেক্টর পাত্র ফিরে এসে চেয়ারে বসতে আমি যেন চেতন হলাম! "ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবি দীপেন? ওরা ওঁকে কেন বেঁধে নিয়ে গেল?"

আমার দুর্বল কণ্ঠের কাতরোক্তি শুনে দীপেন মমতাময়ী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে মাথা দোলাল, "ওরা আসল রাজা বৈরাগীকে ধরে নিয়ে গেল বিল্টু! এই সেই লোক, যে চিরকাল সফলের চোখের আড়ালে থাকতে ভালবেসেছে! যার অপরাধমনস্কতার আভাস কেউ কখনও পায়নি। একেবারে নিশ্চিত করে বলতে পারব না, ঠিক কবে উনি হয়ে উঠলেন মঘের আড়ালে মেঘনাদ! গত ছ'মাস ধরে মিস্টার পাত্র আর আমি এক ধরনের অভিযয় করে চলছিলাম। আজ পাখা অভিনেতা হৃষীকেশ চৌধুরীকে আমরা অবশেষে হারিয়ে দিলাম!"

আমি অবৈর্য হয়ে বললাম, "হেঁয়ালি ছেড়ে সোজাসুজি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল! খুলে বল, লোকটা কী অপরাধ করেছে?"

"শোন তবে। এঢ়ুকু ধারণা বোধ হয় তোরও হয়েছিল যে, প্রথম দিক থেকেই গোপাল মল্লিক অনেক বিষয়েই হৃষীকেশ চৌধুরীর উপর বিচারের উপর নির্ভর করতেন। পুলিশের কাছে ধরা না পড়ার কৌশল তাঁকে সম্ভবত জোগাতেন হৃষীকেশ! গোপাল মল্লিকের নাম তাই পুলিশের খাতায় দু'-একবারের বেশি ওঠেনি। যখন উঠেছে, তখন অবশ্য তাঁকে বাঁচিয়েছেন বাবা মাধবচন্দ্র আর দাদা বলরাম। গুন্ডার আড়ালে বসে সুচিন্তিত জালে পুলিশ আর গোয়েন্দাকে বোকা বানানোর নেশা হৃষীকেশকে পেয়ে বসে! তাঁর নির্দেশিত পথে চলে গোপাল আর তাঁর তৈরি গোলকধাঁধায় পথ হারায় বিশাহারা পুলিশ!

দারিদ্রের কারণে কলেজের পড়া শেষ করতে পারেননি হৃষীকেশ চৌধুরী। বুদ্ধি ও প্রতিভার উপযুক্ত কোনও কাজও জোটেনি। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর একদিন বন্ধু গোপাল তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে চান। হৃষীকেশ মল্লিকবাড়ি আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেখানে নিজের স্বাধীনতা বরাবর অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। প্রথম থেকে আজ অবধি রক্ষা করেছেন মল্লিক পরিবারের সঙ্গে চৌধুরী পরিবারের উদরসুরির সম্বন্ধটিও দূরত্ব। বনমালী ট্রেডিংয়ের ব্যবসায় তিনি ক্রমে হয়ে উঠলেন মূল নিয়ন্ত্রা। যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিতেন, গোপাল তাঁর নির্দেশ পালন করতেন মাত্র। সম্ভবত, গোপালের জীবনের সব কথা হৃষীকেশ জানতেন। রাজা বৈরাগীর আড়ালে রাজা হয়ে ওঠার কারণ তবু বোঝা যায়। কিন্তু মল্লিকদের হেয় ভাবার প্রাণগণ চেষ্টার পিছনে ব্যক্তিগত মানসিক জটিলতার ব্যাখ্যা যেন কিছুতেই পাওয়া যায় না! গোপালের তো তিনি বন্ধু ছিলেন, অত্যন্ত আস্থাভাজন বন্ধু। গোপালের জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁর সঙ্গে হৃষীকেশ যা করেছেন, তা বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এক তুলনাহীন নিদর্শন! মল্লিকবাড়ি হৃষীকেশ চৌধুরীকে ছাড়া চলে না, তাঁকে ছাড়া মল্লিকবাড়ি কথা ভাবা যায় না! বুদ্ধার মাথামে চেনা ভ্রাণ-কর্তাকে কথা প্রায়ই গোপাল বন্ধুকে বলতেন। ক্রমশ হৃষীকেশ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। গোপালকে তিনি বলেন ভ্রাগের ব্যবসা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত যোজিখবর নিতে। এরপর গোপাল যা-যা করেছেন, সে সবই হৃষীকেশের নির্দেশ অনুসারে। দলের প্রভাগ বত বাড়ল, ব্যবসার পরিধি যত বিস্তৃত হল, রাজার সম্পর্কে শ্রদ্ধা, ভয় এবং রকমারি অদ্ভুত গল্প ততই ছড়াতে থাকল! প্রথমে দলের মধ্যে ও ক্রমে বাইরে!"

ইন্সপেক্টর পাত্র অস্বস্তিভরে চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন।

আমি ওঁর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দীপেনকে প্রশ্ন করলাম, "এত সব জানতিস যখন, তখন লোকটাকে ছ'মাস আগেই ধরিসনি কেন?"

"সন্দেহ আগাগোড়ই ছিল। গোপাল মল্লিকের পাঠানো কাগজপত্রে রাজার উথান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি থাকলেও, হৃষীকেশ চৌধুরীর সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয়ে কোনও উল্লেখ ছিল না। তদন্ত চলাকালীন হৃষীকেশ চৌধুরীর প্রতি আমার প্রথমদিকের রুচিন সন্দেহ পরে একসময় অনেকটাই তিরোহিত হয়েছিল। সত্যিই ভাবতে পারিনি যে, নিজের সিগারেটে কেসে সিডি-টা লুকিয়ে রাখার মতলব গুঁর মাথাতেই এসেছিল! বরং ওই কারণেই গুঁর প্রতি সন্দেহ নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়েছিল। আর সকলের মতোই ভেবেছিলাম, চোরাই মাল কেউ নিজের কাছে রাখে! এর মধ্যে, উনি তদন্তে আমাকে সক্রিয় সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেলেন। দময়ন্তী চৌমিকের সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধা সেনের মাসি-মেসো সাজলেন। বিজ্ঞাপনের ব্যয় বহন করলেন। অবশেষে গোপাল মল্লিক ধরা পড়লেন! সন্দেহ আর থাকে? তবু ঘটনা থেকেই গিয়েছিল। গোপাল মল্লিক নিজের গাড়ি নিয়ে কেন বৃদ্ধা সেনের মাসি-মেসোর হোটেলের সারপাশে ঘুরঘুর করতে গেলেন? বুদ্ধিমান অপরাধীর তো বোঝা উচিত যে, এটা একটা ফাঁদ হতে পারে! রাজা যে বুদ্ধিমান, তাতে কারও সন্দেহ নেই! সে নিজে না এসে দলের কোনও বিশ্বস্ত সদস্যকেও ওখানে পাঠাতে পারত। কেন তা করল না? ছিতীয় গোলমালটা হল, গোপাল হোটেলের নাম-ঠিকানাটা কোত্থেকে পেলেন? ইন্সপেক্টর পাত্র সেসব তথ্য মল্লিকবাড়িতে বলেননি।

ভাবলাম, হয়তো দলের নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে রাজা বৃন্দা সেনের মাসি-মেসোর হোটেলের পাত্তা করে ফেলেছে। একটা অস্বস্তি তবু রয়ে গেল। কিন্তু পরের ঘটনাগুলো এমনভাবে, এত দ্রুত ঘটতে শুরু করল যে, হৃষীকেশ চৌধুরীর বিরুদ্ধে আর কোনও সূত্র আমার হাতে এল না। হৃষীকেশ চৌধুরী তখনকার মতো পার পেয়ে গেলেন। উনিই যে রাজার আড়ালে আসল রাজা, তা প্রমাণ হল না!"

"শেষ অবধি তবে প্রমাণ পেলি কী করে?"

"গোপাল মল্লিকের মৃত্যুর পর একদিন, একটা বেকার দুপুরে মল্লিকবাড়ির আশ্চর্য কাহিনি মনে-মনে নাড়াচাড়া করছিলাম। হঠাৎ মনে হল, গোপালের পাঠানো ডায়েরির পাতাগুলোতে মল্লিকবাড়ির অনেকের নাম ঘুরেফিরে এলেও, একটিও শব্দও নেই বন্ধু হৃষীকেশ চৌধুরী সম্পর্কে! নড়েচড়ে বসলাম! এমন কি হতে পারে যে, ডায়েরির না-পাঠানো পাতাগুলোয় হৃষীকেশ সম্পর্কে এমন কিছু লেখা আছে, যা গোয়েন্দা বা পুলিশের চোখে পড়া অভিপ্রেত নয়? উত্তেজিত মনে প্যাকেট ঘটিতে-ঘটিতে কাগজের ভিড়ে চোখে পড়ল একগাছি শ্বেতশুভ্র কুঞ্চিত কেশ! গোপাল মল্লিকের চুলে মৃত্যুর আগে অবধি পাক ধরেনি। তাঁর চুল এত লম্বাও ছিল না। বরলাম্বের চুল বেশির ভাগই সাদা ঠিকই, কিন্তু সে-ও দৈর্ঘ্যে অনেক খাটো। আর বক্সবিবরণের তত বাহার তাতে নেই। প্যাকেটের চুল হৃষীকেশ চৌধুরীর মাথায় একেবারেই বেমানান হবে না। তেমনই লম্বা, ঢেউ খেলানো, তেমনই পাকা, ওঁর মস্তিষ্কের মতোই! আগেই বলেছি যে, খটকা আমার মনে ছিলই। আরও অনেক অসঙ্গতির কথাই তখন মনে পড়ল। সব কিছু নতুন আলোয় দেখতে শুরু করলাম! কিন্তু প্রমাণ? আবার মিস্টার পাত্রের শরণাপন্ন হতে হল। চব্বিশ ঘন্টার গুপ্তচর লাগল হৃষীকেশ চৌধুরীর পিছনে। মল্লিকবাড়ির ফোন, মায় হৃষীকেশের মোবাইল ট্যাপ করা হল। এসব চলল দীর্ঘ ছ' মাস ধরে! ভয়ে-ভয়েই ছিলাম, মিস্টার পাত্রের ধৈর্যের সীমা কবে লঙ্ঘিত হয়!

"গত পরশু সন্ধেয় হৃষীকেশ ভাবলেন যে, যথেষ্ট লম্বা সময় উনি প্রতীক্ষা করেছেন, তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফোন করলেন। করলেন পাবলিক বুথ থেকে। উনি ফোন করে বেরিয়ে আসতেই গুপ্তচর বুথে ঢুকে টেলিফোন নম্বর আদায় করল। সঙ্গে-সঙ্গে তৎপর হল পুলিশি ব্যবস্থা! টেলিফোনের ওপাশের বিদেশি নিযুক্তক কয়েকঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার হল। কালক্ষয় না করে গতকাল নিমন্ত্রণ গেল, 'আজ গরিবের বাড়ি ভোজ!' বল যে শেষ হয়ে গেল, হৃষীকেশ তা অনেক আগেই বুঝেছিলেন। যে-কোনও পরিস্থিতিতেই দীপেন ঠাকুরের তলস্ব শেষ হবে বলের বিনাশ ও রাজার শনাক্তকরণে, তা-ও বুঝেছিলেন। গোপালের মৃত্যুতে তাঁর বাঁচোয়া। তাই, আঙ্গুলনের সিদ্ধান্ত থেকে গোপালকে তিনি বিরত করেননি। শুধু, গোপাল যে কাগজপত্র আমায় পাঠাবেন সেগুলো তত্রত্র করে দেখে নিলেন যে, ওঁকে ডড়ানোর মতো কোনও মশলা তাতে আছে কি না। নেই দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে প্যাকেটস্থ করলেন কাগজগুলো। উত্তেজিত, বিক্ষিপ্ত মন জানতে পারল না, কখন একগাছি চুল প্রমাণস্বরূপ সেঁধিয়ে গেল তাতে!"

"তখন হৃষীদার মুখ তবে কালো হয়ে গিয়েছিল বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার খবরে আহত হয়ে নয়? কপি করা সিডিটা তুই বেকার করে দিয়েছিস জেনে?"

"ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট!" দীপেন সংক্ষেপে জবাব দিল।

লোকটার ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়! মনে-মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, হৃষীকেশ চৌধুরী শুধু বড় অভিনেতাই নন, ওঁর মস্তকের শৈত্যও সার ক্লিয়ার কাছাকাছি। মুখটা কালোই শুধু হয়েছিল। আর হয়তো কিছুক্ষণ বাহুনিষ্পত্তি হয়নি! আর কিছু নয়।

"প্রথমবার হৃষীকেশ চৌধুরী সিডিটার যে একের বেশি কপি করেননি, তার গ্যারান্টি কী মিঃ ঠাকুর? হয়তো দু'-এক কপি আগেই বেচেছেন? হয়তো, আরও কয়েক কপি কোথাও লুকনো আছে?" ইন্সপেক্টর পাত্র হাতে ধরা সিডিটার দিকে তাকিয়ে বললেন।

"নেই! এটা এমন একটা জিনিস, ডিজাইনার পণ্যের মতো যার কপি

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দেশ

নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস

পুনর্বাসন

নন্দিতা বাগচী

ছন্দোবদ্ধতা জীবনের আবশ্যিক ধর্ম নয়। অনেক সময়েই জীবন তার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে। ফলে পরিপার্শ্ব হয়ে ওঠে এলোমেলো। নিঃসঙ্গতাও জীবনের সে রকম এক অনিবার্য পরিণতি। তা থেকে মুক্তির অবগাহনে তাই এত ব্যাকুলতা।

এ উপন্যাসের কাহিনিকাল সমকালের কলকাতা। সেখানে নিয়ত জীবনসংগ্রামরত এক নারীচরিত্র, যার অন্তর্লোক জুড়ে আছে তার স্বামী ও কন্যা। মারণরোগে স্বামীবিয়োগ সে নারীকে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। অতিবাহিত সময়ের দর্পণে সে যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়।

এ উপন্যাস তাই একাধারে হয়ে উঠেছে এক নারীর পুনর্বাসনের, তার নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের আখ্যান।

টেবিলের উপর রাখা, হৃষীকেশ চৌধুরীর আনা স্কচের বোতলটার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "খাবি? যদি বিষ-টিষ মেশানো থাকে?" দীপেন বলল, "তবু খাব! খেয়ে মরব। কিন্তু স্কচের বোতলের দিকে তাকিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না!"

বেশি করলেই নাম পড়ে যায়। দস্তুরের বাইরে ওর আর কণি নেই। শেষ দুর্মুল্য সন্তরণটি আপনারই হাতে মিস্টার পাত্র!"

"হোটেলের বাইরে জানালা দিয়ে ফুটপাথে গোপাল মল্লিকের গাড়ি দেখার কথাটা তা হলে ভাঁওতা?" আমি জানতে চাইলাম।

"পুরোপুরি শেষরক্ষা আর হবে না জেনে, গোপালকে বলি দিতে তখন উনি মনস্থির করে ফেলেছেন। বাইরে রাস্তায় হঠাৎই কোনও গাড়ি এসে দাঁড়াতে দেখে হৃষীকেশ চৌধুরী জব্বর গপ্পা ফেঁদেছিলেন!"

"কিন্তু বিজ্ঞাপনটা গাঁটের কড়ি খরচ করে দিতে গেলেন কেন?" আমি সন্দিগ্ধসুরে প্রশ্ন করলাম।

"উপায় ছিল না। তদন্তে সহযোগিতার অভিনয় শুরু করে আর পিছোনোর পথ ছিল না। উনি জানতেন যে, আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি! অবিলম্বে বিজ্ঞাপন উনি না দিলে, আমি নিজেই দিতাম। বিজ্ঞাপন নিয়ে ভয় পাওয়ার কথাও ওঁর নয়। হৃষীদা কীভাবে জানবেন যে, 'লক্ষ্মকন্যা'র দারোয়ান সনানন্দর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে এবং সে বিজ্ঞাপন ও বুন্দা সেনকে খেয়াল করে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে অ্যালার্ট করবে? শ্বশ্মানে আমাদের পৌঁছতে কিসিদশেক দেরি হলেই তো বুন্দা সেনের শবদেহ নির্বিঘ্নে পুড়ে যেত! সেক্ষেত্রে হাজার সনানন্দের সাক্ষ্যও গ্রাহ্য হত না! কারণ, পুলিশের খাতায় বুন্দা সেন এই ঘটনার বছরখানেক আগেই মৃত!"

"তুই নিজেই বিজ্ঞাপন দিয়ে দিবি সেই ভয়ে হৃষীদা আগেভাগেই সে কাজ সেরে রাখলেন তোকে খুশি করার জন্য?"

"ঠিক আমাকে খুশি করার জন্য নয়। রাজপক্ষের সহায়তা করে সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে চেয়েছিলেন উনি!" দীপেন বোঝাল। তারপর ক্লান্তস্বরে বলল, "বোতলটা এবার খোল বিল্টু! এতক্ষণ বলে গলা শুকিয়ে গিয়েছে!"

টেবিলের উপর রাখা, হৃষীকেশ চৌধুরীর আনা স্কচের বোতলটার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "খাবি? যদি বিষ-টিষ মেশানো থাকে?"

"তবু খাব! খেয়ে মরব। কিন্তু স্কচের বোতলের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না! তোর ভয় করলে তুই না হয় খাস না!"

"তাই কি হয় নাকি? একমাত্রায় পৃথক ফল! আমাকে হৃষীকেশ চৌধুরী পেলি নাকি তুই?"

আমি বোতল, গেলাস, ইত্যাদি এনে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে, ইন্সপেক্টর পাত্র বলে উঠলেন, "গ্লাস তিনটে কেন? আমি তো খাব না!"

"সে কী! কেন? বিশ্বের ভয়ে নাকি?" আমার প্রশ্নে কৌতূহলের চেয়ে বেশি ছিল প্রতিবাদ, অ-রসিকের প্রতি রসিকের!

"না ভাই, তা নয়। কলেজ লাইফে এক-আধবার চেখে দেখা ছাড়া মদ আমি কখনও খাইনি। খাই না। জিনিসটার প্রতি বিদ্বেষ নয়। তেমন উপভোগও করতে পারি না বলে। আজ আমি চুলি। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই, ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়ার আগে! আপনারা চালান!"

আমি ইন্সপেক্টর পাত্রকে এগিয়ে দিতে নিচে বিল্ডিংয়ের গেট অবধি গেলাম। ঘরে ফিরে দেখলাম, দীপেন নিজের গ্লাস এবং চেয়ারটি নিয়ে বসেছে ওর প্রিয় জায়গাটায়। জানলার ধারে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, পা তুলে দিয়েছে জানলার ধাপে। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরে। আমি গ্লাসের তরলে কয়েকটা চুমুক দিয়ে টেবিলের কাছেই চেয়ারে এলিয়ে বসলাম। বিয়োগান্ত গল্পের শেষটুকু সদ্য পড়ে ওঠা পাঠকের মন্তব্যের মতোই, অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "সবই মিথ্যে!"

"সবটা কারও মিথ্যে হয় না বিল্টু," দীপেন ঘরের নৈঃশব্দ ভেঙে বলে উঠল, "সানা-কালোর মিশ্রণও থাকে কিছুটা। হৃষীকেশ চৌধুরী সমাজের শত্রু, তিনি শাস্তি পাবেন। কিন্তু হৃষীদাকে আমাদের বন্ধুর তালিকা থেকে খারিজ করে দেওয়ার মর্মান্তিক পরিকল্পনাটা বাড়াবাড়ি প্রচেষ্টা।"

"কী বলছিস দীপেন! আমি বা তুই, কেউ সমাজের বাইরে নই। সমাজে হয়ে আমাদেরও দায়িত্ব আছে।"

"অস্বীকার করছি না তো! চোখের সামনেই তো হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেল লোকটাকে। বাধা তো দিইনি! অরুণিমা আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিল কমলাকে খুঁজে বের করার, রাজা বৈরাগীর দল ভাঙার নয়। সে কাজের জন্য মিস্টার পাত্র মেডেল পেলেও, আমরা এক পয়সারও পেমেন্ট পাব না! তবুও বিনি পয়সায় সমাজসেবাই তো করলাম। হৃষীকেশ চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের পুরোটাই সত্যি। ছ'মাস চোর-পুলিশ খেলা সত্ত্বেও। অরুণিমা আর সঞ্জীবের প্রতি ওঁর স্নেহ, বলরামের প্রতি শ্রদ্ধা, এগুলোও মিথ্যে নয়। ওদিকে ভ্রাগের ব্যবসা করে অজস্র তরুণ-তরুণীর জীবনের বারো বাজানোটাও সত্যি!"

"নাটকটার কী হবে?"

"মঞ্চস্থ হবে। দলের প্রধান দময়ন্তী ভৌমিক। শুধু একজন দক্ষ পুরুষ অভিনেতার ভূমিকায় হৃষীকেশ চৌধুরীর পরিবর্তে অন্য কাউকে নির্বাচন করতে হবে," দীপেন অসীম আস্থার সঙ্গে জানাল।

"দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই যদি থাকে, তবে অভিঘাতের যন্ত্রণাও তো নিশ্চিত হওয়ার কথা। চেনা মানুষটার অচেনা রূপ তাঁকে যে প্রহার করবে, তা সহ্য করে দময়ন্তী পারবেন দল টিকিয়ে রেখে, নাটক চালিয়ে যেতে? গ্রুপটা ভেঙে যাবে না? দলের অন্যেরাও তো ব্যাপারটা জানবে!"

"জানবে, তাতে কী? দময়ন্তী অবশ্যই কষ্ট পাবেন। কিন্তু এতদিনের সম্পর্কটাকে আগাগোড়া ঝুটো বলে ধরে নেবেন না। দময়ন্তী অপেক্ষা করবেন হৃষীকেশের জন্য।

"তোর ওই কাগজে লেখা ডট কম ঠিকানাটাও সত্যি! যোগাযোগ করলে বুঝতে পারবি!" দীপেনের দেঁতো হাসি রীতিমতো ইঙ্গিতপূর্ণ!

আরও দু'-চার কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, হয়ে উঠল না! অকস্মাৎ সারা ঘর ভরে গেল চোখধাঁধানো সাদা আলোয়! দীপেন ঠোঁটে আঙুল তুলে বলল, "শ...শ...শ..." ওর মুখের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না-যেতে, শহর কেঁপে উঠল বজ্রনির্ঘোষে! কখন আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, খেয়াল করিনি। শীতের রাতে হঠাৎ অশনিসঙ্কেতে তাই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! একঝলক ঠান্ডা, ঝোড়ো হাওয়া দুর্বৃত্তের মতো ছুটে এল ঘরে। উড়িয়ে দিল টেবিলের কাগজপত্র, হাজারের জামাকাপড়। ধুলোর পরত জমল ঘরের সর্বত্র। দীপেন অবিচল বসে রইল! জানলা বন্ধ করার চেষ্টাই করল না! আমিও স্থবিরের মতো নিজের চেয়ারে বসে দেখলাম, আরও একবার জানলার বাইরে পৃথিবীটা জ্বলে উঠল!

আমার হাতের গেলাস হাতেই ধরা রইল! আবিষ্কারকের বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম, আমারই জানলায় আজ বারবার উদ্ভাসিত এক গর্বমান বিশ্ব!

(সমাপ্ত)

অঙ্কন: অমিতাভ চন্দ

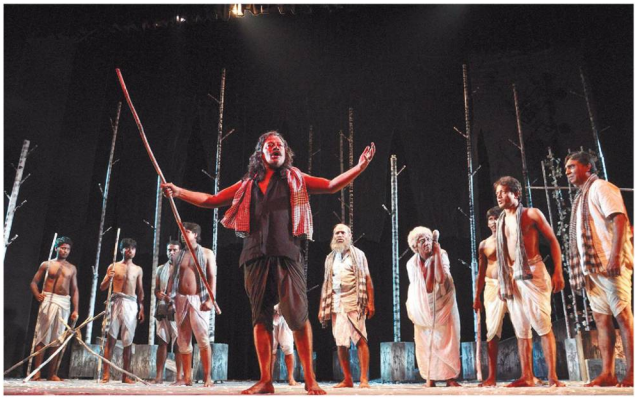

পূর্ব পশ্চিম প্রযোজিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নাটকের একটি দৃশ্য

প্রাণবান উদ্দাম লড়াইয়ের ছবি

নাটক

'পূর্ব পশ্চিম'কে অশেষ ধন্যবাদ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ এবং মঞ্চায়নের পক্ষে যথেষ্ট জটিল একটি উপন্যাস—'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-কে মঞ্চে উপস্থাপন করে বাংলা নাটককে নতুন করে সাহিত্যনির্ভর কাজের একটি সফল নজির গড়ে দেবার জন্য। কৌশিক করের নাটকটিতে দর্শক পেলেন কথাসাহিত্যিকের অতুলনীয় গল্প-বলা-আমেজটি। তাঁরই নির্দেশনায় মঞ্চে প্রায় আড়াই ঘণ্টার জন্য বিরাজ করল নিপীড়ন থেকে বাঁচবার জন্য রাঢ়দেশের মানুষের এক প্রাণবান উদ্দাম লড়াইয়ের ছবি। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং সুপ্রযোজিত এই নাটটি বাংলা নাট্যজগতে একটি উজ্জ্বল সংযোজন।

উপন্যাস থেকে নাটক তৈরি করতে গিয়ে বেশ কিছু কাট-ছাঁট করতে হয়েছে, কিছু বদলাতেও হয়েছে, কিন্তু এসবের কোনও সূত্রেই অসংলগ্নতা আসেনি। কৌশিককে বাহবা দিতে হয়, নাটককার হিসেবে কোনও সময়েই তারাশঙ্করকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা তাঁর ছিল না। মূল চরিত্রগুলিকে তিনি যতটা সম্ভব উপন্যাসানুগ অবয়ব ও প্রকৃতিতেই উপস্থাপন করেছেন। ফলে লেখকের অনুবর্তী হয়ে চরিত্রগুলিকে সাজিয়ে কাহিনিটিকে তাঁর মতো এগিয়ে নিয়ে যেতেও পেরেছেন। কাজটি নেহাত সহজ নয়। কৌশিকের পূর্ববর্তী কোনও নাটকের সঙ্গে এই সমালোচকের পরিচয় হয়নি, তবে এই নাটকটিই প্রমাণ দেয়, বাংলা নাটক নির্মাণে দীর্ঘ পথ চলার জন্য তিনি তৈরি। এ কথা তাঁর নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কয়েকটি সুন্দর নাট্যমুহূর্ত তিনি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত কয়েকটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত শিষ্টতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য আবেগতাড়িত হয়ে কিছু মুহূর্ত তিনি তৈরি করেছেন যেগুলি তাৎক্ষণিক বাহবা পেয়েছে দর্শকের কাছে, কিন্তু নাট্যচলনে সেগুলি কতটা সহায়ক তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলি, বেশ কিছু তরুণ দর্শকের উচ্ছ্বাস সেদিন এতটাই তীব্র ছিল যে, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে নিবিড় নাট্যদর্শন বাধা পেয়েছে বেশ কয়েকবার। সামগ্রিক নাট্য পরিকল্পনাতে তিনি যে অত্যন্ত যত্নবান তার পরিচয় দর্শক পান প্রায় প্রতি মুহূর্তেই। নাট্যগতির নিয়ন্ত্রণ ও মঞ্চের ব্যবহার,

কৌশিককে বাহবা দিতে হয়, নাটককার হিসেবে কোনও সময়েই তারাশঙ্করকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা তাঁর ছিল না।

শুভ্রকের নাটক 'দহনান্ত'-র একটি দৃশ্য

বিশেষ করে প্রোসেনিয়মের ডানকিক আর বাঁদিকের প্রয়োগ নির্দেশকের চিন্তার গভীরতার পরিচয় দেয়। তবে যে-কাজটি দর্শককে স্তম্ভিত করে দেয় তা হল কৌশিকের কালো-সাদা রংকে মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করা। এই ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে মালবিকা মিত্রর পোশাক পরিকল্পনা এবং পৃথ্বীশ রাণার মঞ্চস্থাপত্য। শাঁখা-পলার ক্ষেত্রে কালো পলা বা কপালে কালো টিপ অথবা সাদার উপর কালো ছাপা শাড়ি বা কালো চেকের গামছা অথবা সাদা ধুঁকো-কলকে বা মদের বোতল আবার অন্যদিকে সাদা-কালো গায়ের গুঁড়ি বা পশ্চাদপটে বিভিন্ন টোনের কালোর ব্যবহার দর্শককে চমকে দেয়। অভিজিৎ আচার্যর সংগীত এবং আবহ এই প্রযোজনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। মঞ্চের বাইরে দর্শক আসনের একদিক থেকে তার তাৎক্ষণিক প্রয়োগ নাট্যিক পরিবেশকে ঘন করে দিতে সক্ষম হয়। সুদীপ সান্যালের আলো সেই পরিবেশকে তৈরি করতে সহায়তা করে। সজ্ঞ পালের রূপসজ্জায় কিছু চ্যুতি থাকা সত্ত্বেও সাধুবাদ যোগ্য।

'পূর্ব পশ্চিম'-এর প্রযোজনায় অভিনয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যতটা সম্ভব নিখুঁত রাখার চেষ্টা থাকে এবং এখানে ঘটেছে তার সর্বোত্তম প্রয়োগ। প্রথমেই সুরঞ্জনা দাশগুপ্তর পিসির উল্লেখ করতে হয়। এত নিখুঁতভাবে তিনি চরিত্রটিকে সম্পাদিত করেছেন যে, এটি তাঁর অন্যতম সেরা কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে নিঃসন্দেহে। শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়ের বানোয়ারি এক কঠিন চরিত্র-রূপায়ণ এবং শান্তিলাল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজটি করেছেন। দর্শকদের নজর কেড়েছেন গঙ্গীরা ভট্টাচার্যর নমুবালা, তাঁর প্রতিটি অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য। ভাল লাগে তমিষ্ঠা বিশ্বাসের পাখি বা শর্মিলি মুখোপাধ্যায়ের সুবাসী অথবা অম্বিতা মাজির কালোবউ বা সৌমিত্র মিত্রর কর্তা। উত্তম চট্টোপাধ্যায়ের পাগল চরিত্রটির সহজ প্রকাশ এবং গানের জন্য দর্শকের মনে থেকে যাবে। কৌশিক কর কারালী চরিত্রটিকে ফুটিয়েছেন তাঁর সহজাত বলিষ্ঠ অভিনয়ে। সুঠাম দেহসৌষ্ঠব তাঁকে দিয়েছে অতিরিক্ত সহায়তা। এই বছরের 'সায়ক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা' সম্মানে ভূষিত এই অভিনেতা আবারও প্রমাণ করলেন বাংলা নাট্যজগতে তিনি নিজের একটি জায়গা তৈরি করে নিতে প্রস্তুত।

পরিশেষে, প্রযোজনাটি তপন সিংহ নির্মিত ১৯৬২ সালের ছবিটির কথা এবং তার সঙ্গে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, নিভাননী, বিলীপ রায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী এবং অবশ্যই ব্রতি ঘোষের কথা অথবা ছবির গানগুলির কথা বা বোগাইয়ের চরের দৃশ্যগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু বহু বছর কয়েক আগের একটি সংবাদে প্রকাশ ছবিটি হারিয়ে গেছে। দুর্ভাগা এই দেশ!

দহনান্ত

শুভ্রকের নাটকে দর্শক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তার খোরাক পেয়ে থাকেন, তার সঙ্গে থাকে নাট্যায়নে একটি ধারার স্পষ্ট দিকচিহ্ন। রবীন্দ্রসদনে তাঁদের নাটক 'দহনান্ত' দেখতে বসে মনে হল এই নাটকটি সেই ধারার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেশ কয়েক বছর আগের এই প্রযোজনাটিতে যেমন আছে অকপট উচ্চারণে এই সময়ের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ভাষ্য, তেমনই আছে তার রাজনৈতিকভাবে অস্থির চেহারার এক ঝলক। আর আছে এক অত্যন্ত সুস্পষ্ট নাট্যপাঠভিত্তিক নাট্যায়ন।

মূলত এক নিঃসঙ্গ দম্পতির কথা বলা হয়েছে এই নাটকে। বড় ছেলে মার্কিন দেশে বসবাস করে, মেয়ে থাকে বিজিতে। দু'জনে কেউই বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিতে অপারগ। ছোট ছেলে উগ্র রাজনীতিতে বিশ্বাসের পরিণতিতে প্রাণ দিয়েছে পুলিশের গুলিতে। বড় ছেলে আর মেয়ের সঙ্গলাভের আশায় আর ছোট ছেলের স্মৃতি নিয়ে অকিঞ্চন ও সাবর্ণী যাপন করে তাদের নিঃসঙ্গ জীবন এবং শেষে ক্লান্ত হয়ে তারা আত্মহননের পথ বেছে নেয় সেই একাকিত্ব থেকে মুক্তি পেতে। বাড়ি বিক্রি করে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিতে জামাই রমিত এবার তৎপর হয়ে পড়ে আর কিছু রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তৎপর হয় এলাকার এক দাদার দল। কিন্তু নীরবে চোখের জল ফেলে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকে ধিক্কারে ভেঙে চুরমার করে দেয় বৃদ্ধ দম্পতির কাজের বউ বকুল। দেবাশিস মজুমদার তাঁর এই নাটকে রেখেছেন মেলোড্রামা যার মাধ্যমে দর্শকের কাছে তিনি পৌঁছিয়ে যান সহজেই। বিষয় তাঁর কাছে এতটাই প্রাধান্য পায় যে অনেক ক্ষেত্রেই নাটিক যুক্তি মানাতা পায় না। চরিত্রের সংলাপেও এই বিষয়টি দেখা যায় ফলে সংলাপ অনেক সময়েই চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। বৃদ্ধর চরিত্রটি একটু বেশি পরিমাণেই নাটুকে হয়ে পড়ে সেই কারণে। আবার অন্য দিকে যেমন বৃদ্ধা অনেক বেশি বাস্তবোচিত তেমনই বকুল বা তার স্বামী সতীনাথ বা তাদের মেয়ের চরিত্রগুলির রচনা অনেকটা বাস্তবনির্ভর। পাড়ার দাদা, দলের দাদা, উগ্র রাজনৈতিক কর্মী এই ধরনের চরিত্রগুলো নাটকে পরিচিত, এবং উচ্চস্বরে বধিরা কিন্তু বৃদ্ধর জামাই চরিত্রটি ভিন্ন প্রকৃতির। জামাই এবং কাজের বউ, এই দু'টি চরিত্রকে ব্রতে নাটকটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ থাকলেও নাটককার জামাই চরিত্রটিকে অসম্পূর্ণ রেখেছেন। ফলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে ঘিরেই মেলোড্রামাটি তৈরি হয়।

> যে-কাজটি দর্শককে স্তম্ভিত করে দেয় তা হল কৌশিকের কালো-সাদা রংকে মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করা। এই ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে মালবিকা মিত্রর পোশাক পরিকল্পনা এবং পৃথ্বীশ রাণার মঞ্চস্থাপত্য।

সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমির সম্মানে সম্ভাষিত দেবশঙ্কর হালদারের প্রথম দিকের কাজ এই ধরনের বৃদ্ধ চরিত্রের রূপায়ণ। তারপর এই ধরনের বহু চরিত্রে তিনি কাজ করেছেন, সুতরাং যে-দর্শকরা নিরন্তর তাঁর কাজ নিরীক্ষণ করে চলেছেন, তাঁরা কাজটিতে এক ধরনের একঘেয়েমি খুঁজে পান। তবে তার মধ্যেও ঝলসে ওঠা কিছু মুহূর্ত সেই সব দর্শককেও চমকে দেয়। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে

উত্তেজিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া অথবা ছেলের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরের অবস্থা। শ্রী সাবর্ণীর ভূমিকায় ইন্দ্রাণী মৈত্র মধ্যবিত্ত পরিবারের গোড়া গাঁওয়া গৃহিণীর চেহারাটা মূর্ত করে তোলেন, তবে কিছু কিছু অংশে, যেমন বৃদ্ধর সঙ্গে যখন ছেলের বন্ধু অথবা অন্য কারওর কথোপকথন চলে, সেই ক্ষণগুলিতে তাঁর নাট্যক্রিয়া কিছুটা ছন্দ হারায়। ভাল লাগে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বকুল এবং সতীনাথ চরিত্রে তনম মুখোপাধ্যায়ের সাবলীল কাজ এবং মেয়ের চরিত্রে মধুরাই মজুমদার, বন্ধু চরিত্রে প্রেমাংশু রায়ের অভিনয়। অরিন্দম বসুর দাদা কিছুটা উচ্চস্বরে বাঁধা হলেও চরিত্রানুগ। অন্যান্যরা নির্দেশকের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁদের কাজ করে গেছেন। সৌমিক-শিয়ালীর মঞ্চ পরিকল্পনা নাট্যনির্মাণে সাহায্য করেছে যেমন তেমনই গৌতম ঘোষের আবহ রচনা নাট্যচলনকে সঙ্গ দিয়েছে যথাযথ ভাবে। দেবাশিস মুজমদারের নির্দেশনার কাজ তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা এবং মননের পরিচায়ক। শেষ দৃশ্যে স্কুলের হাতবোমা ছুড়ে বাড়িটাকে চুরমার করে দেওয়ার মুহূর্তটি দর্শকের মনে থাকবে বহুদিন, যদিও বাবল দাসের আলো সঠিক ভাবে প্রক্ষিপ্ত হতে ব্যর্থ হয়েছে।

কুশীলব

নির্দেশক-অভিনেতা অশোক মুখোপাধ্যায় বাংলা নাট্যজগতের একটি শীর্ষস্থানীয় নাম। বহু হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত কিন্তু কখক অশোক মুখোপাধ্যায়কে বাংলা থিয়েটারের দর্শক নতুন করে আবিষ্কার করলেন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের লেডি রাণু মুখার্জি মঞ্চে, থিয়েটার ওয়ার্কশপের উনপঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তাঁদেরই নবতম প্রযোজনা 'কুশীলব' নাটকটির উপস্থাপনে। তবে এই কথক যে পুরাণ কাহিনির ব্যাখ্যা করলেন তা আমাদের দেশের স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক ও থিয়েটার ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঘন্তিত আখ্যান, পঁচাত্তর বছরের এক থিয়েটারকর্মীর জীবনের নানান ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের কথা। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কাহিনি অবলম্বনে অশোকবাবু নাটকটিকে সাজিয়ে একক অভিনয়ে মঞ্চে উপস্থিত করেছেন।

তাঁর কাহিনি শুরু হয় ওপার বাংলায় জন্ম ও প্রথম কৈশোরের নিমগুলির বৃত্তান্ত দিয়ে। তারপর দেশ ভাগ, ধর্মান্ধতার সঙ্গে পরিচয়। এপারে চলে আসা, পড়াশুনো, কমিউনিস্ট রাজনীতিকে সমর্থন ও ক্রমে একাত্মতা গড়ে ওঠা। স্কুলে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে নাটক-লেখা, দল গড়া, দলেরই একজনকে বিয়ে করা এবং সেই দল থেকে বিতাড়িত হওয়া, নকশাল কর্মীকে আশ্রয় দেবার কারণে মিসায় বন্দি হওয়া, ফলে চাকরি ও স্ত্রী দুই-ই হারানো— এইভাবে তার যাপিত জীবন চলতে থাকে আর সমান্তরাল ভাবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতে থাকে। বর্তমানে টিভি সিরিয়ালে সংলাপ রচনা করে পেট চলে তার। তারই মধ্যে সে অনটন আর অসুস্থতায় ক্লিষ্ট অভিনেত্রী-সহকর্মীকে আশ্রয় দেয়। তার কথন শেষ হয় তাকে ঘিড়ুনা থেকে বাঁচাতে সেই অভিনেত্রীর আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার কথা দিয়ে। কিন্তু এই পুরাণ কথাটি যেন এক খণ্ডকথা হিসেবেই থেকে গেল—সম্পূর্ণ হল না, কারণ বহু রাজনৈতিক ঘটনা যেমন থাকল উহ্য, তেমনই বহু নাট্যজগতের কথাও অনুল্লিখিত থেকে গেল। বাহাত্তরের নির্বাচনের কুখ্যাত কারচুপি এবং তারপরে বিরোধীপক্ষহীন কংগ্রেসি শাসনে যে বীভৎস ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে ইতিহাস তার যেমন কোনও উল্লেখ পাওয়া গেল না, তেমনই বামফ্রন্ট শাসনের চৌত্রিশ বছরের অজস্র স্খলন আর শেষের বছরগুলিতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মতন ঘটনা এবং একটি নতুন শক্তির উত্থান ওই রাজনৈতিক ভাবে সচেতন নাট্যকর্মীকে কীভাবে আন্দোলিত করেছিল তা জানার আগ্রহ নিরুত্ত হল না। বাদ থেকে গেল জাতীয় রাজনীতিতে এবং সংস্কৃতিতে কমিউনিস্টদের ভূমিকার কথা। সমানভাবে ঘাট-সত্তরের সেই অরাজক

কিন্তু এই পুরাণ কথাটি যেন এক খণ্ডকথা হিসেবেই থেকে গেল—সম্পূর্ণ হল না, কারণ বহু রাজনৈতিক ঘটনা যেমন থাকল উহ্য, তেমনই বহু নাট্যজগতের কথাও অনুল্লিখিত থেকে গেল।

অস্থির সময়ে নাট্যজগৎকে কেমন ভাবে ধ্বস্ত করার চেষ্টা হয়েছিল সে কথাও জানা গেল না। কার্জন পার্কে পুলিশের গুলিতে নিহত প্রবীর দত্ত, রাজনৈতিক গুন্ডাদের হাতে মারা যান থিয়েটার ওয়ার্কশপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সতোন মিত্র, সফদার হাসমির মতন নাট্যব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় বিল্লিতে— এক সচেতন ত্রিস্তাশীল নাট্যকর্মীর আক্ষেপকে এইসব ঘটনার উল্লেখ না থাকাটা কি আশ্চর্যের নয়?

অশোক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় নিয়ে আলোচনা করাটা অনাবশ্যক। তবে তাঁর রূপসাজটিতে কৃত্রিমতার ছাপ থাকায় সময় সময় দৃশ্যগত ভাবে চরিত্রানুগ মনে হয় না। বাবল দাসের আলোর কাজ আরও অনেক সরলীকৃত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কঙ্কন ভট্টাচার্যর আবহ দর্শকদের এনে দিল জোতিরিন্দ্র মৈত্রর গান। তিনি নিজে এবং তাঁর সহ-শিল্পীরা— প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় রায়, রেবা রায়চৌধুরী প্রমুখ যাতে সংযুক্ত, সেই 'নব জীবনের গান'-এর দলের গলায় গানগুলি শোনবার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ হল। অবাক্তি লাগে নীল কৌশিকের মঞ্চসজ্জায় প্ল্যাটফর্ম, ফ্রেম, পর্দার ব্যবহার। ফ্রেমগুলির কারণে অশোকবাবুর মঞ্চব্যবহারও বাধাপ্রাপ্ত হয়। মাথা হেঁট করে, ফ্রেমের বেরিয়ে থাকা অংশকে পাশ কাটিয়ে প্ল্যাটফর্মে ওঠা-নামা সব ক'টি সঞ্চরণই সাবলীলতা হারায়। সাধারণ দু'টি চেয়ার, একটি বইয়ের শেলফ জাতীয় আসবাব ব্যবহারে কী ক্ষতি ছিল?

কলকাতার মঞ্চে এই সময়েই আর একটি নাটকে রবীন্দ্রনাথের মনোরের শ্বশুরবাড়ি সংক্রান্ত কিছু সংলাপের সঙ্গে এই নাটকটির সংলাপের অদ্ভুত সাদৃশ্য দর্শককে অবাক করে।

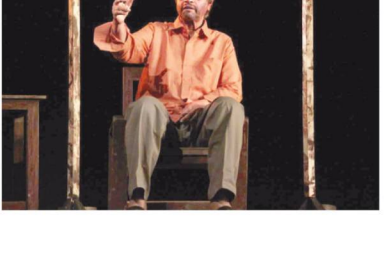
'কুশীলব' নাটকে একক অভিনয়ে অশোক মুখোপাধ্যায়

আইনসিদ্ধ

কাফকার 'দ্য ট্রায়াল' অবলম্বনে তীর্থঙ্কর নন্দর নাটক 'আইনসিদ্ধ' উপস্থাপন করলেন সংস্তব, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়, গিরিশ মঞ্চে। কাফকার রচনা নিয়ে কাজ অবশ্যই এক কঠিন চ্যালেঞ্জ কারণ কাফকাকে আত্মস্থ করে তাঁর কাজকে রূপায়িতে করা যতটা কঠিন, তার

থেকেও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ঘিয়েটারের সাধারণ দর্শকের কাছে কাফকাকে পৌঁছিয়ে দেওয়া। সস্তুত চ্যালেঞ্জটি নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বলতে বাধা নেই সেভাবে সফল হতে পারেননি, যতটা তাঁরা পেরেছিলেন হাতেলের রূপান্তর থেকে নেওয়া 'পর্ণধাবী' নাট্যটিতে।

কাফকার এই অসমাপ্ত উপন্যাসটি জোসেফ টি-র কাহিনি, যে হঠাৎ একদিন জানতে পারে যে, সে কোনও এক বা একাধিক অপরাধের কারণে বন্দি। প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সে জানতে চেষ্টা করে তার অপরাধ কী— কেনই বা সে আগাতবন্দি, কিন্তু কোনও উত্তর পায় না। এবং শেষে তাকে মরতে হয়। তাঁর রচিত ঘটনার অবাস্তবতা বা অ্যাবসার্ডিটি, চরিত্রের বক্তব্যের অ্যাম্বিগুইটি, তাঁর সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং সর্বোপরি দম বন্ধ করা পরিবেশে অযৌক্তিক বিচারব্যবস্থার সমান্তরালে চলা অমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থার এক বিষণ্ণতার ছবি হয়ে উঠেছে এই নাটক— কাফকা যাকে বলেছিলেন 'আইস অ্যাক্স', যা আমাদের মনের গভীরে জমাট বাঁধা অন্ধকারের বরফকে কেটে সাফ করে দেয়। খুবই স্বাভাবিক, তীর্থঙ্কর কেন, কোনও নাটককারের পক্ষেই ওই 'কাফকাএক্স' রূপকল্পটিকে রূপায়ত করা সহজ নয়। ফলে নাটককার খুবই সাবধানী গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন তাঁর ইন্টারপ্রিটেশনকে এবং দর্শকের কাছে পৌঁছিয়েছেন সমসাময়িক শাসন ব্যবস্থাকে সামনে রেখে 'আইন-আইনের-পথে-চলবে' এই শব্দবন্ধটিকে ধরে। এর ফলে ব্যক্তির সঙ্গে প্রশাসনের সংঘাত, আইনযন্ত্রের কুশলী ব্যবহার, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে কাফকার যে-সার্বজনীন ভাষ্য তা অধরাই থেকে যায়।

কাফকা-সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে জোসেফ টি এক অন্যতম জটিল চরিত্র। তাকে বুঝতে পাঠককে উপন্যাসটি পড়তে হয় বার কয়েক। রক্তমাংসে তাকে মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা যে তার থেকেও দুরূহ কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নাটককারের উপর তাই চরিত্রটিকে যথাসম্ভব কাফকা-সুলভ করার দায় বর্তায় আর অভিনেতাকে রূপ দিতে হয় নাটককার অনূদিত চরিত্রটির সঙ্গে তাঁর নিজস্ব বোধে জন্ম নেওয়া চরিত্রটির একটি সমঝোতায়। এই ধরনের জটিল চরিত্র রূপায়ণে ছিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই অগ্রস্থানীয়। ক্লস্ট্রোফোবিক অবস্থাটি তিনি তাঁর অসাধারণ সেরিব্রাল অভিনয়ের কুশলতায় ফুটিয়ে তুললেও নাটককার চরিত্রটিকে প্রায় এক ধরনের লিনিয়ারিটি দেওয়ায় ছিজেন কিছুটা অস্বচ্ছন্দ ছিলেন। তবে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ, সংলাপের প্রতিটি শব্দের যথাযথ ওজন মেপে উচ্চারণ অথবা বিরাম-মুহূর্তগুলিকে ব্যঞ্জিত করে তোলার ক্ষমতা তাঁর চরিত্রটিকে বাস্তবের স্বাদ এনে দিয়েছে। প্রশাসনের হাস্যকর যান্ত্রিকতা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করেছেন শেখর চক্রবর্তী। শুভঙ্কর রায়ের বিচারপতি, পার্থসারথি সেনগুপ্তের শিল্পী, সুনীল মুখোপাধ্যায়ের মক্কেলবৃন্দ, সুব্রত সমাজদারের সেজ কাকা ছিল চরিত্রানুগ। অমৃতা মুখোপাধ্যায়, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কঙ্কাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔমিত্র দাস, সুস্নাত আচার্য ও দেবাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের ছোট ছোট কাজগুলি করেছেন নির্দেশনা মেনেই। তবে অনেকের সংলাপ বলায় বা মঞ্চ ব্যবহারে বেশ কিছু বিচ্যুতি নজরে আসে। সৌমিক-পিয়ালীর মঞ্চভাবনা ছোট পরিসরের মঞ্চে কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা কঠিন, তবে দরজাগুলি যেহেতু নাট্যটিতে গুরুত্বপূর্ণ তাই তাদের পরিকল্পনায় আর একটু চিন্তার প্রয়োজন ছিল। বাদল দাসের আলো নাট্যভবনে যথাযথ সাহায্য করেছে। গায়ক ও তার সঙ্গিনী চরিত্র দু'টির প্রয়োগ নাট্যগঠনে সাহায্য করে কিন্তু অন্য দিকে দ্বার-রক্ষকের রূপক রূপটিকে আরও অর্থবহ করে তুলতে পারত তার পোশাক। স্বল্পবয়সী ধী মজুমদার আবহ রচনা করেছেন, তবে নাটকে আক্ষকাল এত বেশি বব ডিলান ব্যবহৃত হচ্ছে যে দর্শককে তা নতুন কোনও বার্তা দিতে ব্যর্থ।

'আইনসিদ্ধ'-র একটি দৃশ্য। কাফকা-র লেখা 'দ্য ট্রায়াল' অবলম্বনে সংস্তব-এর নাটক

ট্রাজেডি পলাশবাড়ি

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের লেডি রাণু মুখার্জি মঞ্চে প্রস্তুত চতুর্থ ত্রাত্যজন আন্তর্জাতিক নাট্য আয়োজনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন ওই দেশের অন্যতম অগ্রগামী নাট্যদল প্রাচ্যনাট, তাঁদের সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা 'ট্রাজেডি পলাশবাড়ি' নাটকটি নিয়ে। প্রচারপত্রে নাটককারের পরিচয় অবশ্য কোথাও উল্লেখ নেই। নির্দেশক আজাদ আবুল কালাম। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকার পলাশবাড়ি অঞ্চলের রেডিমেড বস্ত্র তৈরির অন্যতম প্রতিষ্ঠান স্পেকট্রাম সোয়েটার অ্যান্ড নিটিং ফ্যাক্টরির ন'তলা বাড়িটি ভেঙে পড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সেই ঘটনাকে নিয়েই নাটকটি রচিত, যদিও এক গ্রামা মেয়ের জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি এই নাটকের মূল উপজীব্য। সরল জীবনযাপনে বেড়ে ওঠা মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল এক পাগল ছেলের সঙ্গে, যে কোনও এক মানসিক ভারসাম্যহীন মুহূর্তে তাকে আলাক দিয়ে দেয়। তারপরই সংবিধ ফিরে পেয়ে মেয়েটির কাছে সে ফিরে আসে, কিন্তু তাতে বাধা দেয় গ্রাম্য সমাজ এবং চরম শাস্তির বিধান হাঁকে। তাদের হাত থেকে বাঁচতে তারা দু'জনে পালিয়ে যায় ঢাকা শহরে। সেখানে পাগল স্বামীকে নিয়ে তার বিস্তৃকানার শেষ থাকে না এবং একদিন ছেলেটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মেয়েটি পলাশবাড়ির সোয়েটার তৈরির প্রতিষ্ঠানে কাজ পায় এবং সেখানকার এক কর্মীর সঙ্গে নতুন ভাবে জীবন গড়ার পথে এগোয় আর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। জীবনের ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে এক নাইট শিফটে কাজে গিয়ে বাড়ি ভেঙে চাপা পড়ে আস্তে আস্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে শেষ হয়ে যায় তার জীবন। এই কাহিনির সমান্তরালে নাটককার সোয়েটার কোম্পানির বাড়ি ভেঙে পড়ার মর্মন্তুদ ঘটনাটিকে রেখেছেন এবং সমাজব্যবস্থা আর রাষ্ট্রব্যবস্থার গলদগুলিকে ইঙ্গিত করেছেন স্পষ্ট ভাবে।

ছ'টি চরিত্র নিয়ে নাট্যটি সাজানো এবং মেয়েটি বাদে অন্য অভিনেতারা একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই চরিত্রগুলির সংলাপ অত্যন্ত সীমিত এবং সমগ্র নাট্যটি মেয়েটির মনোলগের উপর নির্ভরশীল। এর ফলে মেয়েটির চরিত্রাভিনেতা পরভিন পারুকে প্রচুর ভার নিতে হয়েছে এবং তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণ

করেছেন। তাঁর আঙ্গিক তথা বাচিক অভিনয়ে নিবিড় কর্মশালার ছাপ স্পষ্ট। পশ্চাৎপটে ভিডিওর প্রয়োগ প্রায় চলতি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন, তবে তার প্রক্ষেপণ পরিকল্পনায় আরও নজর প্রয়োজন ছিল। আবুল হাসনাত ভুঞা রিপনের মঞ্চ পরিকল্পনা, আফসানা আনওয়ারের মঞ্চসজ্জা এবং বিলকিস জাহাঁ জোবার সাজের পরিকল্পনা তারিফ পাবার যোগ্য। নীল কামরুলের আবহ আর স্নাতা শহরিন ও মহঃ ফরহাদ আহমেদের কোরিওগ্রাফি ভাল লাগে। নাট্যচলনে একটি গতি রেখে নির্দেশনার কাজে চিন্তার ছাপ পাওয়া গেল। তবে দর্শককে বিমোহিত করে দেয় নাটক দেখে বেরিয়ে আসার পথে সেই মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষটাকে বিষয় করে নির্মিত একটি ইনস্টলেশন।

সুব্রত ঘোষ

অবিচ্ছেদ্য

বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের কল্যাণময়তার অন্য পিঠটিতেই থাকে অভিশাপের অন্ধকার। আবিষ্কারের সুফল সঙ্গে নিয়ে চলে এক কৃষ্ণছায়াকেও, যা আমাদেরই অজান্তে দীর্ঘ হতে থাকে আমাদের অবচেতনে। সেই মসীবর্ণ ছায়াপথে কী অসহায় দাঁড়িয়ে থাকি আমরা, সেই নিয়তি ইঙ্গাপুর আলেয়া গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'অবিচ্ছেদ্য'। নাটক সংগীতা চৌধুরী, নির্দেশনা শুভেন্দু মজুমদার। নীল ও মৌ শহরের উচ্চশিক্ষিত দম্পতি, তাদের আদরের একমাত্র সন্তান পুপু। তিনজনের আপাত নিস্তরঙ্গ সুখী জীবনে আচমকাই ঢেউ তোলে লক্ষ্মী নামের এক নারীর সংযোগসূত্র। গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেই মানুষটির অস্তিত্ব, নিজেদের সামাজিক জীবনে স্বীকার করতে চায় না নীল-মৌ। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত পরিসরে তারা ডুর্ভাবনাগ্রস্ত, পরস্পরের প্রতি প্রশ্নাকুল। পুপু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না বাবা-মার এই আকস্মিক পরিবর্তন। ক্রমে তার কাছে প্রকাশ হয়, নিজের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে এই নারীর যোগ

ইঙ্গাপুর আলেয়া প্রযোজিত 'অবিচ্ছেদ্য' নাটকের একটি দৃশ্য

নিবিড়। বিজ্ঞানের সহায়তায়, পুপু-র জন্মের জন্য তাদের পারিবারিক বন্ধু ডা. আবির রায় সাহায্য নিয়েছিলেন সারোগেসি-র।

বিপুল অর্থ প্রাপ্তির আশ্বাসে গ্রামের গরিব মানুষ কার্তিক রাজি হয়, তার বউ লক্ষ্মী গর্ভে ধারণ করবে মৌ-এর ভ্রূণটিকে। গ্রামের সরল বধূর কাছে অবিশ্বাস্য এই প্রস্তাব। তবু নিজের পুত্রসন্তানটির ভবিষ্যৎ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে সে রাজি হয়। সময় যায়, গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি এক চোরা টান তাকে পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিয়ে দিতে থাকে। সন্তান জন্মানোর পর তাকে দিতে

সন্তোষপুর আরশি থিয়েটার গ্রুপ-এর প্রযোজনা 'গল্প হলেও সত্যি'

নারাজ লক্ষ্মীর কোল থেকে একরকম ছিনিয়েই নিয়ে যাওয়া হয় পুপুকে। থাকতে না পেরে সন্তানকে শহরে দেখতে যায় লক্ষ্মী, কিন্তু তার উপস্থিতি যেন অসহ্য হয়ে ওঠে নীল-মৌয়ের পক্ষে, বিশেষত মীল আশঙ্কা করতে থাকে এই বুঝি লক্ষ্মী তার সন্তানকে দাবি করে বসবে। প্রায় বিত্তাড়িতই হয় লক্ষ্মী। আর কোনওদিন সন্তানকে দেখা হয় না তার। সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদের শোকে সে প্রায় উন্মাদ হয়ে যায়। বাবার মুখে সব শুনে হাসপাতালে ছুটে যায় পুপু, এবং এক দুর্দান্ত ক্রাইমাক্সের সাক্ষী থাকেন দর্শক।

আগাগোড়া একটি চাপা সাসপেন্স নাটকটির ছন্দকে ধরে রাখে শেষাবধি, মানবিক একটি প্রেক্ষিত থেকে দর্শকও কখন যেন একাত্ম হয়ে পড়েন লক্ষ্মীর অসহায়তা বা মৌ-এর নিরাপত্তাহীনতার গোপন আর্তির সঙ্গে। এবং এখানেই নাটককারের সাফল্য যে, সামাজিক নাটক হওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত মেলোড্রামা গ্রাস করে না বিষয়টিকে। নীলাভ চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চভাবনা প্রশংসনীয়, বিশেষ করে নীল-মৌ-এর ফ্ল্যাটের বারান্দাটি। ওইখানে দাঁড়িয়েই নীল তার সন্তানকে শোনায় তাদের জীবনে গোপন সত্য, যেন নিয়ন্ত্রিত শহরে আবাসচুক্তির মধ্যে ওইটুকুই প্রত্যেকের নিজস্ব 'স্পেস'। ভাল লাগে গ্রামের পরিবেশ সৃষ্টির মঞ্চোপকরণও। জন্তু মুখোপাধ্যায়ের আলো ও দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবহ যথাযথ। মাতৃত্বের যে-দাবি নিয়ে দুই মায়ের মধ্যে চাপা সংঘাত, সেখানে সামান্য উচ্চকিত অভিনয় সংগীতা চৌধুরীর। কিন্তু গ্রামের মেয়ের চরিত্রে ওঁকুকে মানিয়ে যায়। দুর্দান্ত তাঁর স্বরক্ষেপণ। এবং সংগীতার অভিনয়কে সাম্যাবস্থায় রাখে এনা সেনগুপ্তর 'মৌ'। পরিমিত অথচ তীব্র অভিনয়ে তিনি রীতিমতো দাগ কেটে যান দর্শকের মনে। বেশ কয়েকটি তারিফযোগ্য নাটকীয় মুহূর্ত

তৈরি হয় সমগ্র নাটক। যেমন লক্ষ্মীর গর্ভে কান পেতে অনাগত সন্তানের স্পন্দন শোনে মৌ, বা কৃত্রিম গর্ভ তৈরি করে অনুভব করতে চায় 'মা' হওয়ার আনন্দটুকু, অজানিত প্রতিক্রিয়ায় যাকে পরিহাসে পরিণত করে নীলা। আগাগোড়া সুসংবদ্ধ ও স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে নাট্যচলনকে কোথাও টিকে হতে দেন না কার্তিকের চরিত্রে স্বয়ং নির্দেশক শুভেন্দু মজুমদার। 'পিসি' চরিত্রে শিপ্রা মুখোপাধ্যায়ের গ্রাম্য বুদ্ধিসুলভ বাচনভঙ্গি ও তীক্ষ্ণ বয়স্ক কণ্ঠস্বর অনবদ্য। বাকি চরিত্রগুলি যথাযোগ্য সংগত করেছেন।

গল্প হলেও সত্যি

পুরনো মনকে নতুন বোতলে নয়, পুরনো বোতলেরই মোড়কে পরিবেশন করলে, পারস্পরিক তুলনায় ঘটমানতা অনিবার্য। আর অনামধন্য বাক্তিবর্গের করা বহু প্রশংসিত কাজকে নতুন করে পরিবেশন করা হলে, পুরনোর সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তের তুলনার সম্ভাবনা নাট্যকারের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার এক যোগ্য দাবিদার। কিন্তু পুরনোর 'এসেন্স'টি ঠিকঠাক ধরে রাখা গেলে কেমন চমৎকার প্রাপ্তি ঘটে, তারই নমুনা সত্যেষপুর আরশি থিয়েটার গ্রুপ-এর প্রযোজনা 'গল্প হলেও সত্যি' নাটকটি। নাট্যকার ও নির্দেশক সুমন অধিকারী। হাটের দশকের এক বাঙালি পরিবার, কাজের ঠেলায় সে বাড়িতে পরিচারক টেকে না। সেখানে আগমন ঘটে অচেনা 'কাজের' লোক ধনঞ্জয়ের। কাজ করতে এসে কীভাবে যেন পরিবারের সদস্যদের একেবারে মনের কাছাকাছি পৌঁছে যায় সে। তারই চোখ দিয়ে প্রত্যেকে দেখে পরস্পরকে এবং নিজেকেও, বোঝে হাতটুকু বাড়িয়ে দিলে বাকিটা এমনিই হয়ে যায়।

মূল গল্পটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন নির্দেশক, নিখুঁত বুনটের কারণে কোথাও বিক্ষিপ্ত বলে মনে হয় না নাট্যরূপটিকে। যথাযথ সম্পাদনা করেছেন বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাপস চৌধুরী ও সত্যেষপুর আরশি-র যৌথ মঞ্চসজ্জা প্রশংসনীয়। তিন ভাই এবং এক ভাইপো-র ঘরের পৃথকীকরণ বোঝাতে প্রত্যেকের বাক্তিগত গছন্দকে ঘরের দরজা হিসেবে ব্যবহার করে সেট সাজানোর ভাবনাটি অনবদ্য। বিশ্বনাথ দে-র আলোর ব্যবহার ভালো। প্রত্যেকেই ভাল অভিনয় করলেও পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে বাবা মলিলাল ভৌমিক, বড় ভাই প্রবাল ভর, ঝি পায়েল সামন্ত এবং ধনঞ্জয়ের চরিত্রে অভিনয়কারী সুব্রত বর্মন-এর নাম। নাটকটি ত্রুটিহীন নয় যদিও। চাপেরী ভৌমিক বড় বউয়ের চরিত্রে আড়ষ্ট। কথায় কথায় তাঁর ঘোমটা টানার মানারিকম একসময় একঘেয়ে হয়ে ওঠে। সংলাপ উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট, অত দ্রুত সংলাপ বলার প্রয়োজন কী ছিল, তাও বোঝা গেল না। আর খোকার চরিত্রটি যেন হুবহু সিনেমা থেকে তুলে আনা। অভিজিৎ দাসের হাঁটাচলা, কথাবলা এমনকী স্বরক্ষেপণও এমনই অবিকল, যা কোনও কোনও সময় অতিরিক্ত বলে মনে হয়। তবে এর কোনওটাতেই নাটক দেখার আনন্দ এতটুকু কমে না। সব মিলিয়ে, চমৎকার উপস্থাপনায় মন ভাল করে দেওয়ার মতো একটি প্রযোজনা।

জয়শ্রী রায়

চিত্র কলা

শিক্ষাসত্রের একাগ্র শিল্পতর্পণ

কলাচর্চা আঁকড়ে থাকতে পারার পূর্বশর্ত যে-বাণিজ্যিক সফলতা, তাকে অগ্রাহ্য করার জোর আজও অমিল নয়।

বাণীচক্র প্রতিষ্ঠানটি বহু বর্ষকাল কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে সংগীতের চর্চা অব্যাহত রেখেছে। সংগীতের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানে চিত্রকলার শিক্ষাও সমানতালে চলে এবং তারই প্রমাণ পাওয়া গেল এই প্রদর্শনীতে। অ্যাকাডেমির দর্শকভার অতিক্রম করে শেষপ্রান্তে থাকা যে-প্যালারিতে প্রদর্শসজ্জার বিশেষ সুযোগ প্রায় অনুপস্থিত, সেখানেই দ্বারমুখে প্রদর্শিত একটি ছবি ছিল বিশেষ উল্লেখের দাবিদার। ছবিটির অঙ্কনশৈলীতে বিশেষ কোনও স্বতন্ত্র গুরুত্ব নেই বলাই সঙ্গত। সহজ ভঙ্গিতে পরিকল্পিত এই ছবিটিকে অনবদ্য ঘরানার উত্তরসূরি ভাবাই যায়, আকারে ও বিস্তারে মিল সেরকমই। বাণীচক্রের এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ছবির সংখ্যা ছিল প্রচুর। শিল্পীর সংখ্যাও যথেষ্ট। অথচ ব্যঙ্গাত্মক বিষয়-বর্ণনার সৌকর্যে বরীয়ান এই ছবিটি অবশ্যই স্বতন্ত্র।

ছবিটির শিল্পী চন্দ্রভানু পাল। প্রায় মধ্যবয়সী। তিনি জানালেন বাণীচক্রের শিল্পচর্চার নানা কথা। বহুকাল থেকে চালু এই বিভাগে ছাত্র ও শিক্ষকের ভেদরেখা তেমন নেই। আজ এখানে যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের অনেকেই এখানে তালিম পেয়েছেন। শ্রীপাল জিজ্ঞাসিত হয়ে জানালেন, তিনি, এবং আরও অনেকেই, পুরো সময়ের শিল্পী। কলাচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ থাকতে পারার পূর্বশর্ত হল বাণিজ্যিক সফলতা। অ্যাকাডেমির এই প্রদর্শনীটি দেখলে তা এঁদের করায়ত্ত নয় বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বাণীচক্রের শিক্ষকতা ও সম্ভাব্য প্রাইভেট টিউশনসে সম্বল করে কলাচর্চা অব্যাহত রাখা অবশ্যই মানসিক দৃঢ়তা ও শিল্পকলায় একাগ্রতা প্রমাণ করে। শ্রীপালের ছবিতেও তার রেশ পাওয়া গেল।

শ্রীপালের ছবির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিল্পঘরানার নৈকট্যের কথা আগেই বলেছি। কলকাতার আর্ট কলেজে অবনীন্দ্রনাথের হাতে প্রবর্তিত ধারার অঙ্কনচর্চা আজও অব্যাহত। বাণীচক্রের শিল্পশিক্ষাসূচিতেও সম্ভবত তার অন্যথা হয়নি। সেই অগুচিরের সীমিত পরিসরে শ্রীপাল এঁকেছেন এক শিল্পীর চিত্রকথা। বলা উচিত বাঙ্ময়কথা। শ্রীপালের আঁকা শিল্পী মাটিতেই বসেন, ধুতি পরেন, উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, শরীর গঠনের ইঙ্গিতেই শ্রীপাল

শিরোত্যাগী শিল্পী। চন্দ্রভানু পালের আঁকা ছবি

বেশ বলে দিয়েছেন এই শিল্পীর জাত। স্টুডিও আসবাবহীন, তা শিল্পীর আর্থিক অসচ্ছলতার ইঙ্গিতবহ মনে করাও হয়তো যায়। লাল রঙের মেঝেতে সাবেক কলকাতার প্রাচীনত্ব। এমনতর আবহে এই শিল্পী জলরঙের অনবদ্য-ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে মনোনিবেশ করেছেন তৈলচিত্রে। শিল্পীর সামনে অকলঙ্ক ক্যানভাসে সবে ফুটছে শিল্পীর রেখাঙ্কন। পেছনেও আর-এক ক্যানভাস উল্টে রাখা। পেশাদার তৈলচিত্রীর মতো বিশাল বালতি সদৃশ পাত্রে অজস্র তুলির সমাহার। শিল্পীর হাতেও একাধিক। অর্থাৎ অবনীন্দ্র-ধারায় জারিত এক শিল্পী অন্যতর মাধ্যমে চিত্রায়িত করছেন নিজমানস। আর এই বিষয় কার্যে রত হতে গিয়ে ত্যাগ করেছেন নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা। অঙ্কনরত শিল্পী তাই বক্তা। দেহ আছে সুঠাম, সর্ব অঙ্গ চালু আপন আপন কর্মে, কেবল মাথা নেই। ছবি আঁকার সময় শিল্পী সযত্নে আপন মাথাটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন।

এক সহজ বর্ণনাভঙ্গি আশ্রয় করে শ্রীপাল সমকালীন চিত্রচর্চার বর্তমান আবহে কথাঘাত করতে চেয়েছেন। বেশ পেরেওছেন। সকলে নিশ্চয় শিল্পীর অঙ্কিত বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হবেন না, কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে ভাববে বাধ্য হবেন। এটাই শ্রীপালের চিত্রসাফল্য। অবশ্য প্রদর্শিত অপর এক চিত্রে শ্রীপাল ফিরে গেছেন এই ঘরানার বিষয়গুণ্ডিতে। এঁকেছেন হোলি উৎসব। রঙের বর্ষণে রাঙানো হচ্ছে তিন রমণীকে। একা কৃষ্ণ করে লীলা সাথে লয়ে বহু পিচকারি। বর্ণনার সৌকর্য ও গুরুত্বে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু চোখে আসে না।

নেহাতই আকাডেমির কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছবি দেখার সূত্রে পৌঁছে গিয়েছিলাম বাণীচক্রের এই প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে শিল্পীসংখ্যার আধিক্য ছিল আকাডেমির সাম্প্রতিক ঐতিহ্যেরই পরিপূরক। সকলের স্বতন্ত্র আলোচনা অবশ্য অসাধ্য। তবে আরও একটি ছবি চোখে এল, যার সপ্রশংস উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য। ছবির শিরোনাম 'এভিং টাইম', শিল্পী লালটু কর। মিশ্র মাধ্যমে আঁকা নাতিবৃহৎ এই ছবির প্রায় সর্বাংশ জুড়ে আছে এক ভগ্নপ্রায় কাষ্ঠাসন। পাশে, পেছনে আরও ভাঙা চেয়ারের সহাবস্থান এবং তারই মধ্যে মাথা উঁচু রেখেছে এক অর্ধভগ্ন কাঠের চেয়ার। পূর্ণচন্দ্রসম উজ্জ্বল নীলাভ আলোয় মাখা সেই কাষ্ঠ-শরীরে ফুটেছে সেই চেয়ারের আত্মকথা। তার আসন হয়তো অলঙ্কৃত হয়েছে বহু গুণীজনের নিতম্বস্পর্শে। ওই গদি থেকেই হয়তো শাসিত হয়েছে কত জনপদ, নির্ধারিত হয়েছে কতজনের ভালমন্দ ভাগ্য। আজ সেই চেয়ারের আয়ু শেষ। তার ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে এসেছে একটি কাক। তার ঠোঁট থেকে ঝুলছে কালের অন্তিম ইঙ্গিতবাহী একটি ঘড়ি। চমৎকার রূপক, দক্ষ রূপায়ন।

অরুণ ঘোষ

সংগীত

অন্য রূপে দেবীর বোধন

দুর্গা রাগের উপর আমানের দখল প্রশংসনীয়। রাগের মিষ্টত্ব প্রকাশ পায় তাঁর বাজানো বিস্তারগুলিতে।

দুর্গোৎসবের সূচনা ম্যাডক্স স্কোয়্যারের বালিগঞ্জ দুর্গাপুজা সমিতিতে একটু অন্যরকমের অনুষ্ঠান দিয়েই হল। মহাপঞ্চমীর সন্ধ্যায় পুজো উদ্বোধনের অনুষ্ঠান তাঁরা সাজিয়েছিলেন আমান আলি খানের সরোদ বাদন দিয়ে। এর আগে ২০১০-এ ম্যাডক্স স্কোয়্যারের দুর্গাপুজোর ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপক বাজিয়েছিলেন আমান। অশীতিতম বর্ষে এসেও তিনিই উদ্বোধন করলেন সেই পুজো।

আমান অনুষ্ঠান শুরু করেন রাগ পুরিয়া ধানাশ্রী দিয়ে। আওয়ার শুরু করতেই সুর কেটে যায় সাউন্ডের গোলযোগে। চারদিক খোলা স্টেজে ক্ষণদী সংগীত পরিবেশন এমনিতেই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। আর তার উপর মাডক্সের ভিড়, আশপাশের কলরব, বাইরের ঢাকের আওয়াজে যে-কোনও শিল্পীর পক্ষেই মনঃসংযোগ করা বেশ চ্যালেঞ্জিং। আওয়ার বেশ আলগা হলেও, আমান অনুষ্ঠানের হাল ধরেন তানপর্ব শুরু হওয়ায়। ছোট-ছোট ঠাস বুনটের তান এবং তেহাইয়ে রাগের রূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন তিনি। নবীন শিল্পীদের মধ্যে অতি দ্রুত লয়ের তান পরিবেশনের একটা ঝোঁক থাকে। আমানও তার ব্যতিক্রম নন। তবে গতির সঙ্গে আমানের তানগুলিতে রাগের এক ভয়ঙ্কর রস প্রস্ফুটিত হয়, যা রাগটিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। তবলায় যোগ্য সঙ্গত করেন বিক্রম ঘাটে।

পুরিয়া ধানাশ্রীর পরেই আমান শোনান রাগ দুর্গা। সংক্ষিপ্ত আওয়ার শুনিয়ে তিনি বাজান একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গাত তিনতালের উপরে। জনপ্রিয় ধুনের একটা বিশেষত্ব হল, তা খুব সহজেই শ্রোতাদের একাত্ম করে নিতে পারে। এক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হল। দুর্গা রাগের উপর আমানের দখল প্রশংসনীয়। রাগের মিষ্টত্ব প্রকাশ পায় তাঁর বাজানো বিস্তারগুলিতে। আড় লয়ের তান, ছিগুণ, তিনগুণ এবং চতুর্গুণ লয়ের তানের যে-পারদর্শিতার সঙ্গে তিনি শোনান, তা সত্যিই অনবদ্য। তাঁর ঝোড়ো তানের মাঝে সঙ্গতকার বিক্রম ঘাটের তিনতালের কয়েকটি কায়দা শ্রোতাদের আরও উস্কুসিত করে তোলে।

আমানের তৃতীয় পরিবেশনা রাগ দেশ। আলাপ খুব একটা চমকপ্রদ না হলেও জোড় এবং ঝালা খুব যত্ন নিয়ে বাজান তিনি। তবে ঝালার পর রূপক তালে যে গাতটি বাজান তিনি, তা সেভাবে মনে দাগ কাটে না। সন্ধ্যার উদসমুখর রূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্যই বোধহয় তিনি বেছে নেন রূপক তাল। বিস্তারের অংশগুলি বেশ ফিকে মনে হয় তানপর্বের সামনে। তবে দ্রুততর লয়ে তিনতালে তিনি যে গাতটি বাজান, সেটি বেশ

ম্যাডক্স স্কোয়্যারের সংগীত অনুষ্ঠানে আমান আলি খান

মনোরঞ্জক লাগে। তানগুলি গতির পাশাপাশি মিষ্টত্বেও মন কেড়ে নেয়।

সবশেষে তিনি একটি ভাটিয়ালি ধুন বাজান এবং ভাটিয়ালির মাঝে রবীন্দ্রনাথের 'একলা চলো রে' বাজিয়ে শ্রোতাদের আবদারও মেটান। ভাটিয়ালি ধুনটি বেশ পরিচিত এবং আমানের বাদনকৌশল তাকে এক অন্য রূপদান করে।

অংশুমিত্রা দত্ত

জীবনী • স্মৃতিকথা

ভারতী রায়
একাল সেকাল পাঁচ প্রজন্মের ইতিকথা ২৫০.০০

মান্না দে
জীবনের জলসাঘরে ৩৫০.০০

মালা মৈত্র
বহুরূপী: সুবল দাসবৈরাগ্য ১০০.০০

মিহির সেনগুপ্ত
বিষাদবৃক্ষ ৪০০.০০

মুহম্মদ ইউনুস
গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন ৩০০.০০

মৃণাল সেন
তৃতীয় ভুবন ৩০০.০০

রঞ্জন গুপ্ত
ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ২৫০.০০

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
মণিরঞ্জন: এক বাঙালির রূপকথা ২০০.০০

রবিশঙ্কর
রাগ-অনুরাগ ২৫০.০০

রমা চক্রবর্তী
পথে চলে যেতে যেতে ১৫০.০০

রমাপদ চৌধুরী
হারানো খাতা ৩০০.০০

রাণী চন্দ
পথেঘাটে (নতুন সংস্করণ) ৩০০.০০

লীলা মজুমদার
আমিও তাই ১২৫.০০
গেরোর খাতা ২৫০.০০
পাকদণ্ডী ২৫০.০০

শাঁওলী মিত্র
তর্পণ ১২৫.০০
দিনুক্ষা ৭৫.০০

শান্তিদেব ঘোষ
জীবনের ধ্রুবতারা ২৫০.০০

মিস. শেফালি
সন্ধ্যারাতের শেফালি ৩০০.০০

শৈলজারঞ্জন মজুমদার
যাত্রাপথের আনন্দগান ১৫০.০০

শ্রাবণী বসু
গুপ্তচর এক রাজকন্যা ৩০০.০০

সনৎ কর
স্মৃতির আঁকিবুকি ২৫০.০০

সাগরময় ঘোষ
একটি পেরেকের কাহিনী ৮০.০০
সম্পাদকের বৈঠকে ২০০.০০
হীরের নাকছাবি ২০০.০০

সুকুমার সেন
দিনের পরে দিন যে গেল ৪০০.০০

সিগনেটের বই

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রী সারদামণি ২০০.০০

চিত্ররেখা গুপ্ত
নিরুপমা দেবী: জীবনে ও সাহিত্যে ২৫০.০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
দক্ষিণের বারান্দা ২৫০.০০

সুপ্রিয়া ঠাকুর
শান্তিনিকেতন পাঠভবনের সহজপাঠ ২০০.০০

সুরেশচন্দ্র ঘোষ
দাদার কথা ১৫০.০০

সিগনেট প্রেস
একটি ♣ প্রকাশনা
সিগনেট বুক শপ
১২৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
ফোন ২২১৯০০৮৭

সুদেব রায়চৌধুরী
মা টেরেসা ১৫০.০০

সুধা মূর্তি
একটি জীবন অনেক মুখ ২০০.০০
ঠাকুরমার হাতেখড়ি ও অন্যান্য গল্প ১০০.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
অর্ধেক জীবন ৩০০.০০

সুপ্রিয়া ঠাকুর
ছেলেবেলার শান্তিনিকেতন ১৫০.০০

সুপ্রিয় সরকার
প্রকাশকের ডায়েরি ২০০.০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
চিঠির দর্পণে ৫৫.০০
ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই ১২৫.০০

সোনিয়া গান্ধী
রাজীব ৭৫০.০০

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
আস্থার আশ্রয়ে:
সাংসদের স্মৃতিকথা ৪০০.০০

সোমনাথ রায়
হাসি গল্পে সত্যজিৎ ১০০.০০

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়
অমিতাভ বচন ৪৫০.০০

স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্নপূর্ণা ১২৫.০০
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়:
তার ছিঁড়ে গেছে কবে ২০০.০০

স্বামী তথাগতানন্দ
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও তাঁর মানবিক সত্তা ১৫০.০০

স্যার্ত্র ব্রেমলি
অনুবাদ: যশোধরা রায়চৌধুরী
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ৪০০.০০

হরিআনন্দ বাড়ৈ
আমার বিক্রমপুর ২৫০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ফোন ২২৪১-৪৬৫২, ২২৪১-৩৪১৭
ই-মেল anandal@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট www.anandapub.com

বিখ্যাত রেনেসন্স শিল্পী সান্দ্রো বত্তিচেলি-র প্রিমাভেরা বা 'অ্যালিগরি অফ স্প্রিং'

রেনেসন্স, বাংলার রেনেসন্স
গোলাম মুরশিদ
অবসর। ঢাকা
১০০০.০০

রেনেসন্স-এর রকমফের

ইউরোপীয় রেনেসন্সের নগরনির্ভরতা ও একটি মধ্যবিত্ত সামাজিক শ্রেণির উত্থান বাংলার রেনেসন্সের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

শুচিব্রত সেন

শুরুতেই বলা ভাল যে, দেশ কাল পাত্র ও ভাবজগতের দিক থেকে ইটালি তথা ইউরোপীয় রেনেসন্স-এর সঙ্গে বাংলার রেনেসন্স-এর তুলনা অর্থহীন। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, স্বাতন্ত্র্য ও পরিণতি সবই ভিন্ন। তথাপি উনবিংশ শতাব্দর এক বিস্ময়কর সমাপতনে এতগুলি প্রতিভার একই সময়কালে আবির্ভাব ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও শিল্পে যে-মৌলিকত্বের অবদান রেখেছিল, তাকে রেনেসন্স নামে অভিহিত করার তাৎপর্য কোথায়? 'মৌলিকত্ব' কথাটিতে আপত্তি উঠতে পারে, কেননা বাংলার রেনেসন্স যে পশ্চিমের চিন্তাধারায় প্রভাবিত, একথা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু সেই চিন্তা যখন দেশজ মাটিতে জড়িত হয়ে জন্ম দেয় নবমানস উজ্জীবনে, তখন তাকে আর শুধুমাত্র অনুকরণ বলে আখ্যাত করা যায় না। মূল প্রশ্ন হল, উনবিংশ শতাব্দর বাংলার সৃজনীশক্তির বহুধা ধারার উন্মীলন কি অতীত জাড্যকে ধ্বংস করে, সীমিত অর্থে হলেও এক নবতর আধুনিকতার জন্ম দিয়েছিল? 'আধুনিক' শব্দটি অবশ্য অধুনা বিতর্কিত। তার মধ্যে অনুপ্রবেশ না করেও বলা যায় যে, আধুনিকতা হল এক মানসিকতা, যা সব সময় যন্ত্রশিল্প বা প্রযুক্তিনির্ভর নয়। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ না হয়েও যে ধর্মসহিষ্ণু এবং নর-নারী ভেদে মানবধর্মী, সে-ই আধুনিক। সেই অর্থে উভরটা সার্বার্থে ইতিবাচক, আর তাই বাংলার 'রেনেসন্স' অভিধা যথাযথ। কোনও উত্তরই আকস্মিক নয়, এর পশ্চাতে কার্যকর থাকে এক মানবিক অতীত ঐতিহ্যের অভিমুখ। ইউরোপীয় রেনেসন্সের সেই অতীত অভিমুখ ছিল নবম শতাব্দর ক্যারোলিঞ্জিয়ান এবং দ্বাদশ শতাব্দর রেনেসন্স বা স্কলাস্টিসিজ্‌ম। অন্যদিকে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই পোপের একচ্ছত্র আধিপত্যকে অস্বীকার করে প্রথম বিরোধিতা করেন সমাট তৃতীয় অটো এবং এর পরে পঞ্চদশ শতাব্দতে লোরেনজো ভাল্লা 'ডোনেশন অফ কনস্টানটাইন'কে জাল বলে প্রতিপন্ন করেন। অন্যদিকে বাংলার ইতিহাসে বর্তমানে আর্লি মডার্নিটি বা আর্লি আধুনিকতা বলে যে-আলোচনা শুরু, সেখানে দেখানো

অভিযান-এর সমস্ত বইপাওয়া যাচ্ছে
www.dokandar.in

উপন্যাস সমগ্র ১
কমল চক্রবর্তী ৬০০
প্রথম পাঁচটি উপন্যাস
আমার পাপ • স্যার মনুমাথের আদি ভারতবর্ষের ইতিহাস • রুটির ওপিঠ • লিটল ম্যাগাজিন ১৯৮২ • কলকাতা

জনপ্রিয়তম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

সে ইরাবতী
প্রচণ্ড গুপ্ত ২৫০
এক ধারালো মেয়ের গল্প

আনসারউদ্দিন
গো-রাখালের কথকতা (উপন্যাস) ৩০০
রাখাল গোষ্ঠীর যাপন চিত্রের মহাকাব্যিক রূপ

ঋষি ও খুকুর উপাখ্যান ও অন্যান্য ২০০
আবুল বাশার-এর তিনটি উপন্যাস

চারটিকে কেন্দ্রকরে 'ঘর ওয়াপসি'র উন্মত্ত উল্লাস ভেতরে এক নারীর ঘর খুঁজে না-পাওয়ার কাহিনি

ইমদাদুল হক মিলন-এর দুটি উপন্যাস গ্রন্থ
পরাধীনতা ২০০
অধিবাস ১৫০
দেশভাগের করাত কীভাবে আমাদের মাঝখানে একবার এগিয়ে যায়, একবার পিছিয়ে যায় আর আমরা রক্তাক্ত হই। সেই যন্ত্রণার এক নিরলিপি এই উপন্যাস—অধিবাস।

প্রেমের গান
ভগীরথ মিশ্র ২৫০
হাসান আজিজুল হক ২৫০

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্প
সম্পাদনা সাদ কামালী ৮০০

শূন্যদশকের ছোটো গল্প
সম্পাদনা সাধন চট্টোপাধ্যায় ৩০০

লুব্ধক (উপন্যাস) নবারুণ ভট্টাচার্য ৭০
পার্ল রহস্য (উপন্যাস) রবিশংকর বল ১০০

অনুগ্রহ সংগ্রহ
স্বপ্নময় চক্রবর্তী ১৮০

মুনলাইট সোনাটা অমর মিত্র ১৫০
নতুন গল্প ২৫ বিনোদ ঘোষাল ২৫০
নতুন গল্প ২৫ রজতকান্ত মজুমদার ২৫০

বিষাদবিন্দু (উপন্যাস) শামিম আহমেদ ১৭৫
হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর খলিফা পদ নিয়ে বিরোধের ইতিহাস।

অভিযান পাবলিশার্স
৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
+৯১ ৮০১৭০৯০৬৫৫
অভিযান-এর বই—এর প্রাপ্তিস্থান
চয়নিকা (সাঁইথিয়া) ও মুক্তধারা (দিল্লি)

হচ্ছে যে, 'ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব সমাজ বিবর্তনের মধ্য থেকেই নানারকম আধুনিক চিন্তা, প্রবরণ ও ব্যবহারের উদ্ভব ঘটেছিল।' (পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা, ইতিহাসজ্ঞান সান্যালের 'বাংলায় সামাজিক গতিময়তার ইতিহাস' গ্রন্থে, বুকপোস্ট, কলকাতা ২০১৫।) এই সব চিন্তা বা প্রকরণে ঔপনিবেশিক বা ইউরোপীয় কোনও প্রভাব ছিল না। তাই বাংলায় এক প্রাক্-আধুনিক মানবধর্মের ঐতিহ্যের অবস্থান অনস্বীকার্য। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'-র উদ্ভব হয়েছিল চর্তুদশ শতাব্দেও, আর চৈতন্য যুগকে (পঞ্চদশ শতাব্দ) বাংলার রেনেসন্সের সূচনাকাল বলে অনেকেই মনে করেন। দেশজ ভাষার অগ্রণতির সূচনা তখনই।

ইউরোপীয় রেনেসন্স সম্পর্কে বুর্খার্ট-এর ('দ্য সিভিলাইজেশন অফ দ্য রেনেসন্স ইন ইটালি', ১৮৬০) স্বয়ম্ভু তত্ত্ব, তাই আজ বাতিল বলেই গণ্য। তারও আগে অবশ্য জর্ডিও ভাসারি (১৫১১-১৫৭৪) ইটালির শিল্পীদের জীবনকাহিনিতে ব্যবহার করেন 'rinacita' শব্দটি। ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে রেনেসন্স শব্দের প্রথম উল্লেখ ফরাসি ইতিহাসবিদ জুল মিশেলে-র 'হিষ্ট্রি অফ ফ্রান্স' (১৮৫৫) গ্রন্থে।

ইউরোপীয় রেনেসন্সের নগরনির্ভরতা ও একটি মধ্যবিত্ত সামাজিক শ্রেণির উত্থান বাংলার রেনেসন্সের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়, তবে ইউরোপে যেখানে এক নতুন বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল, বাংলায় সেখানে এই শ্রেণি ছিল প্রধানত চাকুরিজীবী ও ভূমি স্বত্ত্বভোগী। কিন্তু এ তো ঔপনিবেশিক শাসনের অনিবার্য ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক গোলাম মুরশিদ পণ্ডিত মানুষ। বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাস তাঁর বিচরণ ক্ষম্বল। পুস্তকটির ভূমিকায় তাঁর স্বীকারোক্তি— 'এই বই লেখার কারণ ইটালীয় রেনেসন্স সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা দেওয়া'। উপরন্তু তাঁর মতে 'বঙ্গদেশে আদৌ রেনেসন্স এসেছিল কিনা এবং এসে থাকলে তার পরিধি কতোটা বিস্তৃত তাতও মূল্যায়ন করেছি।'

প্রশ্ন হল, অন্যাবধি ইউরোপীয় বা বঙ্গীয় রেনেসন্সকে কেন্দ্র করে যে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় ব্যতীত কি নবতর মূল্যায়ন সম্ভব? সে মতামত বিতর্কিত হতে পারে, লেখক তার সঙ্গে সহমত না-ও হতে পারেন, কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত কোনও আলোচনাই তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

গ্রন্থটির প্রথমাংশে লেখক রেনেসন্স চিত্রকলার সচিত্র বিবরণ দিয়েছেন অত্যন্ত সুনিপুণ হাতে। এ যাবৎকাল প্রকাশিত কোনও বাংলা বইয়ে রেনেসন্স ভাস্কর্য ও চিত্রকলার এহেন উপস্থাপনা হয়নি। এই বইয়ের মূল্য অবধান এখানেই। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের সব দার্শনিক, শিল্পী ও স্থপতি থেকে রেনেসন্স ইউরোপের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক কবি শিল্পীদের চিত্রসহ পণ্ডিতি গ্রন্থটির এক বিশেষ আকর্ষণ। শুদ্ধ তাই নয়, সমস্ত স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের প্রতিলিপিসহ তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আমাদের মুগ্ধ করবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রেনেসন্স, রিফর্মেশন অবশ্যপাঠ্য। ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে এর ঐতিহাসিক বিতর্ক ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য করানো সম্ভব। কিন্তু চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এর সঠিক পরিচয় প্রদানে আমরা অসুবিধার সম্মুখীন হই। রেনেসন্স চিত্রকলার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 'পার্সপেক্টিভ'। শুধু মুখের কথায় একে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। লেখক তাঁর পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় এর যে-বোঝাটির অঙ্কন করেছেন, সেটি যে-কোনও শিক্ষার্থী বুঝে নিতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে এর ইতিহাসটুকু আমাদের উপরি পাওনা। শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের প্রসঙ্গে এরও বহা প্রযোজ্য। দামি মসৃণ কাগজে ছাপা প্রতিটি ছবি আমাদের শুধু মুগ্ধই করে না, ইটালীয় রেনেসন্স ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পি সম্পর্কে বিস্ময়াভূত করে। ইতিহাস শুধু যে পাঠ্য নয়, তা চোখে দেখারও বিষয় (স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে), এই বোধে আমরা উজ্জীবৃত হই। কয়েকটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে, যেমন পার্থেনেনের স্থাপত্যের পরিভাষা (পৃ. ১১), প্যাম্বিয়েনের গম্বুজ (২৫২), রাফায়েল-এর 'স্কুল অফ এথেন্স' (২৭৬), বটিচেল্লির 'প্রাইমাভেরা' (৫১), মিকেলাঞ্জেলোর 'দ্য লাস্ট জাজমেন্ট' (৫৮), তিশান-এর 'তিনাস অফ উরবিনো' এবং 'দ্য রেপ অফ ইউরোপা' (৭৬,৭৭)। এগুলি কয়েকটি উদাহরণমাত্র। বস্তুতপক্ষে গ্রন্থটির এই অংশটি শুধু ইতিহাসপাঠকের কাছেই নয়, যাঁরা চিত্রশিল্পের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের কাছেও এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

গ্রন্থটির দ্বিতীয়াংশ, অর্থাৎ যেখানে বাংলার রেনেসন্স নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন, সেটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত এবং মূলত বর্ণনাধর্মী। এই অংশের সূচনায় তাঁর উক্তি, 'তাই ইটালি আর বাংলার রেনেসন্সের মধ্যে যে পার্থক্য, তা মূলগত। বস্তুত একথাকে স্বীকার করে নিলে বঙ্গদশে পুনর্জাগরণ ঘটেনি, তার ঘুম ভেঙেছিল মাত্র'। এর কয়েক পৃষ্ঠাপরে পরেই লেখক বলছেন, 'তবে ইটালীয় রেনেসন্সের সঙ্গে তার আংশিক সাদৃশ্যের কারণে, তাকে এক ধরনের রেনেসন্স বললে অযথার্থ বলে বিবেচনা করা যায় না' (পৃ. ১০৫)। বাংলার রেনেসন্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের শর্তসাপেক্ষ ছিধাগ্রস্ততা পাঠককের কিছুটা বিভ্রান্ত করতে পারে।

বাংলার রেনেসন্সের সূচনালগ্নে লেখক এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়মের ইংরেজ পণ্ডিতদের যে-অবদানের উল্লেখ করেছেন, তাকে মেনে নিতে কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সংস্কৃতচর্চার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে

রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মানবতাবাদের যে-নতুন ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার সংঘটিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশজ ভাষার চর্চার যে-প্রচেষ্টা ও দৃষ্টান্তও আমরা লক্ষ করি, তারই চূড়ান্ত পরিণতি রবীন্দ্রনাথ। লেখক এই বিষয়গুলি সুন্দরভাবে তাঁর আলোচনার মধ্যে যথাযথভাবে স্থান দিয়েছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে একমত যে, ইটালীয় রেনেসন্সের যে-প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ চিত্রকলা, সেটি বাংলার রেনেসন্সে অনুপস্থিত। এর কারণ হিসেবে তিনি ঐতিহ্য ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবকে চিহ্নিত করেছেন। (পৃ. ১৫৬)। তাঁর 'কুলমুক্তকতা পরিত্যাগ' সহস্রধারায়ই সামাজিক চলমানতার এক উদাহরণ। সিদ্ধান্তে গ্রন্থকার বাংলার রেনেসন্সকে 'সীমিত অর্থে রেনেসন্স' বলে স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত বাংলার রেনেসন্স আলোচনায় তিনি সঙ্গতভাবেই নজরুলের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের উল্লেখ মাত্র একটি পঙ্‌ক্তিতে শেষ করেছেন, তাও শুধু ভাষার উল্লেখ করে (পৃ. ১৪৫)। অথচ বাংলার রেনেসন্স আলোচনায় বিবেকানন্দ এক বাস্তিকধর্মী চরিত্র। চূড়ান্ত মানবতাবাদী অথচ ভারতীয় সনাতন ধর্মে গভীর আস্থাবান এই ব্যক্তি বাংলার রেনেসন্সের দ্বান্দ্বিকতার এক মূর্ত প্রতীক। এই বিষয়টির অবতারণা গুরুত্বপূর্ণ লেখকেরই একটি মন্তব্যের জন্যে। হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনকে দায়ী করে তিনি বলছেন, 'এভাবেই জাতীয়তাবাদের মরুপথে বঙ্গীয় রেনেসন্স হারালো ধারা' (পৃ. ১৬৬)। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই খণ্ডিত জাতীয়তাবাদের জন্য রেনেসন্সের দায় কতটা? পরবর্তীকালে জাতীয় নেতৃবৃন্দ বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দকে নিজ-নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করেছিলেন, নাকি তাঁদের মধ্যেই সুপ্ত ছিল হিন্দুত্ববাদের বীজ— এ প্রশ্ন কিন্তু অমীমাংসিত থেকে গেল। আবার লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একই সঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসন্সের শ্রেষ্ঠতম ফসল এবং সেই রেনেসন্স দিয়ে প্রভাবিত সবচেয়ে বড় শিল্পী।' অথচ এই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ বয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে, যেখানে বারবার উদ্ভাসিত হয়েছে সমন্বয়বাদের কথা, শুধু ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গেই নয়, বিশ্বমানবতার সঙ্গেও। ভারতের বৈচিত্র স্বীকার করেও এক ঐক্যের ভিত্তি অন্বেষণই ছিল তাঁর আজীবনের ব্রত। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ শুধু নিজের দেশের খণ্ডিত স্বার্থেশিকতার আক্রমণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উগ্র জাতীয়তাবাদজাত বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের এক সার্বিক বিরোধী হিসেবেও সেটি ছিল নিয়ত সংগ্রামরত। তা হলে?

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহুলসৌকর্যে গ্রন্থটি অভিনন্দনযোগ্য। প্রমাদ প্রায় নেই বললেই হয়। পশ্চিমবাংলার দু'-একটি সংস্থাকে বাদ দিলে বাংলা প্রকাশনার মান বাংলাদেশে যে অনেক উন্নত, একথা নিঃসংশয়ে স্বীকার্য।

পক্ষ পাঠ

কথোপকথনে সংগীতশিল্পী

গায়ত্রী হাঙ্গল-এর গান শুনে উস্তাদ আব্দুল করিম খান তাঁকে একবার বলেছিলেন, 'গলা অচ্ছা হ্যায়, খুব খানা অউর খুব গানা'! পণ্ডিত রবিশংকর দশ বছর বয়স থেকেই উদয়শংকরের ট্রুপ-এ নাচ এবং সংগীত, দুয়ের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন, 'I was trained in his style of dancing and took part in many of his choreographies. Later, when I was sixteen, I choreographed a whole item myself. That was based on the Kathak style of dance.' বিখ্যাত সরোদশিল্পী উস্তাদ হাফিজ আলি খান পরাভূষণ-এ সম্মানিত, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুত্র উস্তাদ আমজাদ আলি খানও। রাষ্ট্রপতি ড.

বিশ্বত মিউজিক: মায়েস্ত্রোঃ ইন কনভার্সেশন
গীতা সহায়, শুদ্ধলা সহায়
নিয়োগী বুকস
নয়াদিল্লি-১১০০২০
৫৯৫.০০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বিশ্বভ্রমণ
আন্টার্কটিকা • আলাস্কা • আফ্রিকা • চিন
মোঙ্গোলিয়া • সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি
ডি ডি বাংলায়
প্রতি শনিবার সন্ধে ৭-৩০
পুনঃপ্রচার: বৃহস্পতিবার সকাল ১০-৩০

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

মহাশ্বেতা দেবীর
তুতুল ৩য় মুদ্রণ ₹৬০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর
আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের
কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫
কানাইলাল চক্রবর্তীর
কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০
চলো দেখে আসি ₹২০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের আষাঢ়ে গল্প ₹৬০
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

নেকড়ের চোখ ₹৬০
প্রখ্যাত স্কটিস লেখক
দানিয়েল পেনাক-এর
LOEIL DU LOUP
বইয়ের অনুবাদ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বরফের বাগান
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের
রুদ্ধশ্বাস কাহিনি।
পাতায় পাতায় ছবি ₹১২০

গরিলার চোখ
মধ্য আফ্রিকার রোয়ান্ডায়
আদিম অরণ্যে পাহাড়ি
গরিলাদের মুখোমুখি
রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা
₹৮০

আমাজনের জঙ্গলে
আমাজনের গভীরে
রহস্যে ঢাকা
অরণ্যবাসীদের নিয়ে
বিস্ময়কর
কিশোর উপন্যাস।
৭ম মুদ্রণ ₹৭০

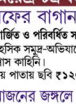

পাগলকরা ছন্দে দম বন্ধ করা
ডাকাতের গল্প
হীরু ডাকাত ৯ম মুদ্রণ ₹৪৫
গানে-সুরে বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার Mp3 সিডি ₹৯৯
সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়

এছাড়াও লেখকের অন্যান্য বই: পাখির খাতা ₹৪০ অঙ্কিমুনার ₹২০
ছোঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ লিচুবাগানের চৌকিদার ₹৮০ শাদা ঘোড়া ₹৬০
গৌর যাযাবর ₹১২০ ভূতের বাঁশি ₹৪০ তালগাছের ডোডো ₹২০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বইয়ের ই-বুক সংস্করণ দেখতে লগ অন করুন:
www.swarnakshar.swiftboox.com অথবা www.indichouse.com

দে বুক স্টোর, বলাকা বুক স্টল, স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

একসঙ্গে ৩০০ টাকার বই কিনলে ফ্রি-ডেলিভারি
চেক পাঠানো নীচের ঠিকানায়

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283 2320, 2280 8818
E-mail: info@swarnakshar.in
অনলাইন কিনতে ▶ www.swarnakshar.in

- বেগম সমগ্র 250/-, 250/-, 250/-
  ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড
- বাঈজী উমরাহজান 50/-
- নগরনটী আম্রপালী 60/-
- যৌবনবহ্নি পদ্মিনী 60/-
- ক্রুদ্ধসী দেবদাসী 60/-
  পৃথ্বীরাজ সেন
- ধর্ষিতা 150/-
- অন্ধকার অরণ্য 130/-
  অনুরাধা দেবী
- আহত গোলাপ 150/-
  আশুতোষ মণ্ডল
- সেরা পঞ্চাশ 350/-
  রূপকথা সংকলন
- সেরা পঞ্চাশ 350/-
  গোয়েন্দা-গল্প সংকলন
- সেরা পঞ্চাশ 250/-
  গল্প সংকলন
- সেরা ষাট 300/-
  রমারচনা সংকলন
  সম্পাদনা
  বারিদবরণ ঘোষ
- শার্লক হোমস্ সমগ্র 500/-
  স্যার আর্থার কোনান্ ডয়েল
  অনুবাদ সুভদ্রা মিত্র
- গোপাল ভাঁড় অমনিবাস 200/-
  সঞ্জিতকুমার সাহা
- চাঁদের পাহাড় 100/-
- আম আঁটির ভেঁপু 110/-
  বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ভেষজ গাছপালায় 80/-
  সহজে রোগ নিরাময়
- বাংলার লোকজ বনৌষধি 80/-
  ড. দুলাল চন্দ্র পাল
- ছোটোদের রামায়ণ 100/-
- ছোটোদের মহাভারত 120/-
  বিপ্লব মজুমদার
- সেরা রান্না সমগ্র 200/-
  মাইক্রোওভেন ও টিপস্ সহ
- সেরা নিরামিষ রান্না সমগ্র 120/-
- সেরা টিফিন সমগ্র 150/-
  টিফিন ব্রেক, লাঞ্চ ব্রেক, টি ব্রেক
- মাইক্রোওয়েভে সেরা রান্না সমগ্র 90/-
  কল্পনা ব্যানার্জী
- গৃহিণীর সাথী 100/-
  দীপ্তি দে

গ্রন্থমিত্র পরিবেশক মিত্রম
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
Phone : (91-33) 2219 1595 / 6539
E-mail : pmitram@gmail.com
Website : www.progressivepublishers.co.in

গ্রন্থ লোক

রাজেন্দ্র প্রসাদ হাফিজ আলি খান-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে কোনওরকম বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে কি না। হাফিজ আলিরা তখন থাকেন ভাড়াবাড়িতে, ট্যাক্সি কবে আসতে হয়েছে অনুষ্ঠানে। শিল্পী চাইলে তখন রাষ্ট্রপতির কাছে চাইতে পারতেন, যা ইচ্ছে তাই। কিন্তু হাফিজ আলি কী বলেছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদকে? 'You are like the Emperor of India, you must save Raga Darbari. People today are taking too many liberties with Darbari, this really upsets me'! আমজাদ আলি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, 'It's amazing that people with such pure hearts existed in this world'!

এরকম আরও নানাবিধ অজ্ঞাত বা অজ্ঞাত তথ্য উঠে এসেছে সংগীতজ্ঞদের অকপট কথোপকথনের মাধ্যমে, আলোচ্য 'বিষণ্ণ মিউজিক: মাহেজ্ঞোহ ইন কনভারসেশন' বইটিতে। যাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁদের জীবনে সংগীত ভড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোতভাবে, তাই 'বিষণ্ণ মিউজিক' শিরোনাম থাকলেও, সংগীতের অসীম পরিধির ভিতরেই চলতে থাকে নিবিড় আলোচনা। সেই পরিসরে চলে আসে ব্যক্তিগত দুঃখ-অভাবের অনুষঙ্গও। গাঙ্গুবাই হাঙ্গল তাঁর কন্যা কৃষ্ণার মৃত্যুর কথা বলতে-বলতে কেঁদে ফেলেন, প্রভা আত্রে কেন অবিবাহিত থাকলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি হেসে উঠে বলেন, 'কোই মিলা নেহি না...'! গান, সেতারবাদন বা সরোদবাদনের মাধ্যমে পরিচিত শিল্পীদের সাংগীতিক সত্তাটি শ্রোতার কাছে পরিস্ফুট হয়, আর এই কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে সেগুলি মানুষটির ব্যক্তিত্ব, রসবোধ, সচেতনতা। গীতা সহায় এবং শুভ্রা সহায় তাঁদের প্রশ্নের সাহায্যে ভিতরের মানুষটিকে অনেকটাই বের করে আনতে পেরেছেন।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে যে-স্বনামখ্যাত শিল্পীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, সেই তালিকায় আছেন ড. গাঙ্গুবাই হাঙ্গল, পণ্ডিত রবিশংকর, বিদুষী গিরিজা দেবী, ড. এন রাজম, পণ্ডিত যশরাজ, ড. প্রভা আত্রে, পণ্ডিত দেবু চৌধুরী, পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা, পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, উস্তাদ আমজাদ আলি খান, পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাট, বিদুষী শ্রুতি সড়োলিকর, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে শিল্পীনির্বাচনে কণ্ঠসংগীত এবং যন্ত্রসংগীতের সমতা বজায় রেখেছেন লেখকদ্বয়। সরাসরি কথোপকথন আরম্ভ না করে প্রয়োজনীয় ভূমিকা যুক্ত করেছেন, কোন পরিবেশে নেওয়া হয়েছে সাক্ষাৎকার তার বর্ণনাও রয়েছে। গ্রন্থশেষে রয়েছে সাংগীতিক পরিভাষার অর্থ এবং নির্ঘণ্ট।

শাস্ত্রীয় সংগীতে আগ্রহী পাঠকদের বইটি অবশ্যই ভাল লাগবে। তবে গ্রন্থে ব্যবহৃত শিল্পীদের আলোকচিত্রগুলি আরও স্পষ্টভাবে ছাপলে ভাল হত।

বইয়ের জানালা

অনুষ্টুপ

এক হাজার পৃষ্ঠার অধিক শারদীয় **অনুষ্টুপ** সংখ্যায় (সম্পাদনা অনিল আচার্য) প্রবন্ধ লিখেছেন অরিন্দম চক্রবর্তী, দীপেশ চক্রবর্তী, রণজিৎ গুহ, স্বপন চক্রবর্তী, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। রয়েছে কবিতা, গল্প, স্মৃতিকথা, রোমিলা থাপার-এর সাক্ষাৎকার এবং ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাল ভাঁড় নিয়ে ক্রোড়পত্র। যদিও ৬৬৯ পৃষ্ঠায় লোরকার পরিবর্তে মুদ্রিত হয়েছে আর-এক কবি রাইনার মারিয়া রিলকে-র আলোকচিত্র।

কোরক

'এবারের শারদ সংখ্যাটির বিষয় মূলে বাংলার কবি ও কবিতা,' জানানো হয়েছে **কোরক** পত্রিকার শারদীয় ২০১৫ সংখ্যার সম্পাদকের নিবেদন-এ। 'রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার রূপরেখা', 'স্বল্পালোচিত কয়েকজন কবি ও তাঁদের কাব্যবৈশিষ্ট্য', 'উত্তর বাংলার কয়েকজন কবির ব্যক্তিগত কাব্যভাবনা' এবং 'ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী বাঙালি কবিদের কবিতা'— এই চার পর্বে বিভক্ত বইটি। সম্পাদক তাপস ভৌমিক।

কোমল গান্ধার

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত **কোমল গান্ধার** পত্রিকার সাপ্তর্তিক সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ, সম্পাদক সুবিমল লাহিড়ীকে সম্মান জানানো হয়েছে। রয়েছে তাঁকে লেখা পুলিনবিহারী সেনের চিঠি, সুবিমল লাহিড়ীর নানা রচনা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের বই, মুদ্রণ সংক্রান্ত নানা চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে চিঠিপত্রে, সেসবের একটি সংকলন রয়েছে পত্রিকাটিতে।

যাঁরা পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, তাঁদের সন্তানরা কিন্তু সেই ব্যবস্থায় শিক্ষাগ্রহণ করেনি। এই দ্বিচারিতায় বুনিয়াদি শিক্ষার ভিতটিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল।

শুভ্রাংশুকুমার রায়, চন্দননগর-৭২২১৩৬

পাশ-ফেল ফিরলেই মান বাড়বে?

আগামী ২০১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিতে (সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত) পাশ-ফেল ব্যবস্থা ফিরতে চলেছে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সে মর্মে সম্মতি রয়েছে— এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয় নিবন্ধটি (২ নভেম্বর ২০১৫)। কিন্তু শুধু পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমনটা নয়। প্রাথমিক (চতুর্থ শ্রেণি অবধি), পরে উচ্চ মাধ্যমিক (অষ্টম শ্রেণি) পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথার উচ্ছেদ আমাদের রাজ্যের বিদ্যালয়-শিক্ষায় যে সোনার ফসল ফলায়নি, সে আমরা বুঝেছি। এবার সেই ব্যর্থতা ঢাকতে পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনলেই সোনার ফসলে গোলা ভরে যাবে, এমন সহজ ভাবনায় গোলমাল আছে।

বিষয়টি শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যের নয়। দেশের অনেক রাজ্য কেন একযোগে এই ভাবনাটি ভাবছে তা তলিয়ে দেখা দরকার। শিক্ষাকে, বিদ্যালয়স্তরে সফল করতে পাশ-ফেল ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক, এটাই তবে আমাদের সিদ্ধান্ত? এবং সেটা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী কমবেশি সব রাজ্যেরই ভাবনা।

ব্যবস্থাটি যখন তুলে দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল, জনগণের করের টাকায় যে-শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেখানে সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। সে শিক্ষা অবৈতনিক। কোনওরকম সামাজিক বৈষম্য, জাতগত, দারিদ্র সেই শিক্ষায় যেন বাধা না হয়। এমনকী, মেধাগত উৎকর্ষও যেন ছাত্রছাত্রীদের তাদের সহপাঠীদের চেয়ে বেশি এগিয়ে না দেয়। মানে, সেখানে আলাদা কোনও স্বীকৃতি থাকবে না। লেখাপড়া শিখতে না পারার গ্লানি, পাশ করতে না পারার ব্যর্থতা কোনও শিক্ষার্থীর পড়াশোনা, এমনকী জীবনটাকেও যেন শেষ করে না দেয়। ফলে পাশ-ফেল নেই, মেধার মান্যতা নেই, সম্পাদকের ভাষায় 'গোপাল-রাখাল একই ছাঁচে ঢালাই' হতে শুরু করল। চালু হল গ্রেড ব্যবস্থা, উঠে গেল মেধা তালিকা, সিসিই বা কন্টিনিউয়াস ও কম্প্রিহেনসিভ ইভ্যালুয়েশন এল। প্রথাগত লেখাপড়ায় যারা কিছু শিখতে পারছে না, শিক্ষার বিকল্প রাস্তায় তারা হাঁটতে পারছে কি না সেদিকে নজর দিতে বলা হল। খেলাধুলো, গানবাজনা, নাটক, ছবি আঁকা-সহ নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ কোথায়, সেটাও যে জানা প্রয়োজন তা অনেকে বুঝলেন। এখন খেলাধুলোর উৎকর্ষ বিচারে যে কমপক্ষে প্রতিটি বিদ্যালয়ের একটি মাঠ প্রয়োজন হয়, বা গানবাজনা শিখতে মিউজিক টিচার লাগে, ছবি আঁকা নাটকে পারদর্শী শিক্ষক দরকার, এসব না ভেবেই সেই আয়োজন অন্তত ন্যাতায়-কলমে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হল। কাজেই মান বিচারে বিদ্যালয়গুলিই যেখানে ভাহা ফেল করতে পারে, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের পাশ-ফেল বিচার কতদূর সাফল্য লাভ করবে, তা ভাবনার সময় এসেছে।

এটা সকলেই বোঝেন যে, আদর্শের দিক থেকে যদি গণশিক্ষাকে সফল করে তুলতে হয়, সেখানে পাশফেল বর্জিত এই ব্যবস্থার সত্যিই বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন শিক্ষার কথায় যখন বলেন, সোনার আঁটি মূল্যবান ঠিকই তবে তা দিয়ে যে লজ্জা নিবারণ হয় না, সেকথা বিশেষ স্মরণীয়। তর্ক করছি ভেবেও যদি ধরে নেওয়া হয় যে, গণশিক্ষার সেই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই পাশ-ফেল ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটেছিল, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পরিচালনার কাজটি সুশৃঙ্খলভাবে হচ্ছে, সেখানে ক'জন ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবক, শিক্ষক পাশ নম্বর নিয়ে মাথা ঘামান? যেসব বিদ্যালয়ে একজনও 'ফেল' করে না, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পাশ-ফেল এর ঢেউ ওঠে না। রাজ্যের সব স্কুল সেই মানে পৌঁছবে,

পড়াশোনার কাজটাকে পাশে সরিয়ে রেখে, শুধু পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনলে লাভ হবে না

অমলকুমার মন্ডল-এর সাম্প্রতিক গ্রন্থ

"ভারতীয় মুসলমান" মূল্য- ৩০০/-

মুসলিম ও নিম্নবর্ণীয় নির্যাতিতদের সম্মিলিত আন্দোলন সংগঠিত হলে ভারতীয় ইতিহাসের অভিন্ন্য কেমন হত ইতিহাস-আশ্রিত তথ্য ও যুক্তির আলোকে তা বিশ্লেষণ হয়েছে। অনন্তজিৎ পাত্রক ভারতীয় ইতিহাসে মুসলিম কেন্দ্রিক নানা দৃষ্টির সরস উত্তর এখানে পাবেন।

খন্ডিত স্বাধীন ভারতের রাজনীতির পরিচয় নিয়ে লেখা নতুন বিষয়ের উপন্যাস শুরু হিরাল- এর **"দেশকাল"** মূল্য- ২৫০/-

পদ্মানদন মানাকর- এর নতুন উপন্যাস

"সুদূর নীলিমা, মূল্য- ২০০/- **শতাঁচরের আলো"** মূল্য- ২০০/-

প্রদীপ দাস-এর **"আবুধি অভিধান"** মূল্য ৬০০/-

মনিরীদা নন্দী বিশ্বাস- এর **৪ টি উপন্যাস** মূল্য- ২০০/-

ড. বিশ্বান মুখোপাধ্যায়- এর

"সম্পর্কের আলোয় শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ" মূল্য- ২০০/-

ইমানুল হক- এর

"সাম্প্রদায়িক মন ধর্মনিরপেক্ষ মুখ" মূল্য- ২৫০/-

রণজিৎ দেব- এর

"রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস"

আতঙ্কভঞ্জন জানার

"বিবিধ দৃষ্টিপাত" মূল্য- ৪০০/-

বিচিত্র স্বাদের ২৯টি প্রবন্ধের সংকলন

সান্ত্বনা রয় এর দুটি কবিতা বই একত্রে

"আই থিংক ইন খুঁট" এই গ্রন্থের কবিতাগুলি সকল সংস্কৃতিক ভাষিতে বিশ্বমানের কবিতা হয়ে উঠেছে, ভাবনাগুলি অসাধারণ।

মূল্য- ১০০/-

এটি ৫মানিক গ্রন্থাগার কবিতা গুলিতে অসাধারণ রোমান্টিক ভাবনা ফুটিয়েছে।

"প্রেরণা"

দেশ প্রকাশন

অফিসার রিবড়া, হুগলী

বিপণন কেন্দ্র:- ৫২, কলেজষ্টীট, কোলকাতা- ৭৩

ফোনঃ ৯৮৭৪৯৩৫১৫৫৩৯

শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্র-ক্ষেত্রান্তরে ধীমা-র নতুন বই

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র স্মারক বক্তৃতা ২০১৫

উপলক্ষে ১৮ নভেম্বর সন্ধে ছ-টায়

ইন্দুমতী সভাগৃহে

নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

শতবর্ষীয়ান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও শচীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জ্যোতিরিন্দ্রর অন্তরঙ্গ আত্মপ্রকাশ। ১৫০টি কবিতা, ১২৭টি টিঠি, দুর্লভ চিত্রসমাহার, পাণ্ডুলিপির প্রতিচ্ছবি, অপ্রকাশিত রচনা। ৫০০ টাকা।

কটুকরার গান। প্রসূন দাশগুপ্ত সম্পাদিত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সুরারোপিত স্বরলিপিসমন্বিত *আবোল তাবোল, লম্বকর্ণ পাল, রামমুন্ড, কুড়ুনি ও স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত*-এর কবিতা।

গল্পগুচ্ছ নাট্যরূপে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাট্যায়িত রবীন্দ্রনাথের চারটি গল্প। ২৫০ টাকা।

দরবারি শিল্পের স্বরূপ: মুঘল চিত্রকলা। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়। বহুবর্ণ দুর্লভচিত্র-সমন্বিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ২৫০ টাকা।

এক সূত্রের সন্ধানে / A Common Concern 2. তান লী ও শ্রীলা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। শান্তিনিকেতন আশ্রমিকদের প্রবন্ধে, স্মৃতিকথায়, বিশ্বভারতীর অনন্য আত্মপরিচয়।

ধীমা 24667794/65457160

themabooks@yahoo.com

বিজ্ঞাপন দেবার জন্য যোগাযোগ করুন 9830224386

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ঘোড়াই

কাব্যভাষিনি উপর ২০১০ সালে **PhD** ডিগ্রি লাভ করেছেন।

প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক কাব্য আনন্দপাঠশালা মন্ডলের

কোয়ারিন্স ৫০/-

সঙ্ক্রিয়তা বুক স্টোর

সন্তোষপুর

৯০৫১৩৮২০২৬

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস (০৩৩) ২২২৭ ২৩৩৬

বেজায় মুসকিল? ডানপিটে? মেয়ে বকে কথা পাচ্ছেন না? আসুন, ওদের সমস্যাগুলো বুঝে সঠিক পথে চলুন

ছেলে মেয়েকে সামলাতে হলে

মোর্ড বাঁধাই, ৭৫০০ টাকা

লেখিকা : ড. রানী নাগ

দেব লাইব্রেরি ২২৪১-৩৫১৪, দে বুক স্টোর ৬৫১৬-৬৬৯৯, দৈত্তা পাবলিশিং ২২৪১-২৩৩০

হাংরেজি সাহিত্যর ছাত্র-ছাত্রী ও আগ্রহী পাঠকদের জন্য সদ্য প্রকাশিত

অধ্যক্ষ প্রশান্ত সামন্ত-র

ইংরেজি সাহিত্যর সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ৫০০/-

নির্ভুল সাল-তারিখসহ সঠিক প্রামাণ্য তথ্যসমৃদ্ধ অতি প্রয়োজনীয় আকর গ্রন্থ

ড. বসুন্ধরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসদ্বয়ী

প্রতিবিম্বের জীবন

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ ২১০/-

এই অভিন্ন সময়ে বইটি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবে জীবনের বিভিন্ন ভাষায় ও সঠিক দিশা।

মান্না পাবলিকেশন ৯০/১ বি কলেজ রো, কল-৯ মোবাইল : ৯৪৩৩১৮৬০৬৪

ডাক্তার, নার্স, কর্পোরেটারদের অপরিহার্য কয়েকটি গ্রন্থ

ডাঃ এস. এন. পাণ্ডেও প্রণীত

প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন ৩৫০ টেক্সট বুকস অফ প্যাথলজি ২৫০ মডার্ন এলোপ্যাথিক মিডিসন ৯৪০ এ্যানাটমি পিলস ১১০ টেক্সট বুকস অফ এ্যানাটমি ৪৫০ ফিজিওলজি পিলস ১৯০ বায়োকেমিস্ট্রি পিলস ১০০ ধাত্রীবিদ্যা ১০০ হোম নার্সিং পিলস ৬০ ফার্স্ট এড ৭০ এলার্জি গোপনীয় ৬০ মেডিসিনস ফর শেড্স ৫০ কম্পাউন্ডারি পিলস ৫০ বার্ড কন্ট্রোল ৪০ মডার্ন আয়ুর্বেদিক টিকিৎসা ১৫০ ইনজেকশন পিলস ১০০

আদিত্য পাবলিশার্স

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩ ফোন ৮০৭৬৯২৪১১/২০০৭০০১৯৯১

২৮/১ জাতিস মুখার্জী রোড, কল-২৬ (শিমলাঘর)

বিভিন্ন লাইব্রেরি ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল এই ধরনের বই ব্যবসায়ীদের একমাত্র পাইকারি বিক্রেতা

এন.ই. পাবলিশার্সের

এই বছরের সাড়া জাগানো প্রকাশনা

রাজা রামমোহন রায়

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ছাত্রেজ্বরা চরিত্র মানস

অমিতাভ চৌধুরীর লেখা

ইসলামিক আখ্যায় মুসলিম মহিলা

ভারতীয় ভাষায় মুসলিম সাহিত্য

এন. ই. পাবলিশার্স প্রাপ্তিস্থান- কে'জ, শিক্ষা, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানী

১৪১ কলেজ রো ষ্ট্রীট, কল-৯, ২৩৫৭ ৭৯১০

চি ঠি প ত্র

এটাই আমাদের আশা। আর নিরাশা এখানেই যে, সেই ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের বেশির ভাগ স্কুলই পরিচালিত হচ্ছে না। তাই পাশ-ফেল এনে, কতটা হচ্ছে না, সেটা দেখে নিতে চাইছেন সবাই। তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের ওপর আমাদের ভরসা আছে, সেটা এখন আরও বাড়ছে। স্কুলে পড়াশোনা হচ্ছে কি না, পাশ-ফেল-এর হার দেখে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুবিধা আমরা নিতে চাইছি। প্রশাসনিকভাবে এই সিদ্ধান্তই 'পলিসি' গঠনে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু শিক্ষার মান উন্নয়নে এই ব্যবস্থা কতদূর কার্যকর হবে সেটা আমরা আগেও যেমন বুঝিনি, এখনও বুঝছি কি না জানি না। একটা কথা স্পষ্ট। পাশফেল নেই, তাই যে-ছেলেটির আজ পড়াশোনায় নজর নেই বলে আমাদের মনে হচ্ছে, কাল পাশ-ফেল ফিরলে সে সাঁসই হবে, এরকম ভাবনারও কোনও কারণ নেই। পড়াশোনা করতে যাদের ভাল লাগে না, স্কুল কিন্তু তাদেরও। পাড়াশোনাকে ভাল না বাসার অধিকারও তাদের আছে। ভালবাসা না বাসার এই বোধ থেকে যে-শিক্ষা জন্ম নেয়, পাশ-ফেলকে তারা বুড়ো আঙুল দেখাবেই। শুধুমা ত্রেরাতে প্রশাসনিক সুবিধার কথা ভেবে, পড়াশোনার বাজটাকে পাশে সরিয়ে পাশ-ফেলকে সামনে এনে দিলে শিক্ষার ঝোলো আনাই যে মাটি, তা আমরা কবে বুঝব?

অরণ্যদিক সামন্ত, কলকাতা-৭০০০৩৬

দুই

এ রাজ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের যে-মারাত্মক সর্বনাশ ঘটানো হয়েছে, তার হোতা ছিল বামপন্থী নামধারী একটি সরকার। আবার এই নীতির সর্বনাশ বুঝে যে-বিবেচীরা হয়েছিল, লাগাতার যে-প্রতিবাদ আন্দোলন রাজ্যে গড়ে উঠেছিল, তারও পিছনে ছিল একটি বামপন্থী দল— এসইউসিআই। সুকুমার সেন থেকে শুরু করে প্রমথনাথ বিশী, নীহাররঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বুদ্ধিজীবী সেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন, তারও পিছনে ছিল এসইউসিআই-এর উদ্যোগ। যা দেখে জ্যোতিবুবা বুদ্ধিজীবীদের বলেছিলেন, সেরপর্যন্ত এসইউসিআই-এর ছাত্তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন! সুকুমার সেন উত্তর করেছিলেন, তাঁরা মাথায়

ডাসো, আমার ভেলা ৩০০.০০ বৃদ্ধদেব বসু

একদিন অনেক রাতে ৭০.০০ দিব্যেন্দু পালিত

শাঙ্কুবিরোধী গল্প (সম্পাদনা) ২০০.০০ শেখর বসু

গল্প সংগ্রহ ৪০০.০০ তরী মন্ডল

মায়ের তেনো কথাবলা পুতুল আশিস মুখোপাধ্যায়

গল্পসমগ্র ৩৫০.০০ সুবাস চট্টোপাধ্যায়

গল্পসমগ্র ৩৫০.০০ মনোজ চাকলাদার

ললিতা ঘাট ১৫০.০০ পাপিয়া ভট্টাচার্য

এবং মুশায়েরা (শারদীয়, গল্প ও গল্পকার সংখ্যা) ৩৫০

বইকিনবার গল্পকারের গল্প ও আলোচনা

এবং মুশায়েরা ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল- ৭৩ Ph.৯৪৩৩২১৯২২১

চি ঠি প ত্র

ছাতা ধরেছেন, লাঠি তো মারেননি। পরবর্তীকালে প্রতিবাদীদের পক্ষ থেকে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করে চতুর্থ শ্রেণিতে যে-বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, তা এখনও চলছে। ১৯৯৮ সালে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পর থেকে বাংলা বন্ধের কথা মানুষের আজও স্মরণে আছে। প্রবল জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত সিপিএম সরকার ইংরেজি চালু করতে বাধ্য হলেও পাশ-ফেল চালু করেনি। তৃণমূল সরকার এসে তা চালু করার প্রতিশ্রুতি তো ভুলেই গেল, উপরন্তু অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার সাড়ে-সর্বনাশ সম্পন্ন করল। এখন আর প্রায়শ্চিত্ত করে কী হবে?

সমরেন্দ্র প্রতিহার, হাটিবাগান, কলকাতা

তিন

সত্যি কথা বলতে কী, পাশ-ফেল ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার ভয়াবহ ক্ষতির কিছু শহরে বসে ঠিক আঁচ করা যাবে না। গ্রামগঞ্জের স্কুলে এলে বোঝা যায় অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ গড়ুয়াদের কী করুণ অবস্থা। এই পত্রলেখক বহু-বিভাগের শিক্ষকতা কর্মে যুক্ত, সেখানে সাধারণ মানের অষ্টম-পেরনো ছাত্রদের ইংরেজি ছোটহাতের ন এবং ণ লিখতে-পড়তে গুলিয়ে যাওয়া তো সামান্য ব্যাপার। ক্লাসে যারা একটু পড়াশোনা করে, তারাও 'জিজ্ঞাসা' লিখতে গিয়ে লেখে 'জিজ্ঞাসা'। অঙ্কে ১১১-কে ৯ দিয়ে ভাগ করতে দিলে অনেকে আবার ভাগফলের জায়গায় ৩-এর পরেই দশমিক বিন্দু দেয়। অষ্টম-উত্তীর্ণ একশো ছাত্রের মধ্যে বাংলা ইংরেজি, দুই ভাষাতেই সঠিক নাম-ঠিকানা লিখতে পারার সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা যাবে। এটা কিছু মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গ্রামগঞ্জের সব বিদ্যালয়েই শিক্ষকদের কমবেশি একরকমই অভিজ্ঞতা। ঘটনা হল, এইসব ছাত্রই মাধ্যমিকের বৈতরণি পার হতে গিয়ে নকল করা নিয়ে গণ্ডগোল বাধায়, মারপিট করে।

পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনা নিয়ে মোদী সরকারের আদৌ নেতিবাচক ভূমিকা নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাড়া দিয়েছে। তবে এ নিয়ে এখনই খুব বেশি আশাবাদী হওয়া ঠিক নয়। কারণ, গ্রামগঞ্জের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপরে পড়া ছিড় সামাল দিতে যতদিন না উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, ততদিন শৈক্ষিকক্ষ খালি করার

মার্কস ও ক্যাপিটাল (১ম, ৩০০) পথ্থানুপুঙ্খে ক্যাপিটাল পড়া হলো শুরু **সহজ জীবনের পাঠ (২০০)** সরল জীবন, স্বচ্ছ মনে আবার কথা ও কাজ **রবীন্দ্রনাথ (২৫০)** তত্ত্ব জীবনের সাধনা, রবীন্দ্রপত্র-সংকলন **মানুষ হয়ে ওঠা (১৫০)** খেলা গান গল্প শৈশব হচ্ছে সুশিক্ষিত **কৈশোর (২০০)**কৈশোর-সমস্যা মজায় নিরসন **বার্ধক্য (২০০)** একা অশক্ত অথচ এই বৃদ্ধরা নির্মাণে বিভোর **সত্য ও প্রতিরোধ (১৫০)** সততার সত্যাগ্রহ, এটাই বড় প্রতিবাদ **শান্ত বিপ্লব (১০০)** ব্যক্তিত্ব সমিতি গড়লে কল্যাণ অনিবার্য **স্বাস্থ্যভাবনা (৭৫)** সত্যের আশ্রয় নিয়ে শুরুক

প্রান্তি - দে'জ, দে কুক বুকস, এবং মুখ্যাত্রারা, পত্রিকায় ৮০১৭৯০ ২২৬৩৩/৯৮৩০৭ ৩৮২২৬

দুস্প্রাপ্য ৭০০ অলংকরণ ! ১০০ পাতা কমিকস !! ৪২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকা

কমিক্স গ্রাফিক্স

অরণ্যদেব মানদ্রেক রোজার্সের রয় টিনটিন সত্যজিৎ রায় বিমল দাশ নারায়ণ সেবনাথ ময়ূখ চৌধুরী

কলেজ স্ট্রিট, পাতিরাম, দে বুক স্টোর, কেজ পাবলিশিং, ঘাসশিবির বুক মার্ক (৯০৩১১১৬৪৪, ৯৮৩০৮৭৩০৪০)

আঠারো শতকের বাংলা :
রাজনৈতিক চালচিত্র নিখিল সূর ২৫০, **সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ** আনন্দ ভট্টাচার্য ৩৫০, **বাংলোনা সুফি আন্দোলন** আনন্দ ভট্টাচার্য ৩০০, **১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ও বাংলা** আনন্দ ভট্টাচার্য ১৮০, **১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ** আনন্দ ভট্টাচার্য (স.) ২০০, **বাংলার শহর** (ঔপনিবেশিকপর্ব) শেখর মৌলিক অরিন্দম চক্রবর্তী ৩৫০, মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী **বীরভূম রাজবংশ** পর্যন্ত মমুহমদ ২৫০, **ব্রিশোরীলাল সরকার হেস্টমপ্র কাহিনী** পর্যন্ত মমুহমদ ২৫০, **কয়েল-কালিকলমের ছোটোগল্প** রবিন পাল ২৫০, **কৃড়ি একুশ শতকের নারী** ঔপন্যাসিক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ৩৫০, **তত্ত্ববিদ্যানী পত্রিকা : কাল থেকে কালান্তরে** দিনভর ৪০০, **নবচেতনায় বঙ্গনারী** (প্রাক্তন্ত্রীনতা পর্ব) দেবজ্ঞ ঘোষাল দে, ৪৫০, **আধুনিক বিশ্বনাটা প্রতিভা** জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫০, **কাব্যচেতনা : রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ** প্রভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০, **সভর উত্তর বাংলা উপন্যাসে সন্ত্রাস ও জীবন** দিনভর মুকুল ১৫০

Birbhum, Malaria & Hary Timbres
A Social History of Health and Medicine in a colonial Bengal District Suchibrata Sen 300/-

আশাদীপ ১০/২বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-৯ ☎৯৮৩০২৮১৯৮/৯৪৩৪৪৫৯১৯৮১ W : www.ashadeeppublication.com

দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী ৪০০, সম্পাদনা: অশোক চট্টোপাধ্যায়

দুর্লভ ভূতের গল্প ৩৫০, সম্পাদনা: সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

ওমর খৈয়াম ৩৫০, শ্রী সুরেশ চন্দ্র নন্দী (ওমর খৈয়ামের জীবনী ও সাহিত্য)

বাংলাদেশের সমকালীন শৈল্পী মহল ৪০০, সম্পাদনা: পারভেজ হোসেন

হারানো সব আখর যত ৩০০, সম্পাদনা: বুলবুল আহমেদ (১৫০ বছরের বিভিন্ন প্রকাশক শ্রেণিবদ্ধের প্রবন্ধের সংকলন)

অন্ধের মতিবর্ণ ১৮০, দেবনাথ আচার্য

আমার কথা কবিতার কথা ২৫০, জীবনানন্দ দাশ

স্ল্যাং সাপ্তাহিক কবিতায় ১৫০, অনিবার্ণ মাজী

লোকজ উপাদান: নবরূই ও পরবর্তী কবিতা ১৫০, অনির্বাণ মাজী

শ্রেষ্ঠ কবিতা ৫০ ২০০, মলয় গোস্বামী

সলিটেয়ার ২৫০, যশোধরা রায়চৌধুরী

কবিতা সংগ্রহ ১ ২৫০, মির্জা গালিব

কবিতা সংগ্রহ ২ ২২৫, সোহরাব হোসেন

কবি... তার অভিধা ১২৫, বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

তওবা তওবা ৮০, তাকের কাজী

যতটা প্রকাশ্যে থাকি যতটা গোপনে ৮০, শোভন পাত্র

২০/১৭/১বি, জি.টি. রোড, শেওড়াফুলি, হুগলী ৯১২২২৩ ফোন- ৯৭৪৩১৫৩৪৪১) email: chonyasi2012@gmail.com

প্রকাশিত হল

নির্বাচিত অণুগল্প ১৫০, তরুণ মান্না

বিপ্লবীদের ডায়েরী স্মৃতিকথা সংগ্রহ ১

সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ

বাঙালির জেলে বন্দি থাকা নতুন কিছু নয়। কীভাবে আদর্শের জন্য জেলে খেটেছেন। আন্দামানের ইতিহাস তাঁর নির্মম। এঁদের অনেকেই নীরব থাকা শ্রেয় ও প্রেয় মনে করেছেন। আবার অনেকে কলম তুলে নিয়েছেন, লিখেছেন স্মৃতিকথা।

কমলিনী প্রকাশন বিভাগ
13 বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা 700 073
পরিবেশক : দে'জ পাবলিশিং ☎033017620

প্রকাশিত হল

শান্তি সিংহ নতুন উপন্যাস

সোনার মেয়ে ৩০০

সিঙ্গাপুরপ্রবাসী রায়েরা আমলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ার। ফোক-জীবন চিত্রিত সংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ও কামনাবাসনা মুখর। কিন্তু মূখের মাঝে ক্রমশ ব্যক্তিত্বময় প্রতিবাদিনী কনক। বিয়ের রাতে মূলশয্যার ঘর থেকে বাঁচার আশায় একাকী পথে হাঁটে কনক। নানা নাটকীয় ঘটনাময় এই উপন্যাসে।

প্রদীপ ভট্টাচার্য
পিপাসু মন ২০০

জমিদারের ছেলে অভিজিৎ কলেজে পড়তে শহরের এক বাড়িতে ভাড়া থাকে। ওই বাড়িতে রবীনবাবু ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী জয়া ছাড়া কেউ থাকে না। অভিজিৎ কি তার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেল? রাধানাথের উদারতা, সুজাতার প্রেম আর বাচ্চিচারের কাহিনি নিয়েই এই উপন্যাস।

মনজিৎ গাইন
চন্দ্রকেতুগড়ে চাঞ্চল্য ১৫০

গোয়েন্দা সতুকা অ্যাসিস্ট্যান্ট শেরু এবং বটুকবাবুকে নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম দিঘির অষ্টধির অমৃতের ওদেশ আসে। চন্দ্রকেতুগড়ের ইতিহাস, পুরনো মন্দিরী মূর্তি সব কিছু উপন্যাসকে অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছে।

সত্যজিৎ মজুমদার
সাহারা মরুভূমিতে রহস্য ১০০

নিরুপম ঘোষাল সম্পাদিত
গল্পে গল্পে রহস্য ২০০

জয়া ও সাহিত্য ১০/২বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৯ ☎৯৩১৭৯২২৩০৬

তাগিদে, স্কুল কর্তৃপক্ষকে পাশ করানোর ব্যাপারে বেশ খানিকটা উদারতা দেখাতেই হবে।

সদীপ জোয়ারদার, পাগলাচণ্ডী, নদিয়া

মুসোলিনিকে লেখা চিঠি

কল্যাণ কুণ্ডুর লেখা 'মিটি ইউ মুসোলিনি: টোগোরস ট্রায়স ইন ইতালি, ১৯২৩ অ্যান্ড ১৯২৪' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনায় (গ্রন্থলোক, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫) লেখককে উদ্ধৃত করে শুচিব্রত সেন লিখেছেন, '১৯৩০ নভেম্বর পুত্র রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় মুসোলিনিকে তাঁর আতিথেয়তা ও বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারকে সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। এ চিঠি মুসোলিনির হাতে পৌঁছেছিল কি না সেটি সম্পর্কে অবশ্য নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়নি।' ওই প্রসঙ্গে ২ অক্টোবর সংখ্যায় শিবাজী ভাদুড়ীও লিখেছেন, আলোচ্য চিঠিটি মুসোলিনির হাতে পৌঁছেছিল কি না তা নাকি নিশ্চিত নয়। রবীন্দ্রনাথ-মুসোলিনি সম্পর্কের মতো বিতর্কিত একটি বিষয়ে ইতিমধ্যে নিশ্চিত তথ্য প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, প্রমাদের এই পুনরুক্তি বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গে এর আগে লেখা কল্যাণকুমার কুণ্ডুর 'ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি' (পুনশ্চ, কলকাতা) গ্রন্থটির এই পত্রিকায় প্রকাশিত (১৭ জানুয়ারি ২০১০) সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ওই সমালোচনায় সম্প্রতি প্রাপ্ত বিশ্বভারতী জানিয়েছিলেন যে, আলোচ্য চিঠিটি মুসোলিনির দপ্তরে অবশ্য পৌঁছেছিল। ১৯৩০-এর ১০ ডিসেম্বর মুসোলিনির দপ্তরের শিলমোহরসহ সেটি নথিভুক্ত হয় এবং রোমে বিদেশ মন্ত্রকের সংগ্রহশালায় সেটি রাখা রয়েছে (নথি সংখ্যা ১৩২৮৮)। তবে মুসোলিনি ওই চিঠির সম্ভবত প্রাপ্তিস্বীকার করেননি।

রবীন্দ্রনাথের চোখে মুসোলিনি

বিকাশ চক্রবর্তী প্রথম বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত (বর্ষ ৬ষ সংখ্যা ২, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১৫) 'মুসোলিনিকে রবীন্দ্রনাথ: ২১ নভেম্বর ১৯৩০' শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি পরে ইতিহেতিতে 'রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (বিকাশ চক্রবর্তী, ২০১০, পুনশ্চ) গ্রন্থে সংকলিত।

রোম-এর লেখ্যাগার থেকে কপি করে আনা বিতর্কিত চিঠিটি আমার কাছে রয়েছে এবং কল্যাণ কুণ্ডুর অনুরোধে সেটির প্রতিলিপি এই পত্রলেখক তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তিনিও অবশ্য প্রাপ্তিস্বীকার করেননি। ১৯৩০-৪০-এর উত্তাল আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ-মুসোলিনির নিতান্ত সৌজন্যমূলক পত্রবিনিময়ও কেন যথেষ্ট স্পর্শকাতর বিষয় ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। তার পরেও রবীন্দ্র-অনীহা ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কেন আরও দীর্ঘকাল অস্বস্তিতে ছিলেন তার কারণও বোঝা যায়। কিন্তু অর্ধ শতাব্দরও বেশি সময় কেটে গেছে। গবেষকরা এখনও কেন ভুল তথ্যের পুনরুক্তি করে চলেছেন, তা বোঝা কঠিন। মুসোলিনিকে হনাবর জানিয়ে চিঠি পাঠানোর রবীন্দ্রনাথের ক্যাসিবর-বিরোধী ভাবমূর্তি যে ক্ষুণ্ণ হয় না, এঁকে বোঝার মতো প্রাণ্ডবয়স্ক কি আমরা পাঠকেরা এখনও হইনি?

ইন্দ্রাণী দাশ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্যপ্রমাদ

মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়ের 'একমত হওয়া গেল না' শীর্ষক পত্রে (চিঠিপত্র, দেশ ২ নভেম্বর ২০১৫) একটি তথ্যপ্রমাদ থেকে গিয়েছে। পত্রকার লিখেছেন, 'কিন্তু ১৯৭৬ সালে শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ৫-০ গোলে হেরে যায় মোহনবাগান, সে সময় ইস্টবেঙ্গলের কোচ ছিলেন পিকে।' এই প্রসঙ্গে জানাই, ১৯৭৬ সালে নয়, ১৯৭৫ সালের শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে মোহনবাগান ৫ গোল (প্রথমার্ধেই ৪ গোল) খায়। ইস্টবেঙ্গলের কোচ ছিলেন পিকে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে পিকে ইস্টবেঙ্গল নয়, মোহনবাগানের কোচ হয়েছিলেন। সেবার কলকাতা লিগে পিকে-র কোচিংয়ে আকবরের ১৭ সেকেন্ডের করা গোলে মোহনবাগান হারায় ইস্টবেঙ্গলকে, যে-রেকর্ড এখনও অটুট আছে।

সৌলি ঘোষ, বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪

তথ্যভ্রান্তি

'দেশ' পত্রিকায় আমাদের ভবানীপুর শিশিক্ষ-র নাট্যনিবেদন 'মাঞ্জাসেনী অগ্নিকন্যা' সম্পর্কে সৃষ্টিসুখে প্রতিবেদনটির (শিল্প সংস্কৃতি, ১৭ অক্টোবর ২০১৫) জন্য ধন্যবাদ।

দু'-একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত, আবহ পরিচালকের নাম গৌতম ঘোষ নয়, গৌতম হালদার। দ্বিতীয়ত, নাটকটিকে দুই পর্বে ভাগ করা এবং মঞ্চে পরিসরকে সরল রাখার নয় নাটককার এ মঞ্চপরিকল্পকদের নয়। সে নাম পরিচালকের।

বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, কলকাতা-৭০০০২৫

গ্রাহক হোন

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ স্বামী অভেদানন্দ প্রবর্তিত রুচিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা

বিশ্ববাণী

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে সগৌরবে

■ প্রতি ফাল্গুন (February) মাসে বিশ্ববাণীর বর্ষ আরম্ভ এবং মাঘ (January) মাসে বর্ষ শেষ হয়। ■ এক বছরের জন্য সডাক গ্রাহকমূল্য ১২০.০০ টাকা, হাতে নিলে ১০০.০০ টাকা। ■ তিন বছরের জন্য সডাক গ্রাহকমূল্য ৩৬০.০০ টাকা, হাতে নিলে ৩০০.০০ টাকা। ■ আজীবন গ্রাহকমূল্য ২৫০০.০০ টাকা (২৫ বছরের পরে নবীকরণ-সাপেক্ষ)। ■ শারদীয়ার বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। ■ গ্রাহকমূল্য 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math' এই নামে M.O. করে অথবা প্রতিনিধি মারফৎ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিন। M.O. করলে অবশ্যই নাম ও ঠিকানাসহ আলাদাভাবে পত্রযোগে জানাবেন। ফোন থাকলে ফোন নম্বর পত্রে উল্লেখ করবেন। ■ বর্তমানে গ্রাহক করা হচ্ছে। বছরের যেকোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। ■ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত বইয়ের মূল্যের ওপর গ্রাহকদের ২০% ছাড় দেওয়া হয়।

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬
কার্যের সময় সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা
✆ (০৩৩) ২৫৪৩ ২০০১, +৯১ ৮৬৯৭৩ ২৫১০৬

পাওয়া যাচ্ছে

নিশিক পঠিকার উৎসব সংখ্যা
নানারূপে দুর্গা ও কালী ৪৫০
আর পেলব মুর্তির রঙিন ৯ সাদা-কালো ছবি ছাড়াও ৪৯ পৃ.

- বাংলার নবদ্বীপ, জলাশয় ১ ■ ৪১৬ পৃ., ২০০
- দেবী, সমাজ, সংস্কার ১ ■ ৫৬০ পৃ. ২০০
- বাংলার ঘরবাড়ি ১ ■ ৩৯২ পৃ. ৩০০ ৫
- মুর্শিদের : দেবাং-দেবরা ■ ১ ৩৭২ পৃ. ৪০০
- উৎসব ও আনন্দক ১ ■ ৪৪০ পৃ. ২০০

ডাকে রঙিন ও সাদা-কালো চিত্র

পরবর্তী সংখ্যা আদিবাস : সেকাল-একাল
প্রকাশিত হবে বইমেলা ২০১৬-এ
ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যে। দেবদাসী থেকে যৌনকর্মী, এক্তা সার্ভিস, পত্রমিতালী, মাসাজ পার্লার, ফেসবুক, ভাল হাসানা, আউটিং ও উৎসবে সং এবং ম্যাজুয়েজ, বিকৃত কাম, শিশুকীড়া, যৌনভাষা, রাজনীতি ও যৌনতা, যৌন শিক্ষা, যৌন কেলেঙ্কারী ইত্যাদি।
লেখা পাঠানো শেষ তারিখ - ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫

নিশিক প্রকাশন
বিবেকানন্দ পল্লী, সোনারপুর, কলকাতা-১২০, প.ব.
☎ ২৪৩৪ ০৬০৯, ৯ ৪৩৩৪০১৬১০
E-mail : lokepub@gmail.com

প্রতিরক্ষায় হরজিৎ

■ কানাডার নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত হরজিৎ সজ্জন। দীর্ঘ এগারো বছর তিনি ভ্যাঙ্কুভার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত ছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি কোনও কানাডিয়ান রেজিমেন্ট-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

অনন্য নেগিন

■ মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ এবং সংগীতচর্চা সে-দেশে নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই বিধিনিষেধের পরোয়া না করে সংগীতের অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন সতেরো বছরের আফগান কিশোরী নেগিন খুপলওয়াক। 'আফগানিস্তান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মিউজিক'-এর তরফে সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল নেগিন-পরিচালিত সেই সংগীতানুষ্ঠান। সংগীতের প্রতি তাঁর অভিরুচি বাল্যকাল থেকেই। বাবার উৎসাহই ছিল একমাত্র অবলম্বন। কাবুলের একটি হোমে থাকাকালীন টেলিভিশনের পরবাস গানের অনুষ্ঠান দেখে সংগীতশিক্ষার সূত্রপাত। বর্তমানে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মিউজিক'-এ শিক্ষারত নেগিন।

শেলি-র অপ্রকাশিত কবিতা

■ প্রায় দু'শো বছর পরে আবার প্রকাশে এল পি বি শেলি-র হারিয়ে যাওয়া একটি কবিতা। কবিতাটি রচিত হয়েছিল অকুতোভয় আইরিশ সাংবাদিক পিটার ফিনার্টির সমর্থনে, স্পষ্টবাদিতার জন্য যাঁকে সইতে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের অবমাননা। 'আ জেন্টলম্যান অফ দি ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড' নাম দিয়ে ১৮১১ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন কবি শেলি। পিটার যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন তহবিলে অর্থ জোগাড় করার জন্য সেই পুস্তিকা বিক্রিও করা হয়েছিল। মুখবন্ধ এবং কবিকৃত টীকাসহ প্রকাশিত ১৭২ পঙ্‌ক্তির এই কবিতাটি একটি ব্যক্তিগত সংকলনে ২০০৬ সালে সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু অবিলম্বে সেটি বিক্রি হয়ে যায় বেসরকারি সংস্থার কাছে এবং গবেষকদের নাগালের বাইরে চলে যায়। সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বডলিয়ান লাইব্রেরি সেই পুস্তিকাটি ক্রয় করেছে। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শেলির এই রচনাকে তাঁরা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন, যাতে ভবিষ্যতে আগ্রহী গবেষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

নিলামে রেকর্ড গড়ল 'ন্যু কুশে'

■ বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর আমেদিও মোর্গিয়ানি-র 'ন্যু কুশে' (নগ্ন-শায়িতা) ছবিটি নিউ ইয়র্কের ক্রিস্টি'জ-এ নিলামে রেকর্ড গড়ল। সতেরো কোটি ডলারে বিক্রি হল এই শিল্পকর্মটি। ১৯১৭-১৮ সাল নাগাদ প্যারিসের স্টুডিয়োতে ছবিটি এঁকেছিলেন মোর্গিয়ানি। নীল বালিশে পিঠ রেখে শায়িত বিবস্ত্র এক নারীর এই ছবি সেইসময় প্রশংসিতও হয়েছিল, আবার বিতর্কের ঝড় ওঠে। মোর্গিয়ানির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ তোলা হয়। অকাল্পনীয় এই শিল্পীর শিল্পকর্ম নিলামে বিক্রি হওয়া বিশ্বের দ্বিতীয় দামি ছবি (সর্বাধিক দামি ছবি পাবলো পিকাসো-র 'উইমেন অফ অ্যালজিয়ের্স') হিসেবে স্বীকৃতি পেল। সেই সঙ্গেই ১০০ মিলিয়ন ডলার ক্লাবের প্রথম দশটি ছবির তালিকায় স্থান পেলেন মোর্গিয়ানি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একসময় আর্থিক অনটনের জেরে এই সিরিজের সমস্ত ছবি মাত্র তিনশো ডলারে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন তিনি।

মোর্গিয়ানির 'ন্যু কুশে'

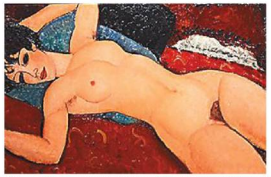

ডব্লিউটিএ ফাইনালস ২০১৫

মার্টিনা হিঙ্গিস ও সানিয়া মির্জা (বাঁদিক থেকে)

■ চেক প্রজাতন্ত্রের পেত্রা কুইটোভাকে হারিয়ে ডব্লিউটিএ (উইমেন্স টেনিস অ্যাসোসিয়েশন) ফাইনালস ২০১৫-র চ্যাম্পিয়ন হলেন পোল্যান্ডের আগনিয়েশকা রাদওয়ানস্কা। এই প্রথম তিনি ডব্লিউটিএ-র ফাইনালে উঠে জয়লাভ করলেন। অন্যদিকে গার্বিনে মুগুরুজা এবং কার্লা সাভারেসকে হারিয়ে ডাবলস-এ জয়ী হলেন সানিয়া মির্জা ও মার্টিনা হিঙ্গিস। চলতি মরসুমে এটি তাঁদের নবম খেতাব।

আগনিয়েশকা রাদওয়ানস্কা

সু দো কু

৬১

৭								১
		৪		৯		২		
			৪		৩			
৯		৮	১		২	৪		৫
		৭				৯		
৫		১	৯		৬	৩		৭
			৬		৫			
		৬		৩		৮		
৪								৬

উপরের চতুষ্কোণটিতে মোট ৯ টি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা বসানো আছে। যে-বর্গক্ষেত্রগুলি ফাঁকা আছে, সেখানে বাকি সংখ্যাগুলো বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে ওপরে-নিচে বা পাশাপাশি লাইনে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা দু'বার না বসে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

৩	৪	৬	২	১	৭	৫	৮	৯
৭	১	৫	৬	৮	৯	২	৩	৪
৮	৯	২	৪	৩	৫	১	৬	৭
২	৩	৪	৭	৫	৬	৯	১	৮
৯	৭	১	৮	৪	৩	৬	৫	২
৬	৫	৮	১	৯	২	৭	৪	৩
৪	২	৯	৫	৬	৮	৩	৭	১
৫	৮	৩	৯	৭	১	৪	২	৬
১	৬	৭	৩	২	৪	৮	৯	৫

শেষ কথা জয় সেনগুপ্ত

শক্তির উপাসক বাহুবলীর দল

শক্তিসাধনার নামে চাঁদার জুলুম। আক্রান্ত স্বয়ং বিচারকও। তাহলে নিগ্রহকারীদের রুখবে কে?

শক্তিসাধনা বঙ্গদেশে সুপ্রাচীন। ইদানীং শক্তিসাধনার নামে যে-ধরনের বাহুবলের প্রদর্শনী দেখা যাচ্ছে, তাতে সাবেক বাংলার ডাকাতদলের কথা মনে আসছে। মস্তানি-গুন্ডামি করে কালীপুজোর চাঁদার জুলুম হাল আমলে সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়েছে। মস্তানির দাপটে পাড়ায়-পাড়ায় কালীপুজোর সময়ে সাধারণ মানুষের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অতি সম্প্রতি এরকমই মস্তানির কবলে পড়েছিলেন বীরভূমের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। একদল যুবক তাঁর গাড়ি আটকে কালীপুজোর চাঁদার দাবিতে তাঁকে অকথ্য গালিগালাজ দেয় ও শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে। একজন মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকেই যদি এরকম হেনস্থার শিকার হতে হয়, তা হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়— এ প্রশ্নে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে জোর বিতণ্ডা। বিচারকের নিগ্রহের ঘটনায় মনে পড়ছে সাবেক বাংলার ডাকাতদলের কথা। বাংলার কুখ্যাত ডাকাতরাও ছিল শক্তির উপাসক। এখন যেন নবকলেবরে সেই ডাকাতকুল বাপিয়ে বেড়াচ্ছে শহর থেকে গ্রামাঞ্চল। শক্তিসাধনায় ব্রতী এই গুন্ডাবাহিনী জানে যে, কালীপুজোই শক্তিসাধনার প্রশস্ত সময়। তাই শুধু বীরভূমের সিউড়ি নয়, চাঁদা আদায়ের নামে এই লুম্পেনকারীরা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র— হাবড়া, গাইঘাটা, শ্যামপুর, বাউরিয়া, উলুবেড়িয়া, ডোমজুড়, বর্ধমান থেকে মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি থেকে তমলুক। এদের প্রধান লক্ষ্য গাড়ি, মালবাহী ট্রাক, লরি ইত্যাদি। লরি বা ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া পণ্যের পরিমাণ অনুযায়ী চাঁদার অঙ্ক ঠিক করে দেয় এরা। দাবিমতো চাঁদা না দিতে পারলে গাড়ির চালক ও আরোহীদের মারধর এবং গাড়ি ভাঙচুর করে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পিছপা হয় না।

এ যেন সেই বলং বলং বাহুবলয়ের মতো বাহুবল প্রদর্শনের ঘটনা। প্রশাসন এ সব ঘটনাই জানে, কিন্তু সব জেনেশুনেও তারা নিরাপ্ত অবস্থায় থাকাকেই শ্রেয় মনে করে। কোথাও যেন এ রাজ্যের আইনরক্ষকদের মনেই এক ধরনের ভয়ভীতি কাজ করছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এই অরাজক পরিস্থিতির নেপথ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন শ্রেণি-জাতীতির খেলা। বেকারত্ব, চূড়ান্ত অশিক্ষা যুবসমাজের একাংশকে ঠেলে দিয়েছে নৈরাজ্য সৃষ্টির রাস্তায়। এরা কিন্তু সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। বহু ক্ষেত্রে এরা রাজনীতিকদের ক্রীড়নক। দলীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গিয়েছে এরা। নির্বাচনের সময়ে হয়তো এরাই রাজনৈতিক নেতাদের কথামতো বুথ দখল করে, বিরোধী দলের কর্মীদের উপর চড়াও হয়, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অঞ্চল কাঁপিয়ে বেড়ায়। প্রয়োজন আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে এদের ব্যবহার করার মোক্ষম সুযোগটি হাতছাড়া করতে চান না কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরাই। তাই তাঁরাও এদের সাধ্যমতো 'দেখেন'। আর নেতাদের ছত্রছায়ায় থাকা এই অপরাধীদের পুলিশ প্রশাসনও ঘাঁটাতে সাহস পায় না। উল্টে এ রাজ্যের পুলিশই কখনও-সখনও এই মস্তান বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে থানার মধ্যে টেবিলের তলায় মাথা লুকিয়ে নিজেদের বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বা কখনও সামনাসামনি এদের হাতে প্রহৃত হয়ে লজ্জায় মুখ লুকোয়।

প্রশ্ন একটাই, প্রশাসন সব জেনেবুঝেও কেন এই বীরপুঙ্গবদের প্রতি শান্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না?

> বিচারক নিগ্রহের ঘটনায় মনে পড়ছে সাবেক বাংলার ডাকাতদলের কথা। বাংলার কুখ্যাত ডাকাতরাও ছিল শক্তির উপাসক।

www.apollogleneagles.in

Apollo HOSPITALS

INSTITUTES OF ORTHOPAEDICS

Joint Replacements • Sports Medicine • Complex Trauma • Rehab & Physical Medicine

A joint venture worth undertaking

- Cumulative Experience of over 20,000 Joint Replacements
- Largest Joint Replacement Program in Eastern India
- Success Rate of 99.9%; accurate & guaranteed
- International protocols & infrastructure

Our Eminent Panel of Orthopaedics

Dr Buddhadeb Chatterjee
Dr Ranjan Kamilya
Dr Tathagata Das

Dr Abheek Kar
Dr Ranadeep Rudra
Dr Indranil Pal

Dr Manabendra Nath Basu Mallick
Dr Ravi Ganesh Bharadwaj
Dr Kushal Nag

Dr P K Banerji

Joint Replacement is a fairly important decision to take in life, but when you make a decision to come over to Apollo Gleneagles Hospitals Kolkata, we can assure you, given our expertise and experienced panel of Orthopaedics, it will be a venture worth undertaking.

Eastern India's Most Advanced Centre For Joint Replacement

Apollo Gleneagles HOSPITALS KOLKATA

TOUCHING LIVES

Organization Accredited by Joint Commission International

APOLLO HELPLINE 033 6060 1066